অনীক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬
বর্ষ ৫৩ □ সংখ্যা ৩-৪
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৪৭৫৮৪৯৯৩১
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয়
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র(সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয় □ ৫

প্রবন্ধ
সুপ্রিম কোর্টে সিঙ্গুর □ প্রণব দে □ ৭

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
বাজারসর্বস্ব বিশ্বায়নের সংস্কৃতি □ রতন খাসনবিশ □ ১৯
বিশ্বায়ন-মতাদর্শ-সংস্কৃতি □ সুনন্দন চক্রবর্তী □ ২৪
সময়-এর নান্দনিক মাত্রা □ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য □ ২৭
বুদ্ধিজীবীর রাজদর্শন : সংস্কৃতির বিড়ম্বনা □ অশোক চট্টোপাধ্যায় □ ৩০
সোভিয়েত সাহিত্য— অন্য সংস্কৃতি গড়ার পরীক্ষা □ সমরেশ মিত্র □ ৪০
ধর্ম কি চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে? □ সুচরিতা সেন □ ৪৭
ভারতীয় ঐতিহ্যে শিশু : বর্ণ-পরিচয়ের অন্যপাঠ □ কণিষ্ক চৌধুরী □ ৫১
ইতিহাসের পাঠ্যবই ও সঙ্ঘ পরিবার □ অমিত বন্দোপাধ্যায় □ ৫৫
ট্রাইব-এর কথকতা □ শুচিব্রত সেন □ ৫৮
লোকসংস্কৃতিতে আগ্রাসনের কয়েকটি দিক □ অরিজিৎ □ ৬০
বাঙালি মুসলমানের জীবনযাপন □ সৌমিত্র দস্তিদার □ ৬৫
পণ্য-সর্বস্ব পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও পরিবেশ □ সবুজ কর □ ৭০
বাংলা ছবির সম্ভাব্য সংকট □ অনিন্দ্য সেনগুপ্ত □ ৮৩
মূলধারার হিন্দী সিনেমায় নারীর নির্মাণ □ ঋদ্ধি ভট্টাচার্য □ ৯৩
ইতিহাসবিমুখ এ সময়, বাংলা গান □ বিপুল চক্রবর্তী □ ৯৮

গল্প
শীতলক্ষ্যা থেকে চূর্ণী □ দীপঙ্কর দাস □ ১০০
নীলবর্ণ □ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী □ ১০৫

কবিতা □ ১৪-১৮
শঙ্খ ঘোষ □ সব্যসাচী দেব □ সৃজন সেন □ অশোক চট্টোপাধ্যায় □
অচিন্ত্য সুরাল □ মৃন্ময় চক্রবর্তী □ মধুছন্দা মৈত্র □ বিকাশ চন্দ □
সুশান্ত ভট্টাচার্য □ শ্যামলী রক্ষিত □ কালীপদ ঘোষ □ অজয় সেন

স্মরণ : মহাশ্বেতা দেবী
প্রিয় মহাশ্বেতাদি, মারাং দাঈ □ অমর মিত্র □ ১০৮
মহাশ্বেতা: এক অনন্য বিরল সাহিত্যকর্মী □ নীলকণ্ঠ সেন □ ১১০

পাঠকের কলমে
ওদের বেতন বাড়ে □ ১০৪

পি বি এস : একটি প্রগতিশীল ও মার্কসীয় সাহিত্যের সম্ভার

সদ্য প্রকাশিত আমাদের যুগান্তকারী গ্রন্থ

মাদার টেরেসা : মুখোশের আড়ালে

অরূপ চ্যাটার্জী পেপারব্যাক ৩০০.০০
শোভন সংস্করণ ৪০০.০০

প্রখ্যাত সাহিত্যিক কেতকী কুশারী ডাইশন এই বইটি সম্পর্কে লিখেছেন, ''অরূপকে তাঁর সমুজ্জ্বল কাজের জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই। যে গবেষণার চালিকা শক্তি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক তাগিদ নয়, গবেষকের একে নিজস্ব ব্যক্তিগত অবসেশন, তার সৌন্দর্য এখানেই যে তেমন গবেষণা আমাদের রত্নোপম অন্তর্দৃষ্টির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

দীপংকর চক্রবর্তীর নির্বাচিত রচনা (প্রথম খণ্ড)
সম্পাদনা : শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ২০০.০০

এভাবেই এগোয় ও অন্যান্য
জয়ন্ত জোয়ারদার পেপারব্যাক- ৩০০.০০
বোর্ড বাঁধাই- ৪৫০.০০

সুমিতা দাস-এর

কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা
একটি মুছে দেওয়া সভ্যতার ইতিহাস ২৫০.০০

কলম্বাসের পর আমেরিকা
ধ্বংস মৃত্যু লুণ্ঠন গণহত্যা ২০০.০০

জেলের ভিতর জেল (পাগলবাড়ি পর্ব)
মীনাক্ষী সেন ৯০.০০

গর্ভঘাতী গুজরাত
সম্পাদনা ঃ মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, সোমা মারিক ৮০.০০

নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান
অমর মিত্র ৫০.০০

বিপ্লবের গান (৮ম মুদ্রণ)
চিন চিং মাই (অনুবাদ) দীপঙ্কর চক্রবর্তী ৯০.০০

জয়া শুরার কথা
এল্ কসমোদেমিয়ানস্কয়া (অনুবাদ) শেফালি নন্দী ১০০.০০

হিরোসিমার মেয়ে
আর কিম (অনুবাদ) ইলা মিত্র ১০০.০০

নকশালবাড়ি ঃ একটি মূল্যায়ন
সুনীতি কুমার ঘোষ ৩৫০.০০

আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ
একটি মাস্থলি রিভিয়ু সংকলন ৭৫.০০
সম্পাদনা ঃ আশীষ লাহিড়ী

ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন
অশোক রুদ্র ৭০.০০

আজকের চীন
একটি মাস্থলি রিভিয়ু সংকলন
সম্পাদনা ঃ দীপংকর চক্রবর্তী ১৪০.০০

পল সুইজির নির্বাচিত রচনা সংকলন
সম্পাদনা : দীপংকর চক্রবর্তী ১৫০.০০

সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি
অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি
অশোক রুদ্র স্মরণে
সম্পাদনা : অশোক রুদ্র স্মৃতি সমিতি ১৫০.০০

তসলিমা নাসরিন-এর আত্মজীবনী ও অন্যান্য বই

আমার মেয়েবেলা ১৭০.০০
উতল হাওয়া ২৫০.০০
দ্বিখণ্ডিত ২৫০.০০
সেইসব অন্ধকার (৪র্থ) ১৭০.০০
আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকো প্রিয় দেশ (৫ম) ১৫০.০০
নেই, কিছু নেই (৬ষ্ঠ) ১৪০.০০
নির্বাসন (৭ম) ১৪০.০০
আত্মজীবনী সমগ্র ৫৫০.০০

গদ্য পদ্য ১৮০.০০
নারীর কোনও দেশ নেই ১২০.০০
নিষিদ্ধ ১৮০.০০
আমার প্রতিবাদের ভাষা ২০০.০০

pbs

পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলকাতা ৭০০০০৯, ফোন : (০৩৩) ২২১৯-৯২৫৬

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আগ্রাসনের সংস্কৃতি

১৯৪০-এর দশক। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, নৌবিদ্রোহ, দেশভাগ, স্বাধীনতা। দারুণ ভয়ানক সময়। আবার দারুণ আশা-জাগানো সম্ভাবনার সময়। তৈরি হচ্ছে নানা ধ্যান ধারণা, চিত্রকল্প। সেই আশা-আশঙ্কার কথা প্রতিফলিত হচ্ছে সমকালীন সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে, চলচ্চিত্রেও। সেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে নানা দৃষ্টিভঙ্গি, নানা মতাদর্শ। রাজনৈতিক হিন্দুত্ব বা রাজনৈতিক ইসলাম, শ্রেণী অবস্থান স্থির রেখে শুধু রাজনৈতিক ব্যাটন হস্তান্তরের রাজনীতির আদর্শে স্থিত কংগ্রেসের মতাদর্শ, আবার শ্রমিকশ্রেণীর, সমাজতন্ত্রের কথা নিয়ে কমিউনিস্টদের মতাদর্শ। প্রতিটি মতাদর্শ অন্য মতাদর্শের সঙ্গে সংগ্রামরত। সে সময়কার সাহিত্য পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় সাহিত্য জীবনের দর্পণ।

আজকের অবস্থা কী? রাজনৈতিক হিন্দুত্বের বিজয়যাত্রা, আর বাম মতাদর্শ ও বাম শক্তিগুলির পিছু হটা। একদিকে দরিদ্র মানুষ না খেয়ে জীবন কাটায়, চাকরি না পাওয়া শহুরে যুবক পাঁচ-ছয়-আট হাজার টাকায় ১০-১২ ঘণ্টা খেটে যায়। অন্যদিকে একই শহরে মার্সিডিস, অডি, ভোক্সওয়াগনের বন্যা বয়ে যায়। এক একটা গাড়ির দামে বেশ কয়েকটি পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান নির্মিত হতে পারে, অথবা হতে পারে একটি পরিবারের ২০-৩০ বছর খাওয়ার ব্যবস্থা।

কিন্তু আজকের সাহিত্যে, সংগীতে, চলচ্চিত্রে তার প্রকাশ কোথায়? এই বাংলার এক-চতুর্থাংশ মানুষ ধর্মে মুসলমান। কিন্তু তারা প্রায় অদৃশ্য। হ্যাঁ, রাজাবাজার বা মুর্শিদাবাদের গ্রামে গেলে আপনি তাদের দেখতে পাবেন ঠিকই, কিন্তু পাবেন না সল্ট লেক বা বালিগঞ্জে। পাবেন না রাজনীতির নেতৃত্বে বা নবান্নের আমলা হিসেবে। মূলধারার সাহিত্য বা চলচ্চিত্রে একটাও মুসলমান চরিত্র দেখতে পাবেন না। যেমন দেখতে পাবেন না সুন্দরবনের মানুষদের, সুনামির পর যাদের প্রায় সব পুরুষ ভিন রাজ্যে, নিদেন পক্ষে শহরে আশ্রয় নিয়েছে কাজের খোঁজে। তাদের সমাজটা ভেঙে তছনছ।

নারীর ক্ষেত্রে অগ্রগতি খানিকটা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পোষাকে যতটা অগ্রগতি, জীবনে কি ততটা ? তাহলে নাবালিকার বিয়ে বা বিয়ে করতে রাজি না হওয়াটা রোজ রোজ খবর হয় কী করে? সব ধর্ষিতা আজ আর মুখ লুকিয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবেন না ঠিক। কিন্তু নারীর সম্ভ্রমহানির নতুন নতুন পথ বেরোচ্ছে, সম্ভ্রম হানি ও ধর্ষণ, গণধর্ষণ তো আছেই, ফেসবুক-ইন্টারনেটে ছবি ওঠায় নাবালিকারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। নারী শরীরের পণ্যায়ন এক নতুন মাত্রা নিয়েছে।

একেই আমরা বলছি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আগ্রাসন। মধ্যবিত্ত পরিবারে শিশু দৌড়াদৌড়ি-খেলাধুলা করে না, কিন্তু ভিডিও গেম্স খেলে। সেখানে 'টেরোরিস্ট'রা তার টার্গেট, অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে তাদের খতম করাই খেলা। শিশুকে শেখানো হচ্ছে যে বাবা শিশুর জন্য দামী বিমা কিনতে পারে সে হলো ভালো বাবা, আর ভালো মা-দের জীবনের লক্ষ্য হলো বিশেষ ডিটারজেন্ট বা বিশেষ ওয়াশিং মেশিন দিয়ে শিশুর জামাকাপড় ধবধবে সাদা রাখা। বাবা-মা শিশুকে শেখাচ্ছেন, বন্ধুর হাত ধরা নয়, বন্ধুকে ডিঙিয়ে যাওয়াই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। জানাটা খুব জরুরি নয়, কিন্তু ফার্স্ট হতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার হতে হবে। সেবার জন্য নয়, বেশি রোজগারের জন্য। বিজ্ঞান পড়বে, প্রযুক্তি শিখবে। কিন্তু জ্যোতিষীর দেওয়া পাথরটাও থাকুক।

শুধু জ্যোতিষী আর পাথর কেন, খোদ রোমে এক মহিলাকে সন্ত আখ্যা দেওয়া হয়ে গেল। সন্ত হওয়ার মাপকাঠি কী? দুটি, বা একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটানো। মৃত্যুর পর তাঁর ছবি থেকে জ্যোতি বেরিয়ে এক আদিবাসী মহিলার 'টিউমার' সারিয়ে দিয়েছে। অলৌকিক। বাস্তবে অবশ্য মহিলাটি হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে টিবি-র ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছেন। তাতে কী? দেশবিদেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট-এ ভ্যাটিকান ছয়লাপ। মাদার সন্ত হলেন। সারা বিশ্বে সংবাদমাধ্যমে সেটা প্রধান সংবাদ হলো। কেউ মনে করালো না যে এ প্রচার নেহাত বিজ্ঞান বিরোধী। এমন কি বেআইনি। কারণ আমাদের দেশেই আইন আছে, অলৌকিক ভাবে রোগ নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা আইনত অপরাধ।

হৃদয়ে কারফিউ, আর মগজে পণ্য সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি এখন আমাদের সমাজে খুব জাঁকালোভাবে গেড়ে বসেছে। বাড়িতে টয়লেট নেই, কিন্তু ছেলের পকেটে মোবাইল আছে। পেটে ভাতের সঙ্গে ডাল না জুটুক, শ্যাম্পুটা চাই-ই। নানা ধারণা এখন আপ্তবাক্যের মতো সবার মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, মেধা। অধ্যাপকের মেয়ে আর তাদের রাঁধুনির মেয়ের বিচার হতে একই মানদণ্ডে। রাঁধুনির মেয়ে যদি নম্বর কম পেয়ে থাকে তার কারণ তার মেধা কম। বাড়িতে দেখিয়ে দেওয়ার কেউ নেই, স্কুলটাও ভালো নয়— এগুলো কারণ নয়। অথচ বড়োলোকের মেয়ে সত্তর লাখ টাকা দিয়ে অধ্যাপকের মেয়েকে টপকে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়ে যায়। তার মেধার অভাব নিয়ে কোনও কথা আলোচনায় আসে না।

সেদিন এক মহিলা বলছিলেন, 'কোটা'-য় চান্স পাওয়া ডাক্তারকে দেখাব না। কী ভুলভাল চিকিৎসা করবে! কিন্তু কর্পোরেট

হাসপাতালের ঝাঁ-চকচকে যে ডাক্তারকে দেখিয়ে মধ্যবিত্ত ধন্য হয়, তিনি কত টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছিলেন সে খবর নেওয়ার চেষ্টাও করবেন না কেউ।

এক অদ্ভুত মতৈক্য, কনসেন্ট, নির্মিত হয়ে গেছে। দেশ নিয়ে আলোচনা সীমিত থাকে মোদি-রাহুল থেকে আম্বানি, বড়োজোর মল-যাত্রী মধ্যবিত্ত পর্যন্ত। পকেটে টাকা না থাকলে আপনার মতামতের দাম নেই। যদি না নেহাত সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ তাদের মত প্রকাশ করে, বস্তির মধ্যে উদ্ধত উন্নতশির ফ্ল্যাটবাড়ির গাড়ি ভেঙে বস্তিবাসী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। তা নিয়ে কয়েকদিন আলোচনা চলে। কিন্তু কেউ লেখে না, 'বলতে পারো বড়োমানুষ মোটর কেন চড়বে/গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?'

এই সাংস্কৃতিক আধিপত্য চলে অর্থনৈতিক আধিপত্যের হাত ধরে। এর শরিক ধর্ম, লিঙ্গ, গ্রাম-শহর বিভাজনও। হয়ত নতুন রূপে। এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভাষা কখনো 'মেধা', 'ওরা-আমরা', 'অর্জন' প্রভৃতি আপ্তবাক্য, কখনও সাহিত্য, গান, সিনেমা ইত্যাদি শিল্প-সংস্কৃতির নানা রূপ।

এই সংখ্যায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আগ্রাসনের সংস্কৃতি নিয়ে লিখেছেন নানা লেখক। এই বিশাল বিষয়টিকে একটি সংখ্যায় ধরে রাখা যায় না। শুধু এর কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকসম্পাত করা যায়। সেই প্রচেষ্টাই হয়েছে এই সংখ্যাটিতে।

শ্রমজীবীরা যদি যূথবদ্ধ সমাজের বদলে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের নামে সামাজিক সত্তা বিসর্জন দেয়, তাতে লাভ শাসক শ্রেণীর। এতদিন পুঁজিবাদ এতে তেমন সফল হয়নি। সোভিয়েতের পতন ও পুঁজির বিশ্বায়ন তাকে । তবে শুধু ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়নের যুগে তারা এতে অনেকটাই সফল। এ নিয়ে লিখেছেন রতন খাসনবিশ। সুনন্দন চক্রবর্তী আবার কাঠামো-উপরিকাঠামোর চেনা ছকটিকে নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদ শুধু একটি অর্থনৈতিক কাঠামো নয়, সমাজ-মতাদর্শ-সংস্কৃতি এই সমগ্রতায় তাকে দেখা দরকার।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সময় কী ভূমিকা রাখে তা নিয়ে লিখেছেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। এই বাংলায় যুগে যুগে বুদ্ধিজীবীরা যে শ্রমজীবীর কথা নয়, রাজার গুণকীর্তন করে এসেছেন তা বিধৃত করে আজকের সমাজে বুদ্ধিজীবীদের নঞার্থক ভূমিকার একটা ব্যাখ্যা রাখার পাশাপাশি চেনা ছকের বাইরে অন্যরকম বুদ্ধিজীবীদের কথা বলেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। ব্যতিক্রমী যে বুদ্ধিজীবীরা নাৎসি আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছেন, মাও সে-তুঙ বিপ্লবে যে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার কথা বলেছেন। বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ অংশ শিল্পী-সাহিত্যিকরা। সোভিয়েত বিপ্লবের পর নতুন সংস্কৃতি গড়ার সংগ্রামে সেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা লিখেছেন সমরেশ মিত্র। তাঁর লেখায় এসেছে এই আলোকোজ্জ্বল সোভিয়েত দেশে সাহিত্যিকদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার প্রচেষ্টার কথাও।

সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধর্ম। তার বর্তমানের রমরমা বুঝতে ইতিহাস ও শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনের সাথে ধর্মের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন সুচরিতা সেন। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও ঐতিহ্য সংস্কৃতির একটা বড়ো দিক। ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্য কীভাবে অতীতে এবং আজও শিশুমনে নারীবিদ্বেষী সংস্কৃতির জন্ম দেয়, অন্যদিকে জন্ম দেয় প্রশ্নহীন আনুগত্যের, তা নিয়ে লিখেছেন কণিষ্ক চৌধুরী। ছাত্রদের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করতে আরএসএস বিজেপি কীভাবে ইতিহাসপাঠকে বিকৃত করছে তা নিয়ে লিখেছেন অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

'হিন্দু' সমাজের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার কথা লিখেছেন শুচিব্রত সেন। লোকসংস্কৃতির ইতিহাস আর তাতে অতীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের আর অনতি-অতীত ও বর্তমানে পুঁজিবাদের আগ্রাসনের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন অরিজিৎ। এ বাংলায় মুসলমানদের ওপর আবার আধিপত্যের স্বরূপটা অন্য রকম। বাঙালি মুসলমানের কথা জানতে গিয়ে আমরা-ওরা বিভাজনের বীভৎসকে তাঁর নতুন করে দেখা-জানা-বোঝা পাঠককে শুনিয়েছেন সৌমিত্র দস্তিদার।

পরিবেশ সম্পর্কে এখন অনেক চর্চা চলে। পণ্য-সর্বস্ব পুঁজিবাদী সংস্কৃতি এবং বিশ্বায়ন, সমরাস্ত্র উৎপাদন, এগুলি কীভাবে পরিবেশ-নৈতিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান করছে সে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন সবুজ কর।

সমসাময়িক সিনেমার সংস্কৃতি নিয়ে খুব গভীর কিছু প্রশ্ন তুলেছেন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত। আজকের বাংলা ছবি কীভাবে উচ্চবিত্ত ভোক্তাদের নিয়ে আর তাদের জন্য ছবি হয়ে উঠেছে সে নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে মূলধারার হিন্দী সিনেমায় নারীর নির্মাণ কীভাবে এখনও কোন পুরুষের মা বা স্ত্রী বা প্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে সে নিয়ে আলোচনা করেছেন ঋদ্ধি ভট্টাচার্য। আর এখনকার বাংলা গান নিয়ে লিখেছেন বিপুল চক্রবর্তী।

এই সংখ্যায় এছাড়া আছে গল্প, কবিতা ও ছড়া, সিঙ্গুর নিয়ে একটি বিশেষ রচনা এবং সদ্য-প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবী নিয়ে দুটি লেখা। শেষে লেখকদের ও প্রেসের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সংখ্যাটি পাঠকদের দরবারে পেশ করছি।

প্রবন্ধ

সুপ্রিম কোর্টে সিঙ্গুর

প্রণব দে

টাটার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কী গোপন চুক্তি হয়েছিল, সেটা বামফ্রন্ট আমলে ছিল 'ট্রেড সিক্রেট', তৃণমূল রাজত্বেও তাই। কোনো সরকারই গুপ্ত কথা প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। সিঙ্গুরে টাটাকে জমি হস্তান্তরের পর, টাটা মোটর্সের সঙ্গে শিল্প নিগম ও সরকারের কী চুক্তি হয়েছিল, তার এক ভগ্নাংশ, তথ্য জানার অধিকার আইনে, শিল্প নিগম তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। সুপ্রিম কোর্ট ৩১আগস্ট, ২০১৬ তারিখে যে রায় ঘোষণা করেছে, তাতে আরও অনেক বিস্তারিত তথ্যের সন্ধান মিলেছে, এই মামলা না হলে যা হয়তো কখনোই জানা যেত না।

তথ্য নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু তথ্য বিচার পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমাদের মতো কমন ম্যান সাদা চোখে যা দেখে, আইন তা দেখে না। আইন দেখে তার প্রণেতা রাষ্ট্রের চোখ দিয়ে। রাষ্ট্রের দৃষ্টি নির্ভর করে, তাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের উপর। ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করছে আদানী-আম্বানী প্রভৃতি কর্পোরেট গোষ্ঠী। সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মসূচি কর্পোরেট পুঁজির সেবার লক্ষ্যে ধাবিত। সুতরাং, আইনের যারা ব্যাখ্যাক্যর, সেই সুপ্রিম কোর্ট যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো আদেশ দেবে, এমন আশা করা মনে হয় সমীচীন নয়। সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানী যদি টিঁকে থাকতে পারতো অথবা বামফ্রন্ট সরকার যদি ক্ষমতায় আসীন থাকতে সক্ষম হতো, সুপ্রিম কোর্টের রায় কী হতো, তা নিয়ে লেখকের সংশয় আছে। ১৮৯৪ সালের আইনকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা কখনোই একমুখী নয়। বিশেষত জনস্বার্থের ব্যাখ্যায় পরস্পর বিরোধিতার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। এমনকি আলোচ্য সিঙ্গুর মামলাতেও বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা আছে। তবুও সিঙ্গুরের কৃষকদের আন্দোলনের স্বার্থে মামলায় তাদের জয় কাম্য ছিল। 'ঐতিহাসিক' বলা না গেলেও সুপ্রিম কোর্টের এই রায় স্বাগত।

প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে, আলোচনার শুরুতে একটা বিষয় উত্থাপন করা প্রয়োজন। সিঙ্গুরে টাটার স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ হোক বা যে কোনো কোম্পানির স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ হোক, বর্তমান লেখক আগাগোড়া এগুলিকে 'জনস্বার্থ' বিরোধী আখ্যা দিয়ে এসেছে। যে বিষয়গুলি আলোচ্য সিঙ্গুর মামলায় উত্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়গুলি ইতিপূর্বে *অনীক*-এর পাতায় এবং অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। প্রশ্নটা তো এটা নয়, আইনে কী আছে। প্রশ্ন এটাই, আইন কী হওয়া উচিত। আসলে আইনটাও তো উৎপাদন সম্পর্কের একটা সূচক। উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে তার যখন সংঘাত লাগে, তখন আম-আদমি দাবি করে সম্পর্কটা বদলানোর। এলিটিস্ট ভদ্রলোকদের সঙ্গে তো এই সিস্টেম-এর কোনো সংঘাত নেই। উন্নয়নের ক্ষীরটুকু তাদের পাতেই পড়ে। তাই এই আইনের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে না। 'সিঙ্গুরে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে, কিন্তু সিঙ্গুরে স্থান নির্বাচনে কোনো ভুল নেই। কৃষকের সংখ্যা কত কমছে, তারই ওপর নির্ভর করে কৃষকদের উন্নতি। শিল্পের জন্য কৃষিজমি ব্যবহারে বাধা দেওয়া শেষ পর্যন্ত আত্মাহুতির সামিল...'— কথাগুলি নোবেল জয়ী এক ভারতীয় অর্থনীতিবিদের (*টেলিগ্রাফ*, ২৩/০৭/০৭)। এখনও সংবাদপত্র-টিভি এই কথাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আউড়ে যাচ্ছে। এইসব জ্ঞানীগুণী অভিমত থেকে আমজনতার অবস্থান অনেক দূরে।

২

কর্পোরেট পুঁজি যেটাকে শিল্পায়ন বলছে, কার্ল মার্কস সেটাকেই আখ্যা দিয়েছিলেন 'পুঁজির আদি সঞ্চয়'। অন্যের সম্পত্তি লুঠের মাধ্যমে পুঁজি স্ফীত হয় এবং সেটা হয় রাষ্ট্রের সহযোগিতায়। সামগ্রিক এই ব্যবস্থাটিকে বৈধতা দানের উদ্দেশ্যে এমিনেন্ট ডোমেইন বা সার্বভৌম অধিকার তত্ত্বের আবির্ভাব। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ বিচারক হুগো গ্রোসিয়াস জাতি-রাষ্ট্র কর্তৃক উপনিবেশ দখলের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'রাষ্ট্রের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণাধীন প্রজাদের সম্পত্তি, রাষ্ট্র তার নিরতিশয় প্রয়োজনে অথবা জনহিতার্থে ব্যবহার করতে পারে, বিনষ্ট করতে পারে কিংবা হস্তান্তর করতে পারে। নিরতিশয় প্রয়োজন কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষকে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করার স্বাধীনতা অনুমোদন করে। এইরকম পরিস্থিতিতে কেবল নজর রাখতে হবে, যাতে সরকারি খরচে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা ক্ষতিপূরণ পায়।' এই এমিনেন্ট ডোমেইন তত্ত্ব সর্বদেশে অধিগ্রহণ আইনের মূল কথা।

১৮৯৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইন প্রণীত হয়। প্রায় শুরু থেকে প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থে এই আইন প্রয়োগ করা হতে থাকে এবং সাথে সাথে শুরু হয় কৃষিজীবী জনতার সঙ্গে নতুন এক সংঘাত। ১৯২০-২২ সালে পুনের কাছে মুলসীপেটায় টাটা কোম্পানীর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত সর্বপ্রথম অধিগ্রহণ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুপ্রিম কোর্টে দাখিলিকৃত অসংখ্য মামলাও প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থে জবরদস্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষের সাক্ষ্য দেয়। জনস্বার্থের আবরণে বিভিন্ন কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণকে জনতা কোনোদিনই জনস্বার্থ বলে মেনে নিতে পারেনি। সুতরাং সামগ্রিকভাবে আমরা বিষয়টিকে বিচার করবো শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে।

৩

সিঙ্গুরে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মোট ১১টি রিট পিটিশন জমা পড়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টে একযোগে আবেদনগুলির শুনানি

হয় এবং ১৮ জানুয়রি ২০০৮ তারিখে আবেদনগুলি অগ্রাহ্য হয়। (পরবর্তীকালে মমতা সরকার জমি ফেরাতে Singur Land Rehabilitation and Development Act, 2011 বলবৎ করার পর, টাটা মোটর্স মামলা করে। সিঙ্গল বেঞ্চে রায় সরকারের পক্ষে যায়, ডিভিশনের রায় যায় টাটাদের পক্ষে। সেই মামলাটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকলেও বিচারপতিরা আলোচ্য মামলায় বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।)

সিঙ্গুর মামলায় সর্বোচ্চ আদালত নয়টি প্রশ্ন বিচার করেন—

১) সংশ্লিষ্ট জমি জনস্বার্থে (public purpose) অধিগৃহীত হয়েছিল নাকি কোম্পানির (TML) স্বার্থে?

২) যদি কোম্পানির জন্য অধিগৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে অধিগ্রহণ আইনের সপ্তম পরিচ্ছেদে (Part-VII) বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসৃত হয়েছে কিনা।

৩) অধিগ্রহণ আইনের ৫এ(২) ধারা অনুসারে ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন কালেক্টর যথাযথ তদন্ত করেছে কিনা।

৪) ৫এ ধারায় জমি মালিক/কৃষকরা যে আপত্তি দাখিল করেছিলেন, সেগুলি অগ্রাহ্য করে এল এ কালেক্টর যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তাতে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন কিনা।

৫) কালেক্টরের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল কিনা।

৬) যথাযথ তদন্তের পর এবং ন্যায় বিচার করে ৯ ধারায় ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছিল কিনা।

৭) যথাযথ বাজার দরের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছিল কিনা।

৮) ৫এ(২) ধারানুসারে তদন্ত না করা হলে এবং থোক ক্ষতিপূরণ (composite award) ঘোষিত হলে, তার বৈধতা বজায় থাকে কিনা।

৯) বর্তমান পরিস্থিতিতে কীরূপ আদেশ সঙ্গত।

১ এবং ২— এই দুটোই মূল বা নীতিগত প্রশ্ন। বাকি সব পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। নীতিগত প্রশ্নেই বিচারপতিদের মতের ফারাক আছে। বিচারপতি ভি গোপালা গৌড়া-র যুক্তি হলো—

ক) আইনের ৪ নং ধারায় জারি করা নোটিশগুলি থেকে স্পষ্ট যে টাটা ক্ষুদ্র গাড়ি প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত জমিগুলি বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল।

খ) ২০০৬ সালের ৩০ মে তারিখে বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিবের প্রস্তুত করা ক্যাবিনেট মেমোয় উল্লেখ করা হয়েছে যে টাটা মোটর্সের ক্ষুদ্র গাড়ি প্রকল্পের জন্য ১০৫৩ একর জমি শিল্প নিগম অধিগ্রহণ করবে। ৫ জুন ২০০৬ মুখ্যমন্ত্রী উক্ত ক্যাবিনেট মেমো অনুমোদন করেন। তার পরেই ৪ ধারায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

গ) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জমি অধিগ্রহণের জন্য শিল্প নিগম রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেছে, এমন কোনো রেকর্ড দেখা যাচ্ছে না। অধিগ্রহণ আইনের ৩(এফ)(৩) ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী জনস্বার্থের শর্ত পূরণ করতে এটার প্রয়োজন ছিল। সরকারের পলিসি বা প্রকল্পের ভিত্তিতে শিল্প নিগম পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণে সক্ষম ছিল। ২৯/০৮/০৬ তারিখে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের যুগ্ম সচিবের চিঠিতে শিল্প নিগমকে অধিগ্রাহক সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিতে সে প্রকার কোনো উল্লেখ নেই।

ঘ) টাটা মোটর্সের বক্তব্য অনুযায়ী যদি ধরেও নেওয়া যায়, কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন রাজ্য সরকারের পলিসি, আদালতে দাখিলিকৃত অধিগ্রহণের মূল ফাইলে এরকম কোনো তথ্য দৃষ্ট হচ্ছে না। অতএব সুদূর কল্পনাতেও এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না যে শিল্প নিগমের চাহিদা মোতাবেক কিংবা নিগম বা রাজ্য সরকারের কোনো প্রকল্প রূপায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং অধিগ্রহণ আইনের ৩(এফ) (৩), (৪), (৬) ধারারও শর্ত পূরণ হচ্ছে না। বিপরীতে ১৭ মার্চ ২০০৬ তারিখে টাটা এবং রাজ্য সরকারের মিটিং-এর কার্যবিবরণীতে নথিভুক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, টাটা মোটর্সই ২.৫ লক্ষ ক্ষুদ্র গাড়ি উৎপাদনের *স্পেশাল ক্যাটিগরি প্রজেক্ট* রূপায়নে উৎসাহী। টাটা মোটর্সের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ১৯/০১/০৬ তারিখে এক চিঠিতে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রধান সচিবকে জানিয়েছিলেন, কারখানা স্থাপনের জন্য ৪০০ একর, ভেন্ডর পার্কের জন্য ২০০ একর এবং নগরায়ন প্রকল্পের (township) জন্য ১০০ একর জমি প্রয়োজন। এছাড়া এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে, অধিগ্রহণ আইনের ৬ ধারার অপরিহার্য শর্তানুযায়ী অধিগ্রহণের খরচ বাবদ সরকারি অর্থ জমা দেওয়া হয়নি। ৬ ধারার বিজ্ঞপ্তিতে কেবল উল্লেখ করা হয়েছিল, জনস্বার্থে টাটা ক্ষুদ্র গাড়ি প্রকল্প রূপায়নের এই জমি প্রয়োজন। অধিগ্রহণ আইনের ৪ ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়ে হোক কিংবা ৫এ(২) ধারায় কালেক্টরের রিপোর্ট বিবেচনার ক্ষেত্রে হোক কিংবা ৬ ধারায় চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারির সময়ে হোক— কোনো ক্ষেত্রেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়নি। এই অধিগ্রহণ যদি বহাল রাখা হয়, তাহলে জনস্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নামে, যে কোনোপ্রকারে সমাজের সব থেকে অসহায় শ্রেণীর জমি অধিগ্রহণকে ন্যায্যতা প্রদান করবে।

ঙ) অন্যদিকে অধিগ্রহণের খরচ মেটাতে নিগম রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সরকারকে অর্থ প্রদান করেছিল। অধিগ্রহণ আইনের সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প নিগমকে কখনোই 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ' (local authority) হিসাবে বিবেচনা করা যায়না। সেই কারণে এই অর্থ প্রদান ৬ ধারার বিধিবদ্ধ শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি অর্থব্যয়ে এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে, অতএব তা জনস্বার্থ— টাটার এই যুক্তি ধোপে টিঁকছে না। দেখা যাচ্ছে, না ছিল সরকারের কোনো প্রকল্প, না ব্যয় হয়েছে সরকারি

অর্থ। সেই কারণে আলোচ্য অধিগ্রহণটিকে 'জনস্বার্থ' আখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না।

চ) এখন এই দ্রুতগতি উন্নয়নের যুগে, রাজ্য সরকারকে যে শিল্পের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, সেটা সম্পূর্ণ বোধগম্য। কিন্তু উন্নয়নের দায়ভার যখন সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীকে, বিশেষত গরিব কৃষিমজুরদের বহন করতে হয়, যাদের ক্ষমতাশালী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার কোনো উপায় নেই, যেমন আলোচ্য ক্ষেত্রে ঘটেছে— সেক্ষেত্রে অধিগ্রহণ আইন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধির অবশ্যপালনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার গুরু দায়িত্ব পালন সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় অধিগ্রহণ আগাগোড়া বাতিল বলে গণ্য করা হবে। অধিগ্রহণ আইনের ধারাগুলি অনুসরণ দায় সারা নয়। তা যদি হয়, তার অর্থ দাঁড়ায়, রাষ্ট্রের এমিনেন্ট ডোমেইন ক্ষমতা এক্সিকিউটিভদের হস্তান্তরিত করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে এটা মেনে নেওয়া যায়না।

আলোচ্য ক্ষেত্রে মোটর শিল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে তা ভ্রষ্টাচার হয়নি। অধিগ্রহণ আইনের সপ্তম পরিচ্ছেদের ধারা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণ করা হয়নি বলেই, এই অধিগ্রহণ ভ্রষ্টাচারে পরিণত হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদের অবশ্যপালনীয় স্তরগুলি পাশ কাটানোর জন্য, একটা কোম্পানির চাহিদা মেটাতে 'জনস্বার্থের' মোড়ক লাগানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের এবম্প্রকার ভূমিকা প্রবলভাবে ভ্রষ্টাচার এবং বেআইনি, আইনানুসারে পুরোটাই খারিজ। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের এরকম ক্ষমতার অপব্যবহার কখনোই মঞ্জুর করা যায়না। যদি করা হয়, অধিগ্রহণ আইনের সপ্তম পরিচ্ছেদের আর কোনো যৌক্তিকতাই থাকবে না। শিল্প স্থাপন করলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে, এই যুক্তিতে কোম্পানির জন্য প্রতিটি অধিগ্রহণই তখন 'জনস্বার্থ' হিসাবে প্রতিভাত হবে। অধিগ্রহণ আইনে ৩(এফ) এবং সপ্তম পরিচ্ছেদ যোগ করার ক্ষেত্রে আইনসভার নিশ্চয় এরূপ অভিপ্রায় ছিলনা। মূল ফাইলের নথি, রাজ্য সরকারকে লিখিত টাটার চিঠি, ক্যাবিনেট মেমো ইত্যাদি থেকে এটা পরিষ্কার, বিশেষ একটি কোম্পানির (টাটা মোটর্স) অনুরোধে রাজ্য সরকার সেই কোম্পানীর জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছিল। জমি চিহ্নিতও করেছিল টাটা মোটর্স। এমনকি ৪ ও ৬ ধারার বিজ্ঞপ্তিতেও পরিষ্কার উল্লেখ ছিল যে টাটা মোটর্সের 'ক্ষুদ্র গাড়ি প্রকল্পের' জন্যই জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এর পরেও যদি এই অধিগ্রহণ কোম্পানির জন্য না হয়ে থাকে, কোন্‌টাকে কোম্পানির জন্য বলা হবে, জানি না।

ছ) এটা নিয়ে দ্বিমত নেই যে, জনস্বার্থের আবরণে অধিগ্রহণ হওয়ার ফলে, উক্ত আইনের সপ্তম পরিচ্ছেদের ৩৯, ৪০, ৪১ ধারা এবং ১৯৬৩ সালের জমি অধিগ্রহণ (কোম্পানি) বিধির ৩, ৪ ও ৫ নং বিধি মানা হয়নি। আলোচ্য অধিগ্রহণ কোম্পানির অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও সপ্তম পরিচ্ছেদের ধারা অনুসরণ না করার ফলে এই অধিগ্রহণ বেঠিক এবং খারিজ হওয়ার দাবি রাখে।

জ) উপরন্তু, টাটা মোটর্সের অনুকূলে অধিগ্রহণ হওয়া সত্ত্বেও, তারা লীজের শর্তানুযায়ী উৎপাদন শুরু করতে পারেনি। শিল্প নিগম ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে অধিগ্রহণের খরচ মেটালেও, টাটা মোটর্স উৎপাদন শুরু করেনি এবং জমির দখল ধরে রেখেছে। পরবর্তীকালে তারা যন্ত্রপাতি গুজরাটে স্থানান্তর করেছে এবং বিবাদীয় জমি শিল্প নিগম পুনরুদ্ধার করেছে।

বিচারক গৌড়া উপরোক্ত যুক্তি ও কারণের ভিত্তিতে ১ ও ২ নং প্রশ্নে জমি মালিক/ কৃষকদের অনুকূলে রায় দিয়েছেন। অর্থাৎ বিচারপতি গৌড়া খোলাখুলি মতপ্রকাশ করেছেন যে, সিঙ্গুরে আলোচ্য অধিগ্রহণের সঙ্গে জনস্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ করেছে।

৪

আমরা এবার একই প্রশ্নে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। ১ ও ২ নং প্রশ্নে বিচারপতি মিশ্র একেবারে বিপরীত মত প্রকাশ করেন। বিচারপতি মিশ্রের মতে সিঙ্গুরে আলোচ্য অধিগ্রহণ জনস্বার্থেই হয়েছে। বিচারপতি মিশ্রের যুক্তি হলো—

ঝ) অধিগ্রহণ আইনের ৩(এফ) ধারায় কোম্পানিকে বাদ দেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বর্ধিত সংজ্ঞায়, সরকারি অর্থব্যয়ে সরকারের প্রকল্প বা পলিসি রূপায়নে অধিগ্রহণ করে উন্নয়নের প্রয়োজনে সেই জমি লিজ বা বিক্রয়, জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৩(এফ)(৪) ধারায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন নিগমের (corporation) জন্য জমির ব্যবস্থা করাও জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ঞ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য উন্নতিশীল রাজ্যগুলির মতো শিল্পায়নের স্বার্থে আরও বেশি বেসরকারি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য উৎপাদনশীল শিল্প (manufacturing industry) গঠনে উদ্যোগ নেয়। এই প্রেক্ষাপটে জনস্বার্থ বিচার করতে হবে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং রাজ্যে মোটর শিল্পকে আকর্ষিত করে কারখানা গঠনের অভিপ্রায়ে, রাজ্য সরকার টাটা মোটর্সের প্রস্তাব বিবেচনায় করেছিল। কাজটা শুরু হয়েছিল জমি অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম ছিল অধিগ্রাহক।

ট) ৬(১) ধারার সঙ্গে সংযুক্ত ২ নং ব্যাখ্যা থেকে এটা পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বা পরিচালনাধীন নিগম কর্তৃক ব্যয়িত ক্ষতিপূরণের খরচ সরকারি রাজস্ব থেকে ব্যয়িত বলে গণ্য করা হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ৩(এফ)(৪) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রীয় নিগমের জন্য জমি অধিগ্রহণ জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং সেক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ব্যয় বহন প্রয়োজনীয়

শর্ত নয়। শিল্প নিগমের পক্ষে জমি অধিগ্রহণ এবং টাটা মোটর্সকে সেই জমি লিজ দেওয়া, অধিগ্রহণ আইনের ৩(এফ) ধারানুযায়ী এবং এই আদালতের বিভিন্ন রায় অনুসারে, জনস্বার্থের পর্যায়ভুক্ত।

ঠ) শিল্পায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি। শিল্প স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ পরিণামে জনগণের উপকারই করে। অতএব জমি অধিগ্রহণ আইনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (Part II) রাজ্য সরকার প্রয়োগ করতেই পারে। সুপ্রীম কোর্ট একগুচ্ছ মামলাতে শিল্প স্থাপন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণকে জনস্বার্থ আখ্যাই দিয়েছে।

ড) আলোচ্য ক্ষেত্রে সপ্তম পরিচ্ছেদ অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল না। ৩০/০৫/২০০৬ তারিখে ক্যাবিনেটের পেশ করা প্রস্তাব ইঙ্গিত করছে যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প নিগম গোপালনগর, সিংহেরভেরী, বেড়াবেড়ি, খাসেরভেরী, বাজেমেলিয়া— এই পাঁচটি মৌজায় ১০৫৩ একর জমির অধিগ্রাহক সংস্থা। ক্যাবিনেট প্রস্তাবটিতে অনুমোদন দেয়। জমি নির্বাচনের জন্য টাটা মোটর্সকে নিগম প্রথম থেকে সহায়তা করে এসেছে। শিল্প সংক্রান্ত ক্যাবিনেট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২৬/০৭/২০০৬ তারিখের মেমোতে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। তাতে বলা হয়— ''রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে মোটর শিল্পে বিনিয়োগের গুরুত্ব অনুধাবন করে, দাবিদার (requiring body) পশ্চিমবঙ্গ শিল্প নিগম কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ করা হবে। নিগম রাজ্য সরকারের অধিকৃত এবং পরিচালিত সংস্থা হওয়ার কারণে ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের ৩(এফ)(৪) ধারা মোতাবেক, এই অধিগ্রহণ জনস্বার্থে করা হবে।''

ঢ) ২১/০৭/০৬ তারিখে ৪ ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, জমি সরকার/সরকারি সংস্থা/ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক জনস্বার্থে অধিগৃহীত হতে পারে। জনস্বার্থের ব্যাখ্যা ছিল— কর্মসংস্থান এবং গাড়ি প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অধিগ্রাহক সংস্থা হিসাবে শিল্প নিগমের নাম স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, এই মর্মে সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল। সরকারি সংস্থা/উন্নয়ন সংস্থা অর্থে শিল্প নিগমকেই বোঝাচ্ছে। কারখানায় ১৮০০ এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে ৪৭০০ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার কারণে সরকার এই অধিগ্রহণকে জনস্বার্থ হিসাবে গণ্য করেছে। সরকার যেহেতু অধিগ্রহণকে জনস্বার্থ হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং পুরো ব্যয়ভার বহন করেছে শিল্প নিগম, শুধুমাত্র টাটা মোটর্সের ক্ষুদ্র গাড়ি প্রকল্পের উল্লেখ থাকার কারণে এই অধিগ্রহণ সপ্তম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

সিঙ্গুর অধিগ্রহণের চরিত্র কী ছিল, কোম্পানির স্বার্থে না জনস্বার্থে— এই মৌলিক প্রশ্নে বিচারপতি মিশ্র অপর বিচারপতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

৫

৩,৪ ও ৫ নং প্রশ্নের বিষয় ছিল ৫এ ধারায় দাখিলিকৃত আপত্তিগুলি নিয়মমাফিক নিষ্পত্তি করা হয়েছিল কিনা এবং কালেক্টর প্রদত্ত রিপোর্টে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্য। এই প্রশ্নে দুই বিচারপতি মোটামুটি একমত যে, আবেদনকারীদের তাদের বক্তব্য পেশের যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়নি। ঘটনাটা এইরকম—

৪ ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই অনেক জমি মালিক আপত্তি দাখিল করেছিলেন। ৫এ(২) ধারায় সেগুলি সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক আবেদনকারীর নামে নোটিশের আদেশ হলেও, সে নোটিশগুলি জারি করা যায়নি। লাউডস্পীকারের মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত স্তরে নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়েছিল, তখন সেগুলো জারি করার দায়িত্বও ছিল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (এল এ) কালেক্টরের। এছাড়া ৫এ ধারায় ছয়টি আপত্তি জমা পড়ে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিবাদীয় জমিতে শিল্প সংস্থাও ছিল। তাদের প্রত্যেককেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিশেষ কোনো কারণ না দেখিয়েই অথবা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করেই, আবেদনগুলি খারিজ করা হয়েছিল। আইনের চোখে, কালেক্টরের রিপোর্ট তাই বৈধ নয়।

বিচারপতি মিশ্রের মতে, আপত্তিগুলি কোনো সময়েই বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচিত হয়নি। তদন্ত এবং রিপোর্ট, উভয়ই ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত। টাটা মোটর্সের পছন্দমতো বিশাল এলাকায় জমির উর্বরতার প্রশ্নটি বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। মোটামুটি অনুর্বর জমি নেওয়া উচিত ছিল। বিচারপতি মিশ্র যদিও বলেছেন যে ৫এ ধারায় তদন্তের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরে নোটিশ জারি যদিও আবশ্যিক নয়, তবুও তাঁর মতে উক্ত ধারায় প্রহসনমূলক এবং লোকদেখানো তদন্ত হয়েছিল। ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত তদন্ত। প্রকল্পটি প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে, তাই বিষয়টিকে তদন্তের স্তরে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়।

৬

৬ থেকে ৯ নং প্রশ্নে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি এবং যাথার্থ্য সংক্রান্ত। এই প্রশ্নেও বিচারপতিরা মোটামুটি একমত যে পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্তকে নোটিশ দেওয়া হয়নি, আইনত যা আবশ্যিক। বিচারপতি গৌড়া থোক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ 'আইনের চোখে দুষ্ট' অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিচারপতি মিশ্রের মতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এই আদালতের বিচার্য নয়, কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ 'কনসেন্ট এ্যাওয়ার্ড' প্রদান যে আইনে নেই, সেটা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ৯(৩) ধারায় ব্যক্তিগত নোটিশ প্রদান আবশ্যিক এবং তা করা না হলে ক্ষতিপূরণ অবৈধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু ৪ ও ৬ নং

ধারায় বিজ্ঞপ্তির উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। অর্থাৎ পুরো অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল হয়না।

বিচারপতি মিশ্র পুনর্তদন্তের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু প্রকল্পটি প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে পুনর্তদন্তের কোনো গুরুত্ব নেই। তাই ৫এ ধারায় সঠিক তদন্ত না হওয়ার কারণে, এবং একমাত্র সেই কারণে, বিচারপতি মিশ্র অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিলের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

৭

দুই বিচারপতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বেআইনি এবং অবৈধ ঘোষণা করার একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ১৮/০১/২০০৮ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের আদেশ তাঁরা খারিজ করেছেন। সরকারের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে জমি চিহ্নিত করার আদেশ দিয়েছেন। ১২ সপ্তাহের মধ্যে জমিহারাদের জমির দখল প্রদান করতে হবে। ক্ষতিপূরণ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের থেকে টাকা ফেরত নেওয়া হবেনা। কারণ দশ বছর ধরে তাঁদের রুজি-রোজগার বন্ধ। যাঁরা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেন নি, এল এ কালেক্টরের কাছে গচ্ছিত আছে, তাঁরা সেই টাকা তুলে নিতে পারবেন।

৮

সুপ্রিম কোর্টের আদেশনামা থেকে ঘটনা পরম্পরার যে ছবি পাওয়া যায়, তা এইরকম—

১৯/০১/০৬— বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রধান সচিবের কাছে, টাটা মোটর্স এক চিঠিতে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে, তাদের প্রকল্পের জন্য তাদের চাহিদা জ্ঞাপন করে। টাটার চাহিদা ও শর্ত ছিল—

চাহিদা-১) ভেন্ডর পার্ক সহ জমি- ১০০০ একর

শর্ত- ক) টাটার জমি- ৭৫%, ভেন্ডর- ২৫%, খ) ভেন্ডর নিয়োগে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, গ) বিক্রয়ের মাধ্যমে জমির মালিকানা অথবা ৯৯ বছরের দীর্ঘমেয়াদী লীজ। মেয়াদ অন্তে বিনা শর্তে মালিকানা হস্তান্তর।

চাহিদা-২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নগরায়নের জন্য জমি— পরিমাণ অনুল্লেখিত।

শর্ত- ক) শিক্ষায়তনের জমি বিনামূল্যে দিতে হবে অথবা সরকারকে সন্নিহিত এলাকায় নামজাদা স্কুল স্থাপন করতে হবে, খ) কারখানা জমির অর্ধেক দামে নগরায়নের জমি দিতে হবে।

চাহিদা-৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ— ১০০ এম্‌ভিএ (মেগা ভোল্ট অ্যামপিয়র)

শর্ত- বিদ্যুতের গুণগত মান- ৫০ হার্টজ +/- ৩%, ভোল্টেজ- +/- ৫%

চাহিদা-৪) জল— ১৫০০০ কিউ মি

শর্ত- ভারতীয় মান অনুযায়ী পানীয় জল (IS- 10500)

চাহিদা-৫) রাস্তা— কারখানা সীমানার চারপাশে ৬ লেনের রাস্তা এবং ৪ লেনের প্রকল্পের প্রবেশ পথ।

শর্ত— জমি হস্তান্তরের তিন মাসের মধ্যে প্রবেশ পথ সম্পূর্ণ করতে হবে।

বাণিজ্যিক শর্ত- জমির দাম একর পিছু ২ লক্ষ টাকা। পাঁচ বছর পর ০.১ শতাংশ সুদে জমির দাম মেটানো হবে।

২৪/০১/০৬— টাটার প্রস্তাবের উপর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ও অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিবদের মতামত চাওয়া হয়।

০৮/০৩/০৬— টাটার সঙ্গে শিল্প নিগম কর্তাদের কলকাতায় বৈঠক।

১৭/০৩/০৬- টাটার সঙ্গে শিল্প নিগম কর্তাদের মুম্বাইতে বৈঠক।

কার্যবিবরণী—

টাটা মোটর্স বছরে ২.৫ লক্ষ লক্ষ্যমাত্রায় তাদের সাম্প্রতিক গাড়ি উৎপাদনের এক 'বিশেষ ধরণের প্রকল্প' পশ্চিমবঙ্গে স্থাপনে আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাদের শিল্পনীতির অনুসরণে 'বিশেষ ধরণের প্রকল্প' আকর্ষণে উৎসাহী। কার্যবিবরণীতে **টাটার বিনিয়োগ এবং প্রস্তাবিত কর্মসংসংস্থানের বিবরণ—**

কারখানা, মেসিন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে- ৬৫০ কোটি টাকা

কারখানা ভবন, রাস্তা, জল, নিকাশী, বিদ্যুৎ লাইন, বর্জ্য শোধন- ১৭৬ কোটি টাকা।

নগরায়ন- ১৫০ কোটি টাকা।

কারখানা, মেসিন খাতে ভেন্ডরদের বিনিয়োগ- ২০০ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান- টাটা কারখানায় ১৮০০, ভেন্ডর মারফত- ৪৭০০।

জমির হিসাব ধরা হয়েছিল— টাটা কারখানার জন্য ৪০০ একর, ভেন্ডর পার্কের জন্য ২০০ একর, নগরায়নের জন্য ১০০ একর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে টাটা মোটর্সকে প্রদত্ত সুবিধার প্রস্তাব—

উভয় পক্ষ যৌথভাবে নিম্নলিখিত প্যাকেজ প্রস্তুত করেছিল:

১) টাটা মোটর্সের নিজস্ব কারখানার জন্য এবং ভেন্ডরদের সাব-লিজ দেওয়ার জন্য ৬০০ একর জমি রাজ্য সরকার উন্নীত করে টাটাদের লিজ দেবে। বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকায় ৩০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হবে। মেয়াদ শেষে লিজ পুনর্নবীকরণ করা হবে।

২) রাজ্য সরকার কারখানা ভবন, রাস্তা, বিদ্যুৎ লাইন, জলের লাইন, নিকাশি, পয়ঃপ্রণালী, বর্জ্য শোধনাগার এবং অন্যান্য উপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণ করে দেবে এই সকল বস্তু টাটাদের বার্ষিক ৯০ লক্ষ টাকায় ৩০ বছরের জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য লিজ দেবে।

৩) রাজ্য সরকার ২০০০ বাসগৃহ সমন্বিত পুরোদস্তুর এক টাউনশিপ নির্মাণ ক'রে, টাটাদের বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকায় লিজ দেবে।

২৩/০৩/০৬— এদিন বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব

টাটা মোটর্সকে যে চিঠি দেন, তাতে বলা হয়েছিল, খড়গপুরে ৬০০ একর জমিতে প্রস্তাবিত কারখানা হবে।

২৯/০৩/০৬— রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী টাটা মোটর্সের চেয়ারম্যানকে কারখানার স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে দেখা যায়, প্রথমে খড়গপুরের থেকে ২৫ কিমি দূরে গুপ্তমণিতে কারখানা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তারপর টাটা মোটর্সের ভাইস চেয়ারম্যান রবি কান্তের সঙ্গে মন্ত্রী নিরুপম সেনের আলোচনা প্রেক্ষিতে খড়গপুর টাউনের পাশে একটি স্থান প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু টাটারা কলকাতার কাছাকাছি জায়গা দাবি করেন।

০৫/০৫/০৬— টাটাদের দ্বিতীয় দফা সিঙ্গুরের জমি দেখানো হয়। টাটারা তাদের নির্বাচন সুনিশ্চিত করে।

৩০/০৫/০৬— বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব গাড়ি প্রকল্পের জন্য ১০৫৩ একর এবং তেলিপুকুর মৌজায় নগরায়ন প্রকল্পের জন্য ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সম্বলিত ক্যাবিনেট মেমো প্রস্তুত করেন। মেমোতে প্রস্তাব করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প নিগম টাটা মোটর্সের জন্য পাঁচটি মৌজায় ১০৫৩ একর এবং টাটা হাউসিং কোম্পানি লিঃ-এর জন্য তেলিপুকুর মৌজায় ২০০ একর, মোট ১২৫৩ একর অধিগ্রহণ করবে।

০৫/০৬/০৬— মন্ত্রীসভা উক্ত প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বাক্ষর করেন।

২১/০৭/০৬— অধিগ্রহণ আইনের ৪ ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি।

৩১/০৮/০৬— এল এ কালেক্টরের রিপোর্ট পেশ।

৩০/০৮/০৬— অধিগ্রহণ আইনের ৬ ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি।

২৫/০৯/০৬— ক্ষতিপূরণ ঘোষণা।

২০/১২/০৬— টাটা মোটর্সকে জমির দখল অর্পণ।

১৫/০৩/০৭— টাটা মোটর্সের অনুকূলে লীজ দলিল।

০৩/১০/০৮— টাটা প্রকল্পে ক্লোজার ঘোষণা

৯

সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সিঙ্গুরের কৃষকরা তাদের জমি ফেরত পাবেন। এই রায় তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিয়েছে। সব থেকে বড়ো কথা, সিঙ্গুরে ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম না ঘটলে, সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ আছে। টাটাদের হাত থেকে সিঙ্গুরের জমি দখলমুক্ত করেছে কৃষক সংগ্রাম। এই দখলমুক্তিই যে বিচারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করেছে, সেটা কিন্তু তাদের বক্তব্যে সুস্পষ্ট। শেষ বিচারে অধিগ্রহণ বাতিল হয়েছে, বিচারকদের সহমতে, পদ্ধতিগত বিচ্যুতির কারণে। বিচারপতি গৌড়ার বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতার সুর লক্ষণীয়, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য রায়কে অতিক্রম করে, তাঁর বক্তব্য ভবিষ্যৎ অধিগ্রহণ মামলায় কতটা প্রভাব বিস্তার করবে, সেটা সময়ই কেবল বলতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সিঙ্গুর সমস্যার তাই আপাতত সমাধান হয়েছে বলা যায়, কিন্তু অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল দ্বন্দ্বের, অর্থাৎ কর্পোরেট সংস্থাকে অধিগ্রহণ আইনের পরিধি থেকে বাদ দেওয়া, তার সমাধান হয়নি।

১০

সিঙ্গুর আন্দোলনের অনেকগুলি দিক আছে। প্রথমত, সিঙ্গুরের কৃষক জনতার চাহিদা, দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের রাশ যারা ধরলো, সেই তৃণমূল দলের দৃষ্টিভঙ্গি, তৃতীয়ত, কর্পোরেট উন্নয়নের স্বরূপ এবং সরকারের ভূমিকা।

সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালের মে মাস থেকে, টাটারা যখন জমি পরিদর্শন করতে এসেছিল, সেই সময় থেকে। আন্দোলনের পরিচালনায়. ছিল 'কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি' এবং পরবর্তীকালে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'। তাদের প্রথম ও প্রধান দাবি ছিল টাটা প্রকল্প বাতিলের। অর্থাৎ কৃষক আন্দোলনের মূল দাবি ছিল সম্পূর্ণরূপে অধিগ্রহণ বিরোধিতা। সেপ্টেম্বর মাসে মমতা ব্যানার্জি আন্দোলনে যোগ দিলেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে আন্দোলনের রাশ তাঁর হাতে চলে যায়। দাবিরও পরিবর্তন ঘটে গেল। ৬০০ একর জমি থেকে অধিগ্রহণ বাতিলের দাবি তুলে নেওয়া হলো। ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক বিভাজন তুলে কেবল ৪০০ একর জমি ফেরতের দাবিটাই প্রধান হয়ে উঠলো।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকটিকে অধিগ্রহণ বিরোধী কৃষক আন্দোলনের দশক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সিঙ্গুর সহ এই আন্দোলনগুলির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য কর্পোরেট সংস্থার অনুকূলে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা। এই দাবিটা মমতা ব্যানার্জী করেননি। মমতা ব্যানার্জীর দাবি আদালত সহ কোথাও স্বীকৃতিও পায়নি। সিঙ্গুর আন্দোলন মমতা ব্যানার্জীকে রাজ্যে ক্ষমতার শীর্ষে বসিয়েছে, কিন্তু শিল্প-বিরোধী তকমা ঢাকতে যে দাবিটা তিনি তৎকালীন রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন, তা 'মা-মাটি-মানুষের' চাহিদার সঙ্গে অন্তত সঙ্গতিপূর্ণ ছিলনা।

সুপ্রিম কোর্টের আলোচ্য আদেশনামা থেকে যেটা সবথেকে বেশি প্রকট হয়েছে, সেটা কর্পোরেট উন্নয়ন বা আরো স্পষ্ট ভাষায় কর্পোরেট লুণ্ঠনের স্বরূপ। কর্পোরেট-গভর্নমেন্ট দোস্তির এক দুষ্প্রাপ্য চিত্র আদেশনামার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। আদেশনামায় ২০০৬ সালের মার্চ মাসে রাজ্য সরকার-টাটার যে যৌথ প্যাকেজের উল্লেখ আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, পুরো প্রকল্পটাই সরকারি অর্থব্যয়ে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। অর্থাৎ টাটাদের প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগই করতে হতো না। দীর্ঘমেয়াদী লিজে বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে টাটারা একটা রেডিমেড ব্যবসাক্ষেত্র পেয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, জমি যা অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা বাদে আরও ২০০ একর জমি নিকটবর্তী তেলিপুকুর মৌজায় অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ছিল। প্রাইভেট পুঁজি আপ্যায়নের উন্মাদ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

কর্পোরেট পুঁজি যেখানে সর্বাধিক মুনাফার গন্ধ পাবে, সেখানেই আশ্রয় নেবে। লুঠ করবে প্রাকৃতিক সম্পদ, যা প্রান্তবাসী মানুষের জীবনধারনের অবলম্বন। আর এটাকেই বলা হচ্ছে উন্নয়ন। একদিকে কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মাপকাঠি দারিদ্র্য সীমারেখা, দিনে ৩০ টাকা রোজগার। অপরদিকে ফোর্বস ম্যাগাজিনের খবর— ভারতে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যাবৃদ্ধি। সম্পদের বিতরণ নয়, সম্পদের পুঞ্জীভবন উন্নয়নের মাপকাঠি।

মধ্যবিত্তের কাছে উন্নয়ন ফেরি করে কর্মসংস্থানের স্বপ্ন। সিঙ্গুরে টাটা প্রকল্পে কর্মসংস্থান হতো সাকুল্যে ৬৫০০। তখনই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল, সরকারি হিসাবে ৩৩.৫ লক্ষ। যদি ধরে নেওয়া যায়, এই রাজ্যের বেকাররাই শুধু চাকরি পাবে, তাহলেও বেকারের সংখ্যা শূন্য করতে কটা টাটা প্রকল্প প্রয়োজন, একবার হিসাব করে দেখুন। মানুষের ভিটেমাটি চাঁটি হয়ে যাবে।

১১

উন্নয়ন এখন এক সাংস্কৃতিক নির্মাণ। এই নির্মাণে কর্পোরেট পুঁজির সবথেকে বড়ো সহায়ক ভারতের বৌদ্ধিক সমাজ। কর্পোরেট পুঁজির বিরোধিতা মানেই শিল্প-বিরোধিতা— এমন এক ধারণা মানুষের মননে প্রোথিত করে দেওয়া হচ্ছে। সচেতন প্রয়াস চলছে 'There is no alternative (TINA)' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার। সম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, পুষ্টি, সাহিত্য, সংবাদপত্র, টিভি সহ জীবনযাত্রার যাবতীয় উপকরণ কর্পোরেট বাজারের নিয়ন্ত্রণে। এই বাজারে যাদের প্রবেশাধিকার আছে, উন্নয়ন শুধু তাদেরই পরিচর্যা করে। আর বাকিরা বশীভূত থাকবে রিলিফ-সম্বল জীবনযাত্রায়। মানুষের সচেতনতা পঙ্গু করার লক্ষ্যে সংগ্রামের লঘুকরণ আজ রাজনৈতিক প্র্যাক্টিসের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সবারই লক্ষ্য রিলিফ-রাজনীতির মাধ্যমে অনুগত বাহিনী গঠন করা। শাসক দলের অনুগত থাকা মানে পুঁজির অনুগত থাকা। বিরোধী শিবিরে যারা আছে, তারাও যেহেতু 'উন্নয়ন ভাবনায়' জারিত, তাদের অনুগত বাহিনীও আখেরে পুঁজির সেবাদাস।

উন্নয়ন সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ সম্ভব একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার আশ্রয়ে। কর্পোরেট-সরকার দোস্তি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। জমি-জীবিকা থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রান্তিক মানুষ কোনো রাজনৈতিক দলকে পাশে পাবে না। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক সাহারা পাবে না। তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভে ত্রাণকর্তা হিসাবে হাজির হবে বড়জোর কোনো এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মনমোহন সিং-এর মতো দক্ষ উপদেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস এই একচ্ছত্র ক্ষমতার গ্যারান্টি কর্পোরেট দুনিয়াকে দিতে পারেনি। মসনদে তাই বিজেপি-র আবির্ভাব। পঞ্চায়েতে, বিধানসভায়, ট্রেড ইউনিয়নে, শিক্ষায়তনে সর্বত্র বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-এর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল দোস্তি পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে উঠেছিল। একটাই ভুল বুদ্ধদেব বাবুরা করেছিলেন। লালঝান্ডাটা ছাড়তে ভুলে গিয়েছিলেন।

আজকে মমতা দেবীও সেই একই পথে চলেছেন। তার ক্ষমতা অর্জনের পথটা হয়তো 'গণতান্ত্রিক' নয়, কিন্তু অসাংবিধানিক নয়। জিন্দাল, গোয়েঙ্কা, নেওটিয়াদের সাথে তার যথেষ্ট দহরম-মহরম। দেশ-বিদেশ থেকে কর্পোরেট জায়ান্টদের ভাড়া করে আনার চেষ্টায় তাঁর ত্রুটি নেই। গণতান্ত্রিক অধিকার কাকে বলে, তিনি মানুষকে ভুলিয়ে দিচ্ছেন। মাওবাদী, দেশদ্রোহী বিশেষণে সাধারণ মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ। অধিগ্রহণের সোজা রাস্তায় না দিয়ে, ভূমি সংস্কার আইন ব্যাপক সংশোধন করে খিড়কির রাস্তায় কর্পোরেট সংস্থার হাতে জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে। এখন ল্যান্ড ব্যাঙ্কের জমি ভূমিহীন কৃষকদের হাতে না গিয়ে, কর্পোরেটের হাতে যাচ্ছে। 'এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে' হয়তো তিনি পৌঁছে যাবেন কর্পোরেটের সিংহদুয়ারে।

তবে বুদ্ধদেব বাবুরা ভুলে গিয়েছিলেন, মমতা দেবী হয়তো মনে রাখেন নি, নরেন্দ্র মোদী জানেনই না যে আসল সুপ্রিম কোর্টটা আসলে দিল্লীতে নয়, ভারতবর্ষে। ❐

লেখকের জবাব

অনীক আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায় বন্ধু সুমন কল্যাণ মৌলিক তাঁর 'সিপিআই (এম)— আত্মপরিচয়ের গভীরতম সঙ্কট' প্রবন্ধে আমার লেখা একটি প্রবন্ধে (*অনীক*, জুন ২০১৬) উল্লেখিত তথ্য ও বক্তব্যে ''যুক্তির ফাঁকি'' দেখেছেন। যে উক্তিটা তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তার আগে ও পরে কিছু কথা ছিল। সেই পরম্পরাতে আমি কিন্তু কোথাও বলিনি, তৃণমূলের ''মোট ভোট'' কমেছে। আমি তথ্য দিয়েছি মূলত শহরাঞ্চলের, আর ভোট কমার কথা নিয়ে স্পষ্ট করে বলেছি ''শহরাঞ্চলে, বিশেষত কলকাতায়, তৃণমূলের ভোট কমেছে।'' তাছাড়া স্বয়ং তৃণমূল নেত্রীর ৩০ শতাংশ ভোট কমে যাওয়া, ভাবার্থে তৃণমূলেরই ভোট কমে যাওয়া।

হয়তো বাক্যবিন্যাসের ত্রুটিতে বিষয়টা অন্যরকম প্রতিভাত হয়েছে। সমালোচনার জন্য শ্রী মৌলিককে ধন্যবাদ।

পরিচয় কানুনগো
০১/০৯/১৬

কালো আমেরিকার কবিতা

শঙ্খ ঘোষ

সব মেলানো এ এক জাদুঘট
পুরুষ-নারী সবাই ঢুকতে চান
চেক অথবা গ্রিক অথবা স্কট—
বেরিয়ে আসেন সবাই আমেরিকান!

জোহান কিংবা জান অথবা জাঁ কিংবা হুয়ান
জিওভান্নি অথবা কেউ ইভান
ঢোকেন আবার বেরিয়ে আসেন সেই জাদুঘট থেকে
সক্কলে জন, সবাই আমেরিকান!

কাণ্ড দেখে স্যাম বলে যে, 'আরে, ব্যাপারটা কী?
ওরা আসার আগেই আমি ছিলাম—'
ঢুকতে গেল সেও সে-ঘটে, কানাত ছোঁবার আগেই
ছিটকে দিল, ভুলিয়ে দিয়ে ধাম।

যতবারই ঢুকতে যায় সে, ততই সবাই মিলে
দিচ্ছে তাকে ছেঁটে—
'দূর হয়ে যাও, এই ঘটটা কেবল আমাদেরই
ওই কালো দাগ চাই না লাগুক এতে।'

শেষ অবধি, হাজারোবার ছুঁড়ে দেবার পরে
'কুছ পরোয় নেই' বলল সে-স্যাম—
'দাও ছেড়ে দাও পুরোনো ঘট। চাও বা না-চাও তুমি
থাকব আমি যেমনতরো ছিলাম।'

তন্ত্রকথা

সব্যসাচী দেব

ক্রমশ নগর বাড়ে, দয়াহীন, মনহীন রোবট নগর
আলোর ফোয়ারা তার চারপাশে, কাচের জানলায় মুখ রাখে
সুখী তৃপ্ত মানুষেরা, ডানায় গতির ছোঁয়া, আরো জোরে, আরো
ফ্লাইওভারের নীচে পড়ে থাকে নোংরা ক্লান্ত পুরনো শহর

বাজারের ঠাসা ভিড়, ঠেলা ভ্যান, ঝাঁকা মুটে, ঘাম ঝরে পথে
অদূরে গঙ্গার স্রোত, পাপহরা, জোলো হাওয়া এপথে আসে না
কলকাতায় গ্রীষ্মদিন, দ্বিপ্রহর, উপরে কি বাতাস শীতল!
সেখানে বাইক-দৌড়, নেশাগ্রস্ত। পদাতিক পাবে না ঠিকানা

কলকাতা একদিন ভরে উঠবে স্কাইস্ক্র্যাপারের ভিড়ে ভিড়ে
স্কাইওয়াকের পাশে নেমে আসবে নীল সাদা আকাশপরীরা
পুঁজির মদির বাস মম করবে সুরভিত উপর তলায়
মোহান্ধ সপ্নের ঘোরে উপনিবেশের রাতে তৃপ্তির ঢেঁকুর

দু-একটা উড়ালপুল ধসে যদি, ধসে যাক, কী বা আসে যায়
মরবে কয়েকজন, সংখ্যা মাত্র, ঘেমো গন্ধ, তারা শুধু 'লোক'
পায়ে হাঁটে, বাসে ট্রামে বা রিক্সায় চড়ে, থলেতে বাজার
ফুটপাথে ঘুমোয় কেউ, গোত্রহীন, ভোটহীন, চালচুলো নেই

মেট্রোপলিসের জাদু ফুসমন্তরে আনে রঙিন তামাশা
লাশের স্তূপের শিরে লিখে দেব ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি
রক্তরেখা মুছে যাবে রোদেজলে, স্মৃতিও ফ্যাকাশে হয়ে যাবে
নতুন যজ্ঞের শুরু, পট্টবস্ত্র, মন্ত্রপাঠ, হাঁড়িকাঠ, আর কিছু বলি

সিঙ্গুরনামা

সৃজন সেন

১.
সকলকে বানিয়ে সেইদিন বুরবাক,
কালীঘাটে সিঙ্গুর হয়েছিল হাইজাক।

নন্দীগ্রাম ফয়সালা করেছিল মাঠে,
সিঙ্গুর জয় কেনে আইনের হাটে।

পোড়ামুখী তাপসী ভাবে শুয়ে মর্গে,
এর চেয়ে বেশি সুখ আছে কিরে স্বর্গে?

২
শাসকের শাসিতের একসাথে হলে জয়,
প্রকাশ কোরো না তুমি এতটুকু সংশয়।

দুটি দিন যেতে দাও, তারপরই দেখিবে,
সব ধান শাসকের গোলাতেই ঢুকিবে।

চাল পারে শাসকেরা, শোষিতরা শুধু তুষ,
শাসকের ঢেকুরে শোষিতের দিল খুস্!

অবশেষে একদিন দেশবাসী দেখিবে
কোনো ভাগ না দিয়ে শোষিতরা জিতিবে।

৩
জয়টাই তো আসল কথা,
কার জয় বা কীসের জয়,
এসব ভাবনা নয়কো এখন,
ভাবলে ছন্দপতন হয়।

ইঁদুর মরে গর্ত খুঁড়ে,
সাপ সেখানে বানায় ঠাঁই,
মা মনসা তার ভরসা
সাপ মারার যার তাকৎ নাই!

৪
ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে,
পেত্নী দেখি হি হি হাসে।

লড়াই ছেড়ে আদালতে,
যেতেই হলো কেল্লা ফতে।

মিছিল-ঘেরাও ত্যাগ করে আজ
ওরে তোরা শান্ত হ',
মা টেরেসার ভজন-পূজন
চাইরে করা প্রত্যহ।

তোর জন্য

অশোক চট্টোপাধ্যায়

'Thou art my liberty'

তোর জন্য ঘর ছেড়েছি
পথের সাথী তুই
ভাঙা মেঘের ঝর্নাধারা
তোর দু' চোখে রুই

তুই যে আমার দিনের আলো
রাতের অভ্র হাসি
ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয়
বৃন্দাবন আর কাশী

বস্তারে কি কাশ্মীরের রাত
যখন নামে ধীরে
আমরা তখন দুই পদাতিক
ক্ষুব্ধজনের ভিড়ে

জীবন খুঁজি মরণ দেখি
হাসির মধ্যে জিদ
সাহস দেখি আকাশ আকাশ
স্বপ্ন হরষিত

তোর চোখে যে পেলেট হাসে
আমার বুকে ক্ষত
হাজার বছর রণক্ষেত্রে
আমরা যুদ্ধরত

তোকে ছেড়ে কোথায় যাবো
কোথায় যাবি তুই
তোর দু' চোখের গঙ্গাধারায়
আমার ক্ষত ধুই

জীবন গাঙের অথৈ জলে
ভাসে কলার ভেলা
বেউলা লখাই লড়াই শেখে
সকাল সন্ধ্যাবেলা

আগস্ট ৩০, ২০১৬

ছড়ার ছড়ি

অচিন্ত্য সুরাল

১.
একটা রোগা সুঁটকো দড়ি
দাম ছিল তার দু-চার কড়ি।
একদিকে হ-রিদাস পাল
শিল্পপতির প্রিয় দুলাল।
অন্যদিকে কাষ্ঠমূল
গোড়ায় পোকা, আগায় হুল।
ছাপান্ন ইঞ্চি যার
তাকেই দড়ি? হোক বিচার।
যেই না এল ভোটের চাপ
বাপ রে বাপ, বাপ রে বাপ!
শিল্পপতি চালল চাল
হেই সামাল, হেই সামাল।

টান লেগে দড়িটার আহা কত কষ্ট
এই বুঝি ছিঁড়ে গেল, ভয়ে সে তটস্থ।
কোথা থেকে কী যে হলো খুঁটি মুখ থুবড়ে—
কীসে যেন ঠোকা লেগে গেছে সেটা উপড়ে।
তেল মেখে দড়িটাও ফিরে পেল স্বস্তি
তার দুই প্রান্তের গাইল প্রশস্তি।

কী কথা হলো কী জানি, দুই ভাই-বোনে
দড়িটা বদলে গেল রাখিবন্ধনে।

২.
ফাঁসি তো দিচ্ছে, ক-জনকে দেবে
মরবে যে মাথা খুঁড়ে।
রাজনীতিতে আসামি বাড়ছে
পাবে কি অত ফাঁসুড়ে!

৩.
তোমায়-আমায় ভয় দেখাবে পুলিশ
'কেষ্ট'-বিষ্টুর ভয়ে পুলিশ কাঁপবে।
আড়াল থেকে ঠিক করে দেয় তর্জনী
কখন, কোথায়, কার ঘাড়ে, কে চাপবে।

৪.
মন্ত্রী আছে, আমলা আছে
এবং পুলিশ আছে
সবাই মিলে দিব্যি বাঁচে
হযবরল-র ধাঁচে।
হিসেব কষে কাক্কেশ্বর
ভোট গুণেছে আর
শিয়াল, কুমির, ন্যাড়া আদি
সাক্ষী ছিল তার।
সংখ্যালঘু ভোট দিয়েছে
ভোট দিয়েছে হিন্দু
ভোট না দিলে নামের আগে
বসবে চন্দ্রবিন্দু।

৫.
কোন্ পথে যাবে, কোথায় দাঁড়াবে
একটুও নেই ছায়া।
ভোটরঙ্গের উলঙ্গ নাচ
এমনই তা বেহায়া-
ভোট আসে আর ভোট চলে যায়,
গণতন্ত্রকে দেয় না রেহাই,
'নিশ্চিহ্ন'কে চিহ্ন চেনায়
'চিহ্নিত' মরে ভয়ে।
বাংলার মুখ পুড়ে ছারখার,
প্রশাসন যেন ত্রাসের আধার,
সাংবিধানিক পতাকা ওড়ায়
শাসকের কনভয়ে।

৬.
রাষ্ট্রপ্রধান ভারতবাসী
মন্ত্রীপ্রধান হিন্দু
আমজনতা রামজনতার
একটি মিলনবিন্দু
বিন্দু ঘিরে দেশটা বিশাল
নামটি ভারতবর্ষ
রা-এ আমটি খাবে কেড়ে
সেটাই মতাদর্শ।

তোমার মানচিত্র জুড়ে ক্ষত

মৃন্ময় চক্রবর্তী

ওরা তোমাকে হত্যা করেছিল স্বদেশ
কিন্তু হত্যার কথা লুকোতে পারেনি।
আবার তোমার ক্ষতগুলো কথা বলছে
আবার তারা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে।
তোমার স্তনের পাহাড় ছিন্ন করে
ওরা বেনিয়াদের ভেট দিয়েছে।
তোমার যোনি ও জঠর জুড়ে যে উপত্যাকা
যে নদী ও অরণ্য তাতে ওরা ঢেলে দিয়েছে
অজস্র বুলেট
গলিত সীসার বীর্য।
তোমার মানচিত্র জুড়ে রক্তপাত,
ভুয়ো এনকাউন্টার।
আমরা দেখছি স্বদেশ
তোমার হত্যার চিহ্ন মাখা ক্ষমতায়, শাসকে
কোনো প্রভেদ নেই।
তাদের দাঁত আর নখে
তোমার মাংস লেগে আছে।
ওরা লুকোতে পারেনি
কিছুতেই লুকোতে পারেনি।

সীতা বলে ডাকলে জেনো

মধুছন্দা মৈত্র

সীতা বলে ডাকলে জেনো
বৃষ্টি আসে মেঘের খামে
লোকাল ট্রেনে বাদাম বেচে
হারিয়ে গেলে অন্য মনে।

বেলডাঙার সেই মাছের ভেড়ি
আমায় দিলে পয়সা গুনে
ভোরবেলাতে পুলিশ এলে
দেখলে না আর পেছন ফিরে।

লব কুশ যে বড়োই ছোটো
দেখলাম ওদের চায়ের স্টলে
নতুন বউ-এর আবদারেতে
এখন তুমি দিশেহারা।

পেট কোঁচড়ে বাংলা চোলাই
মাঝে-মধ্যেই পুলিশ টানে
সীতা বলে ডাকলে তবু
শূন্য গাঙে বৃষ্টি নামে,

ঝড় থেমে গ্যাছে

বিকাশ চন্দ

নীরব মুখের মিছিল মৃত্যুর প্রতিবাদে
আরও নীরবতা বাড়ে অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘশ্বাসে
কেউ না কেউ শূন্যস্থান ভরে দেবে প্রত্যাশা
ভরে নেবে অভয়া কী নির্ভয়া অবলা, নিজস্বী অঙ্গীকার
অরূপ রতন দোল খায়-
ডাঁয়ে বাঁয়ে ঠিকঠাক সেঁটে যাবে সুখ।

দূর্বাদল শ্যাম নাম জপেছিল রাধা-
রাধাচূড়া ফুল মাখে হলুদ আগুন রঙ
অকুস্থল লটপট পতাকা ফেস্টুন আরও
দলা পাকানো ফুলের ভেতর
রক্তমাখা ফুলেদের শরীর
হা-হা উল্লাসে বাতাসের রঙ বদলায় আবীর।

ফি-বছর অশোক ষষ্ঠী তিল তর্পণ এবম্বিধ
বেদীমূলে রাশিকৃত মুখ নাকি ফুল বড়ো নিরীহ
মানুষ নাকি উজানী সমুদ্রে পাড়-ভাঙা ঢেউ
দরজা খোলাই আছে চৌকাঠে জাগানিয়া মা
এবার তো ফিরে আসবে ছেলে— ঝড় থেমে গ্যাছে...

একলা উদাস

সুশান্ত ভট্টাচার্য

মন, তুমি চুরি হয়ে যাও বাতাসে,

তোমাকে ছাড়া মেঘলা দুপুর
উদাস সে তো পায়ের কাছে,

দেখছো না ওই নয়নজুলি
হাড় হাভাতের রক্তমাখা পাকস্থলী,

এভাবে ঠিক প্রেম হয়না,
মুখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা
ভাঙা আয়না।

একলা উদাস পায়ের কাছে
সন্ধ্যারতির শর্ত ছিলো— তাই তো ধূসর
দুঃখগুলো এমনি বাঁচে— এমনি বাঁচে।

এ মহা জীবন

শ্যামলী রক্ষিত

এখন শীত ঘুমের সময়,
নীরবতা ভেঙে দিও না
সরীসৃপ শ্রেণী জেগে যাবে।
অকাল বর্ষণ নেমে এলে
একে একে ঋতুমতী নগরীর
দাহ যন্ত্রণায় ভরে উঠবে
গ্রাম্য চাষার নরম মাটি।
বহিরাগত ব্যাপারিদের ধারাল
নাকের ডগায় বিপ্লব থেমে যাবে।
চৌচির মাটির বুক ঠেলে উঠে
আসবে, ফিনকি দিয়ে টকটকে
লাল নবীন লোহিত কণা।
আঁশটে স্রোতস্বিনী ছেড়ে মাছেরা
ভেসে যাবে সমুদ্রের অথৈ জলে।
সাগরও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,
তাই এখন এই কালাশৌচের সময়
একজন দেহাতি নীলকণ্ঠকে চাই
স্পারটাকাসের মত যার পেশী ফুঁড়ে
বেরিয়ে আসবে বিপ্লবের গান।
কোরাস সঙ্গীতে ভিজে যাবে
চির সবুজ গ্রাম দেশের মাটি
লাঙলের ফলায় চলকে পড়বে
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—
আর লেনিনের দাড়ি থেকে
মেঘ সরে গিয়ে নামবে বৃষ্টিধারা
ভালোবাসার মত একটা মাটি ছুঁয়ে
দাঁড়িয়ে থাকবে জীবন, এ মহা জীবন।

বিবর্ণ জীবনের দুটো পংক্তি

কালীপদ ঘোষ

সমস্ত কাজ ফেলে রেখে
এসো আলোকিত সন্ধ্যায় ইজিচেয়ারে বসি দুজনে
জীবনটাকে ছড়িয়ে দিই
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে।

টেবিলের নীচে অন্ধকার বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে।
একাকিত্ব কাটিয়ে ফেলে আসা সোনালি
দিনগুলোর দিকে একটু চোখ মেলে
আর একবার দেখে নিই
এক নতুন সানগ্লাস পরে...

আকাশের গায়ে লিখবো
নীল অক্ষরে বিবর্ণ জীবনের দুটো পংক্তি।

কর্মজীবনের দিনপঞ্জী বই চশমা কলম
জীবনদর্শন এখন একটু বিশ্রাম নিক
বিশ্রাম নিক অভ্যস্ত ধারাপাত।
সময়ের গায়ে জ্বর, জীবনের গায়ে খোদাই করবো
একটা নীল আকাশ আর একটা পাখি...

আমরা শুধু বাঁচবো আর বাঁচবো
আর দুচোখ ভরে দেখবো নদীর জোয়ার ভাটা...

গণমঞ্চ

অজয় সেন

পর্দা ওঠে।
মঞ্চের নামানো পর্দায়,
রাজা আসে রাজা যায়

যখন
অন্ধকার ভেঙে
জনতাই রাজপথে নামে,
পর্দা ওঠে...

নামে না আর

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বাজারসর্বস্ব বিশ্বায়নের সংস্কৃতি

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা: পুঁজিবাদ ও ব্যক্তি মানুষের মনোজগত

সোভিয়েতের পতনের পরের পৃথিবী হলো বাজারসর্বস্ব বিশ্বায়নের পৃথিবী। এই বিশ্বায়ন শ্রমজীবীর বিশ্বায়ন নয়, এই বিশ্বায়ন পুঁজির বিশ্বায়ন। পুঁজির যে নিজস্ব যুক্তি, তার অস্তিত্বের যা সহজাত, সেটা এই রকম যে সমাজবদ্ধ মানুষের উৎপাদন ও ভোগের যে জগৎ সেটিকে থাকতে হবে পুঁজির অনুকূলে। উৎপাদনের কাজটা অবশ্যই শ্রমজীবীর যৌথ শ্রমের কাজ, কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগ এই যৌথ শ্রমে সৃজনশীলতার গুরুত্ব ক্রমাগত কমিয়ে আনবে— সৃজনের জন্য যে মেধাশক্তির প্রয়োগ সেটা উৎপাদনের জগৎ থেকে আলাদা, সেখানে 'কী করতে হবে'র বাইরে তার কোনো কিছু জানার বা ভাবার দরকার নেই। মেধাশক্তি প্রয়োগের যে ডিপার্টমেন্ট, সেখানেও শ্রমবিভাগ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে মেধাকেও তার বিচরণক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে আনতে বাধ্য করে। নভঃবিজ্ঞানের জটিলতার জগতে যে বিজ্ঞানীকে তাঁর মেধাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, দেখা যায় যে তাঁর সীমিত বিচরণক্ষেত্রের বাইরে তাঁর যে ধ্যানধারণা, সেটা 'গুগ্‌ল' সার্চ করে যতটা পাওয়া যায়, তার বাইরে প্রায় কিছুই আর নেই।

শ্রমবিভাগ মানুষের উৎপাদন জগতে আবির্ভূত হয়েছে বহু যুগ আগে। সেই শ্রমবিভাগকে এই পর্যায়ে নামিয়ে বা তুলে এনেছে পুঁজিবাদ তার নিজস্ব তাগিদে। শ্রমবিভাগ কাজে দক্ষতা বাড়ায়, দক্ষতাকে চরম পর্যায়ে তুলতে হয় পুঁজিবাদকে, কেননা দক্ষতা বৃদ্ধির গতি যত বাড়ে উৎপাদনব্যয় তত কমতে থাকে, উৎপাদন ব্যয় কমলে বাজারি প্রতিযোগিতায় জয়লাভের সম্ভাবনা বাড়ে। পুঁজির অস্তিত্বেই আছে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে থাকা খণ্ড পুঁজির মধ্যেকার লড়াই— বাজার দখল করার লড়াই, আর সে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে পুঁজির কেন্দ্রীভবন (concentration) এবং একেন্দ্রিভূত (centralisation) ঘটা, এবং তার মধ্য দিয়ে পুঁজির সঞ্চয় (accumulation) বৃদ্ধি। এটা হলো ইচ্ছামুক্ত সত্য, কোনো পুঁজিপতি চাইলেই এটা এড়াতে পারবে এমন নয়। এই লড়াই-এ টিকতে হলে উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে হবে, জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠা শ্রমবিভাগ যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

শ্রমবিভাগ যত বাড়ে, উৎপাদনক্ষেত্রে সৃজনশীলতা প্রয়োগের সুযোগ তত কমতে থাকে। মানুষের অস্তিত্বের স্বাভাবিক উপাদান কিন্তু তার এই সৃজনশীলতা, পশু পাখির জগৎ থেকে যে জন্যই তার জগতে থাকে ভিন্ন মাত্রা ('পাখিকে দিয়েছো গান, তাই গায় গান/ তার বেশি করে না সে দান/ আমারে দিয়েছো শুধু স্বর/আমি তার বেশি করি দান/আমি গাই গান')। বিষয়টার তাত্ত্বিক দিকটি মার্কস প্রথমে আলোচনা করেন তাঁর 'ইকনমিক্যাল অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট' (১৯৪৪) রচনায়। উৎপাদনে সৃজনশীলতা প্রয়োগের ক্ষেত্র যত সংকুচিত হয়, মানুষ তার প্রধান যে কাজ— উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার কাজ— সেই কাজ থেকে ক্রমশ নিজেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই সমস্যাটা হলো alienation বা মানসিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। পুঁজিবাদ তার স্বধর্ম অনুসারে যত বেশি এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা আনে মানুষের সৃজনশীলতা প্রয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রটিতে, ততই তার চরিত্রে একটা বিকার ঘটে। উৎপাদন ক্ষেত্রে অবদমিত এই সৃজনশীলতা তার প্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজে নেয় উৎপাদন ক্ষেত্রের বাইরে তার যে জগৎ, ভোগের জগৎ, যেখান তার স্বাভাবিক ক্ষেত্রটি পশুর জগৎ থেকে আলাদা কিছু নয় (আহার, নিদ্রা ও জৈবিক পুনরুৎপাদন), সেটিতেই। সঙ্গীত সাধনা, চিত্রশিল্পে মন দেওয়া, বইপত্র পড়া— এগুলি এই জগতে মানুষের আবিষ্কার করা মস্তিষ্কচর্চার ক্ষেত্র, পশুর জগৎ থেকে যা আলাদা। কিন্তু পুঁজি যত বেশি শ্রমের ঘনত্ব বাড়ায়, শ্রমের সময় বাড়ায় (প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যা ক্রমশ অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে) ততই মানুষের অবসরের জগৎ ছোট হয়, 'সখের কাজ' করার সময় থাকে না শ্রমজীবীর। পড়ে থাকে সেই সময়টুকুই, আহার-নিদ্রা-জৈবিক পুনরুৎপাদনের জন্য যা ছেড়ে রাখতেই হয়। সৃজনশীলতা প্রয়োগের ক্ষেত্র তাই শেষ পর্যন্ত সীমিত হয় এই জগৎটুকুতেই।

তাতে অবশ্য পুঁজির অসুবিধা নেই, বরং সেটাও যায় পুঁজির অনুকূলেই। মানুষের ব্যক্তিগত জগৎটা যতই এইভাবে সীমিত হয় আহার-নিদ্রা-জৈবিক পুনরুৎপাদনের জগতে— যে জগৎটা পশুর জগৎ থেকে সারের বিচারে আলাদা কিছু নয়— ততই এই মানুষটি হয়ে ওঠে ভোগবাদী, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমুখী মানুষ, পুঁজি যে ভোক্তার জগৎটি চায় তার পণ্য বিক্রয়ের জন্য, তার সাথে একশ ভাগ সংগতিপূর্ণ মানুষ। পুঁজি সযত্নে লালন করে এই মানুষটিকে। পুঁজির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে সমাজ গড়ে ওঠে, সেই সমাজ এই ভোগবাদের ন্যায্যতার যুক্তি নির্মাণ করে। পুঁজি যে হেজেমনি বা মানসিক বলয় নির্মাণ করে, সেটি যত টেকসই হবে ততই পুঁজির ন্যায্যতা বাড়বে, কামান-বন্দুক ব্যবহার না করেই মানুষকে বশে রাখা যাবে, সেই হেজেমনির পক্ষে মতাদর্শ নির্মাণ করা হয়, কঠিন দার্শনিক যুক্তি যোগানো হয় এটির প্রয়োজনীয়তার গ্রহণযোগ্যতা আনতে। মানুষ আসলে এই পুঁজিবাদে এসেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, সে যে স্বাধীন—

যা ইচ্ছা করতে পারে (অর্থাৎ আহার-নিদ্রা-জৈবিক পুনরুৎপাদনে যা ইচ্ছা করতে পারে), সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই পুঁজিবাদের জগতে এসে। মানুষের জীবনযাপনের জগৎটি তার সাংস্কৃতিক জগৎ। পুঁজিবাদ এখানে এনেছে একটা ভিন্ন মাত্রা— ব্যক্তি-মানুষ যা থেকে নিজেকে নিয়েই থাকার রসদ পেতে পারে।

এসব কথা বহু আলোচিত, বহু প্রচারিত। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের যুগে কিন্তু পুঁজি এই মানসিক প্রভাববলয়ের ক্ষেত্রটিকে পুনর্নির্মাণ করছে। পুঁজিবাদ তার প্রাক-নয়া উদারনীতি যুগে যা পেরে ওঠেনি, পাল্টা হেজেমনির যে সব ক্ষেত্রগুলিকে সে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল নানা কারণে— নয়া উদারবাদ সেটার পরিসরকে কমিয়ে আনছে দ্রুতগতিতে। যে জায়গাগুলো সে ছেড়ে রাখছে, সেই ফাঁকটুকুতেও সে সযত্নে লালন করছে প্রাক-পুঁজিবাদী বিষাক্ত আগাছা— যাতে সৃজনশীল প্রয়োগের সামান্য কিছু ক্ষেত্রও পড়ে না থাকে। তার সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডে বিরাজ করবে প্রাক-আধুনিক চিন্তা, মানুষের মানষিক মুক্তির স্বাভাবিক পথগুলোও যাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

নয়া উদারবাদ ও ব্যক্তি-মানুষের মনোজগৎ

নয়া উদারবাদের যা সবচেয়ে অনুকূল উপাদান পুঁজি যা তার মতাদর্শ নির্মাণের কাজে লাগাতে পারছে, সেটা হলো মানুষের মনোজগতে এই চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ সুদৃঢ় করে তোলা যে এর কোনো বিকল্প নেই। মানুষকে বাঁচতে হবে এটা ধরে নিয়ে যে পুঁজিবাদের কোনো বিকল্প নেই, অন্য কোনো সামাজিক ব্যবস্থা অর্জন করা অসম্ভব। এই সমাজ ব্যক্তির জন্য যে মানসিক ভুবন নির্ধারণ করে রেখেছে, ব্যক্তিকে বাঁচতে হবে সেটার অনিবার্যতা ধরে নিয়েই।

কথাটা কিছুটা বিস্তৃতভাবে বলা দরকার। পুঁজিবাদ ব্যক্তি মানুষের যে মানসিক ভুবন নির্মাণ করতে চায়, যে ভুবনে সে উৎপাদনের যৌথ চরিত্রের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতার শিকার আর ভোগের জগতে ইন্দ্রিয় সুখের দাস, মানুষের স্বাভাবিক ধর্মের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মানুষ যূথবদ্ধ জীব— উৎপাদন এবং ভোগ, দু ক্ষেত্রেই সে তাই। তার স্বাভাবিক ধর্মে যে সৃজনশীলতা আছে, উৎপাদন ও ভোগ— দু ক্ষেত্রেই তার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে এই যূথবদ্ধতার পরিমণ্ডলে। সে জন্যই পুঁজিবাদ যে মনোজগৎ নির্মাণ করতে চায়, সেটা সে পছন্দ করে না, মেনে নেয় মানসিক অবদমনের সাহায্যে। মানতে চায় না বলেই শ্রমবিভাগ সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার মধ্যেই শ্রম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে, যেটার অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হলো পরস্পরের হাত ধরা। কাজের মধ্যে সে বানায় যৌথ সঙ্গীত, আনে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের নানা প্রয়াস— একসময় রিক্রিয়েশন ক্লাব, বা ফ্লোরের ক্যান্টিন, ইউনিয়ন অফিসে আড্ডা দেওয়ার মধ্যে তা বাস্তবায়িত হতো; এক সাথে দাবিদাওয়ার লড়াই থেকে যো নিয়ে আসত রাজনীতি সচেতনতা, সমাজ সচেতনতা। পুঁজি এটা পছন্দ করত না অবশ্যই। কিন্তু কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়ার দাবি তুলে, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় করে, ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট চালু করতে বাধ্য করে, আইনে শ্রমিক মঙ্গল (welfare)-এর ব্যবস্থা এনে সর্বত্র শ্রমজীবী এটা আদায় করে নিয়েছিল। উনবিংশ শতক জুড়ে ইউরোপ আমেরিকাতে লড়াই করে শ্রমজীবীরা শ্রমবিভাগ সৃষ্ট মানসিক বিচ্ছিন্নতার বাস্তবতার মধ্যেই কর্মক্ষেত্রে তার বিকল্প একটা মানসিক জগৎ গড়ে তোলার বস্তুগত উপাদানগুলিকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল। রাশিয়ায় একটা পাল্টা সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে এ লড়াই নতুন মাত্রা পেল, শ্রম ও পুঁজির লড়াই-এ এলো একটা অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষ— সোভিয়েত ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিই, স্রেফ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায্যতা নির্মাণের দায়ে এগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করল— শ্রম আইন, ফ্যাক্টরি আইন, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসুরক্ষার নানা ব্যবস্থা এলো যার হাত ধরে।

কাজের বাইরে মানুষের যে সামাজিক জীবন, সেটাও অনেকটা ভদ্রস্থ হলো এর ফলে। সাপ্তাহিক ছুটি, হলিডে— এসব তো ছিলই। সঙ্গে এলো আট ঘণ্টার কাজ, আট ঘণ্টা অবসর এবং আট ঘণ্টা ব্যক্তিগত কাজের ধারণা। অবসরে সৃজনশীলতার অন্য ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ করে মানসিক উৎকর্ষসাধন, পারিবারিক জীবনে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধতর করা, এলাকায়, শ্রমিক মহল্লায় যৌথ বিনোদনের প্রসার— এসবের সুযোগও এলো। পুঁজি যে মানুষ তৈরি করতে যায়, যে মানুষ তৈরি হওয়ার পথে এইভাবে এলো একটা শক্তিশালী প্রতিবন্ধক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই যার বিকাশ ঘটলো।

একমাত্রিক ভোগবাদী মানুষ তৈরি করার পুঁজিবাদী সাধনা অবশ্যই পুরো ব্যর্থ হয়নি। এরই মধ্যে পুঁজিবাদ তার 'হেজেমনি' নির্মাণের কাজটা অব্যাহত রেখেছে ব্যক্তিমানুষের 'স্বাধীন ইচ্ছা'র মিথ্যা চেতনাটিকে জোরদার করে। এই চেতনা দৃঢ় করে তোলার জন্য 'অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষ' যে সোভিয়েত রাশিয়া সেটার বিরুদ্ধে শুরু হলো সুচারুভাবে তৈরি করা মিথ্যা প্রচার, যা আজও অব্যাহত। সোভিয়েতকে দাঁড় করানো হলো একটা মনস্টার হিসাবে, স্তালিনকে প্রায় নরখাদক হিসেবে চিত্রিত করে সোভিয়েতে মানুষ কীভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তার গল্প ছড়ানো হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্তালিনের হাতে 'নির্যাতিত' এই 'অ্যানিম্যাল ফার্ম'-এর বাসিন্দারা কেন স্তালিনের নামে শপথ নিয়েই ফ্যাসিস্টদের রুখতে প্রাণ দিল, আর 'স্বাধীন' মানুষদের দেশ ফ্রান্স বা নেদারল্যান্ড কেন ফ্যাসিস্টদের হাতেই রাজ্যপাট তুলে দিল— এসব অবশ্য

কখনই বিচারে আনা হলো না। তখনও না, এখনও না। একটা হেজেমনি এভাবেই তৈরি হলো। এই হেজেমনিতে যে সাংস্কৃতিক বিষবৃক্ষ রোপণ করা হলো তাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখী চিন্তার ন্যায্যতা নির্মাণের ব্যবস্থা থাকল, থাকল মানুষের যা যৌথ শ্রমের অর্জন সেগুলোকে খাটো করে ব্যক্তির নিজস্ব যা অবদান সেগুলির জয়গান গাওয়ার ব্যবস্থা। থাকল মানুষের চরিত্রের বুনিয়াদি উপাদান যে ইন্দ্রিয়-সুখ বাসনা তা সাতকাহন করে প্রচার করার নানা কৌশল।

এই লড়াই চলছিল, পুঁজিবাদী চিন্তার প্রভাব বলয়ের পাশাপাশি একটা পাল্টা চিন্তার হেজেমনি গড়ার লড়াই। গত শতকের আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই লড়াই ছিল জোরদার। তারপর থেকে হাওয়া ঘুরতে শুরু করে। সোভিয়েতের পতন এই বিকল্প হেজেমনি গড়ার লড়াইকে বিপর্যস্ত করল। সোভিয়েত সত্যিই ছিল 'অ্যানিমাল ফার্ম', সোভিয়েত আসলে ছিল একটা অবাস্তব সমাজব্যবস্থা গড়ার পরীক্ষা নিজের নিয়মেই যা ভেঙে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বিষয়, গত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে কোনো শ্রমজীবীই যা শুনতে চাইত না, সেগুলিই শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করে সারা পৃথিবীর মানুষের মনোজগৎকে গ্রাস করল। পাল্টা হেজেমনি দুর্বল হলো, সদর্পে মানুষের মনোজগতের রাশ টেনে ধরল পুঁজিবাদী মতাদর্শ। নয়া উদারবাদ শুরুই করল এই অনুকূল মতাদর্শগত পরিমণ্ডলে, প্রাক নয়া উদারবাদী পুঁজি যে অনুকূল পরিস্থিতি পায়নি কখনও।

নয়া উদারবাদী যুগের পুঁজি বিশ্বায়িত, অর্থাৎ বিশ্ব জুড়েই সে পুঁজির সঞ্চয় ঘটাতে পারে পুঁজির আদি নিয়ম— কেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের নিয়ম— মেনে নিয়েই। কেন পুঁজি বিশ্বায়িত হবার সুযোগ পেয়েছে, জাতিরাষ্ট্র-র সঙ্গে তার সম্পর্ক এর ফলে কীভাবে পুনঃনির্ধারিত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে— সে সব এ প্রবন্ধের পরিসরে আলোচনা করব না। শুধু এটা উল্লেখ করতে হবে যে বিশ্বায়িত এই পুঁজি তার নিজের শর্তে শ্রম আইন, ফ্যাক্টরি আইন— কর্মক্ষেত্রে পুঁজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী তার কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, সেগুলিকে পুনঃনির্ধারিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছে। সুযোগটা সৃষ্টি করার জন্য সেনাবাহিনী নামানোর দরকার হয়নি। শুধু মানতে হয়েছে এই বাস্তবতার স্বীকৃতি যে এগুলি যদি শ্রমের পক্ষে রাখতে হয় তাহলে বিশ্বায়িত পুঁজি সে দেশ থেকে চম্পট দিতে পারে— যার ফলে অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে। কোনো আড়ম্বর না করেই কাজের সময় বাড়ানো গেছে, ২৪ X ৭ কাজের ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে। বাড়ানো গেছে কাজের ঘনত্ব। কাজ ফ্যাক্টরি শেডের বাইরে এমন শ্রমের বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা গেছে, যে বাজারে কর্ম-নিরাপত্তা বা সামাজিক নিরাপত্তা যোগানোর কোনো দায় পুঁজিকে নিতে হয় না। নয়া উদারবাদ নিঃশব্দে কর্মক্ষেত্রের পরিমণ্ডল বদলে দিয়েছে। 'ট্রেড ইউনিয়ন' অবান্তর হয়ে যাচ্ছে, ইউনিয়ন অফিসে ভিড় করার মতো শ্রমজীবী পাওয়া যাচ্ছে না— হয় তারা বেশি সময় ও বেশি খাটুনির (শ্রমঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে যা হতে বাধ্য) পর আর অফিসে বসা, রিক্রিয়েশন ক্লাবে যাওয়া এসবের সময় পায় না, অথবা (এবং একই সাথে) কাজ চলে যাচ্ছে এমন সব শ্রমজীবীর কাছে, যারা অসংগঠিত, যাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেই, যারা বেঁচে থাকে রাজনৈতিক দাদা-দিদির আশ্রয় খুঁজে। ইউরোপ আমেরিকায় এটা ঘটেছে গত শতকের আশি-নব্বইয়ের দশকের মধ্যে, এদেশে এই হাওয়া উঠেছে নয়া উদারবাদী সংস্কারের হাত ধরে— গত পঁচিশ বছর ধরে অনেকটা নিঃশব্দে এটা ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে।

কর্মক্ষেত্রে নয়া উদারবাদ আর একটা বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। সেটা হলো কাজের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগকে আর প্রসারিত করে, কাজের যে অংশটা 'হাই-ভ্যালু' কাজ— সেটাকে এমন শ্রমজীবীর হাতে দেওয়া যারা মেধা-শ্রম বিক্রি করে, যারা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে 'উঁচু জগৎ'-এর লোক, যারা ট্রেড ইউনিয়নের কথা শুনলে নাসিকা-কুঞ্চন করে, যারা অফিসের 'স্টেক'টা নিজের 'স্টেক' করে নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। যেদিন 'পিংক শ্লিপ' পাবে সেদিনও তারা অফিসে ঢোকে একথা ভাবতে ভাবতে যে ট্রেড ইউনিয়ন দরকার হয় তাদেরই যাদের 'মেধা সম্পদ' নেই। এই স্তরের শ্রমজীবীরা নয়া উদারবাদের কট্টর সমর্থক, কর্মক্ষেত্রে নয়া উদারবাদের ন্যায্যতা নির্মাণের কাজটা করে এরাই।

যাই হোক, কাজের জগতে অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষের বিদায় নয়া উদারবাদকে এই সুবিধা দিয়েছে যে পুঁজি ঠিক যা চায়— একদল মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন শ্রমিক বাহিনী দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া— সেটা এখন করা যাচ্ছে বিনা বাধায়। করা যাচ্ছে শ্রমবিভাগকে আরও বিস্তৃত করে এবং একই সাথে কাজের সময় এবং কাজের ঘনত্ব বাড়িয়ে। করা যাচ্ছে এমন এক শ্রমিকবাহিনী দিয়ে যার অবসর নেই, কাজের বাইরে যা আছে সেটা হলো আহার-নিদ্রা এবং জৈবিক পুনরুৎপাদন— যেখানে সে সৃজনশীলতা প্রয়োগ করতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সৃজনশীলতা বাড়ায় নিম্নস্তরে ভোগবাদী মানুষের সামাজিক পরিসর। বাজারও প্রসারিত হয় এগুলিকে কেন্দ্র করে। পুঁজিবাদ ঠিক এটাই চেয়েছিল। 'ইকনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট'-এ কার্ল মার্কস কর্মজগতে মানুষের মানসিক বিচ্ছিন্নতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে মানুষের সহজাত সৃজনশীলতার কী পরিণাম হবে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতোই সে বিষয়ে একটা কথা বলেছিলেন, নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন সেটা ঘটাতে দৃঢ় সংকল্প। পরিণামে যা দাঁড়ায়, মার্কস-এর ভাষায়

সেটা হলো "What is human has become animal, what is animal has become human"। মানুষের স্বাভাবিক সৃজনশীলতা কর্মক্ষেত্রে অবদমিত হয়। 'অবসর'-এর লড়াই জারি রেখে মানুষ সেই স্বাভাবিক সৃজনশীলতা প্রকাশ ও বিকাশের একটা পরিসর আদায় করেছিল, পুঁজিবাদী বাস্তবতার মধ্যেই যা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমজীবীর একটা আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। মার্কস যে পরিণতির কথা ভেবেছিলেন, এভাবেই সেটাকে রুখে দিয়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। সোভিয়েত-উত্তর যুগে বিশ্বায়িত পুঁজি তার নিজের নিয়মে শ্রমজীবীকে বেঁধে দিয়ে অবসরের জগৎকে ক্রমশ সংকুচিত করে সেটাকে তছনছ করে দিয়েছে। পড়ে আছে সেই সময়টুকু, যে সময়টায় জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর মতোই সে শারীরিক বৃত্তিগুলি (আহার, নিদ্রা, মৈথুন) করে থাকে। মানুষ যেহেতু অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা, সৃজনশীলতা যেহেতু তার অস্তিত্বের সহজাত, অবদমিত এই সৃজনশীলতার প্রয়োগ ঘটায় সে সেইখানে যেখানে সে অন্য প্রাণীর সমান। পুঁজিবাদী মনস্তাত্ত্বিক হেজেমনি 'স্বাধীন' মানুষের কথা বলে এই ক্ষেত্রগুলিতে সৃজনশীলতা প্রয়োগের যে কাজ মানুষ করে সেগুলিরই ন্যায্যতা নির্মাণ করে। ভোগে আর সংকোচ নেই মানুষের, যযাতির মতো অনন্ত ক্ষুধা নিয়ে এগুলিতেই সে তার বাকি সময়ে সৃজনশীলতার সাধনা করে। যারা এগুলি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে, পুঁজিবাদী মনস্তাত্ত্বিক হেজেমনি সে মানুষকে 'অ-সফল' হিসেবে চিত্রিত করে, পরবর্তী প্রজন্ম এদেরকে রোল মডেল করে না।

এই পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেভাবে গড়ে ওঠার কথা, সেভাবেই তা গড়ে উঠছে। এই পরিমণ্ডলে ভাব আদানপ্রদান করার ভাষা হলো ইংরেজি, কারণ নয়া উদারবাদের ভাষা হলো অ্যাংলো-স্যাক্সন জগতের ভাষা। কেন ইংরেজিই সেই মর্যাদাটা পেল তার কারণ সহজ। নয়া উদারবাদের উদয়ের যুগে পুঁজির জগতের নেতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্বাভাবিক নিয়মেই নয়া উদারবাদ বিশ্বকে শেখালো নয়া উদারবাদের ভাষায় কথা বলতে, ইন্টারনেটে ভাব বিনিময় করতে। নিঃশব্দে মানুষের চিন্তার পরিমণ্ডলে একটা পরিবর্তন এসে গেল। ভাষা খুব মামুলি জিনিস নয়। মানুষের চিন্তার পরিমণ্ডলে যা ধরা পড়ে, সমাজে তা প্রকাশ করার মাধ্যম হলো ভাষা। মাতৃভাষা এই পরিমণ্ডলে যা ধরা পড়ে, স্বাভাবিকভাবেই তা প্রকাশ করে। ভাষা বদলালে মানুষের চিন্তামণ্ডল থেকে বহু কিছু 'ডিলিট' হয়ে যায়, তার চারপাশের জগৎ তাকে যা দিয়েছিল। সেখানে আছে এমন কিছু, যা তার চিন্তার পরিমণ্ডলকেই বদলে দেয়। পরিমণ্ডল বদলায়, কাজেই শব্দ লুপ্ত হয়, কাজক্রমে ভাষাও লুপ্ত হয়। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন বহু দেশে বহু জনগোষ্ঠীর ভাষাকে লুপ্ত করছে, নিজস্ব ভাষায় যোগ করছে এমন কিছু ইংরেজি শব্দ যা তার ভাবপ্রকাশের জগৎকেই সংকুচিত করছে। এখন সে করে 'sms', এখন করে 'চ্যাট', ফেসবুকে পোস্টিং— এসব দেখলেই বোঝা যায়, কী ধরনের অন্তর্ঘাত নেমেছে মানুষের চিন্তার পরিমণ্ডলে।

এর সঙ্গে আসছে একটা কালচার, যার উৎসে আছে ভোক্তার বাজার দখল ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য নয়া উদারবাদের ক্রমাগত নির্মাণ বিনির্মাণের তাগিদ। এত ফাদার্স ডে, এত বার্থ ডে, এত মাদার্স ডে-র ঘনঘটা কেন? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এসবের মধ্য দিয়ে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার কোনো সৎ বা মহান পরিকল্পনা নেই— আছে 'অনলাইন শপিং', আছে বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসিত পিতামাতাকে ঘিরে 'প্রডাক্ট'-এর মার্কেট তৈরির সাধনা। ইন্টারনেটের জগৎ এই কালচারকে দ্রুত ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্ব জুড়ে। নিঃসঙ্গ মানুষ একটা ভার্চুয়াল জগৎ তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে 'কমিউনিকেট' করতে করতে আসলে বাড়ায় পণ্যের বাজার, পুঁজিবাদ যা বহু দিন ধরে চেয়েছে কিন্তু এর আগে কোনো দিনই পুঁজি তার স্বাদ পায়নি।

অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে, বিশ্বায়ন-সৃষ্ট সাইবার কুলিদের সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডটি বিশ্লেষণ করলে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। এই সবজান্তা 'সফল' মানুষগুলোর সাধারণ জ্ঞানের জগৎ সীমিত, কেননা শ্রমের বিশেষীকরণ তার প্রারব্ধ জ্ঞানের জগৎ থেকে বহু কিছু 'ডিলিট' করে চলে ক্রমাগত মস্তিষ্কের 'ড্রাইভ'গুলিতে স্পেস রক্ষার জন্য। প্রয়োজনে গুগল সার্চ করে এরা সাধারণ জ্ঞানের জগৎটিকে ধোপদুরস্ত করে হাজির করে। কর্মক্ষেত্রে ২৪ x ৭ কাজের চাপ তার সুকুমার বৃত্তিগুলিকে চুরমার করে দেয়, মানসিক বন্ধনের জগৎকে সংকুচিত করে, চটজলদি কিছু পাবার বাসনাকে তীব্র করে। এই মানুষ যখন অবসর পায় তখন সে ছোটে শপিং মলে, ডিসকাউন্টে কেনা অপ্রয়োজনীয় পণ্যে ঘর বোঝাই করে। টাকা জমিয়ে অথবা সাধ্যের মধ্যে বা সাধ্যের বাইরে ইএমআই দিয়ে ফ্ল্যাট কেনে, আসবাব কেনে, নেটে দেখা মডিউলার কিচেন কেনে, গাড়ি কেনে। এসবের মধ্য দিয়ে শুকিয়ে যায় তার মানবিক সম্পদ— চারপাশের জগৎকে নিয়ে কিছুটা আস্তে দৌড়ানোর বাসনা। অবশ্যই এটা শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে দেয় নিজের ক্রমশ ছোট হতে থাকা পারিবারিক জগৎকে। কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে আনা অস্থিরতা তার হাতের কাছে থাকা মানবিক সম্পর্কের সম্পদকেও অবহেলা করতে শেখায়। একমাত্রিক এই ভোগবাদী মানুষটির সাংস্কৃতিক জগৎকে এভাবেই নির্মাণ করে নয়া উদারবাদ। সারা বিশ্বে এই মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে এবং সেটাই পাল্টা সাংস্কৃতিক হেজেমনি গড়ার ক্ষেত্রে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তবুও, এসবের বাইরেও মানুষের ভাষা, সৃজনশীলতা প্রয়োগ করার কিছু পরিসর পড়ে থাকে। পড়ে থাকার কারণ,

ভোগবাদী বিকারগ্রস্ততার সাধ্য নেই মানুষকে পশুর জগতে বেঁধে রাখার। সেই ফাঁক দিয়ে পাল্টা ভাবাদর্শের হেজেমনির গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে। নয়া উদারবাদের যুগের পুঁজি সেখানেও সতর্ক পাহারা বসায়। পড়ে থাকা সৃজনশীলতা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলিতে এই পুঁজি সযত্নে গড়ে তোলে আধুনিকতার আঘাতে বিদায় নেওয়া প্রাক পুঁজিবাদী মতাদর্শের হেজেমনি। মানুষের এই নয়া উদারবাদ সৃষ্ট বাস্তবতার বাইরে কিছু করার কথা যদি মনে হয়, সেখানে বুনে রাখা হয় প্রাক পুঁজিবাদী মতাদর্শের আগাছা, যাতে কোনো ফাঁক দিয়ে পুঁজিবাদের বিকল্প যে সমাজতন্ত্র, তার ন্যায্যতা নির্মাণের কোনো সুযোগ না থাকে আজকের সমাজে। এই আগাছাগুলির মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হলো ধর্মীয় মতাদর্শ। নয়া উদারবাদী নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকের অসহায় মানুষের কাজে যার আবেদন সেই প্রাক পুঁজিবাদী যুগের মতোই শক্তিশালী। নাস্তিক মানুষের সংখ্যা কমছে, সংখ্যা কমছে যুক্তিবাদী মানুষেরও। মস্তিষ্কের ফাঁকা জায়গাটা দ্রুত ভরাট করছে ধর্মীয় পরিচয়সত্তা ভিত্তিক চেতনা। আজকের মতো আগে কখনও এই 'আংটি', গ্রহরত্ন, হনুমান চালিশাবাহী লকেটের বাজার ছিল না। নয়া উদারবাদ সযত্নে এদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে এগুলির জনপ্রিয়তা। বিনোদনের জগতে নয়া উদারবাদী বিপণন যে ঝকঝকে মধ্যবিত্তর ছবি তুলে ধরে, সেই ছবিতেও তাগা-তাবিজ, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক এবং গ্রহরত্নের বিপুল সম্ভার থাকে। ধর্মীয় 'অপর' খুঁজে, নিজেদের যাবতীয় দুর্দশার মূলে এই 'অপর'-এর ভূমিকা যে প্রবল, সযত্নে তা প্রচার করা হয়।

ধর্মের পরিসর প্রসারিত করার তাগিদ থেকে নয়া উদারবাদ ধর্ম নিয়ে এমন এক বিপজ্জনক প্রবণতার জন্ম দিয়েছে, যার পরিণাম ভয়ঙ্কর। এই প্রবণতার উৎস কিন্তু নয়া উদারবাদী জীবনদর্শনের একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রতিবাদটি গড়ে উঠেছে ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন করে। নয়া উদারবাদী ভোগবাদী সমাজকে ভাঙার তাগিদে এই প্রতিবাদটি আশ্রয় করেছে মধ্যযুগীয় ইসলামকে, যে ইসলাম খ্রিস্টান জগৎ সৃষ্ট এই নয়া উদারবাদী সমাজকে ধ্বংস করে গড়ে তুলবে এক ইসলামি কল্পস্বর্গের জগৎ, যেখানে অসাম্য দূর হবে, ব্যক্তিমানুষ ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পুঁজিবাদ সৃষ্ট মানসিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাবে। সমস্যা হলো, এই জগৎ গড়ে তোলার জন্য এরা ফিরে যেতে চায় প্রাক-আধুনিক সমাজে, যেখানে আধুনিকতা মানুষকে যতটা মুক্ত করেছে তার সবটা ধ্বংস করে দেওয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে খলিফাতন্ত্র ফিরিয়ে আনার নামে এইভাবে একটা বর্বর সমাজ গড়ার সাধনা চলছে। মানব সমাজের যতটুকু ইতিবাচক অর্জন, তার সবটা ধ্বংস করতে চায় এই উগ্র ইসলামি মতবাদ। নয়া উদারবাদের পাল্টা ভাবাদর্শ গড়ার এই উন্মাদনা আসলে শেষ বিচারে ধ্বংস করতে চায় পুঁজিবাদ-উত্তর একটা অন্যধরনের আধুনিক সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষাকে, সমাজতন্ত্র গড়ার আকাঙ্ক্ষাকে। কেননা জন্ম সূত্রেই তা ধর্মাশ্রিত। ধর্মরহিত মতাদর্শ এর প্রত্যক্ষ শত্রু। সমাজতন্ত্র তাই স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রথম শত্রু। নয়া উদারবাদ এই মতাদর্শের ধাক্কায় ধ্বংস হবে না, পরিসর কমবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার মতাদর্শ গড়ার সংগ্রামের— শেষ বিচারে যা নয়া উদারবাদের এজেন্ডাকেই শক্তিশালী করে।

উপসংহার

নয়া উদারবাদী মতাদর্শ তথা সাংস্কৃতিক হেজেমনিই কি মানব সভ্যতার শেষ কথা? সেটা কখনই হতে পারে না। এই মতাদর্শ বাঁচে মানুষের যা বুনিয়াদি প্রবণতা, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর প্রবণতা, সেটিকে অবরুদ্ধ করে। জীবজগতে মানুষের অস্তিত্ব যদি বিদ্যমান থাকে তবে সে মানুষের প্রবণতাই হবে তার সৃজনশীলতার পরিসর বৃদ্ধি করার, নয়া উদারবাদ যা সংকুচিত করতে চায়। প্রাক নয়া উদারবাদী পুঁজি বেঁচে ছিল এর জন্য একটা সামাজিক পরিসর ছেড়ে রেখে। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়িত পুঁজি সেই পরিসরটাকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। মানুষের প্রবণতা থাকবে পশুজগৎ থেকে তার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সেটি বাঁচাবার স্বার্থেই এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। বিরুদ্ধতার বাস্তবতা থাকে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির মধ্যেই— যে অর্থনীতি ক্রমাগত তার সংকটকে বিশ্বায়িত করে। স্রেফ বেঁচে থাকার স্বার্থেই মানুষকে এর বিরোধিতা করতে হবে, বিরোধিতার শক্তি প্রবলতর হয়ে উঠলেই মানুষ চাইবে এর বিকল্প এক মতাদর্শ, যা মানুষকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে। এই মতাদর্শ সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ, শত সোভিয়েত ধ্বংস হলেও যে মতাদর্শ মরে না, পুঁজিবাদী বাস্তবতাই যার ন্যায্যতা নির্মাণ করে।

এই অনুমানের পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায় এই বাস্তবতা থেকে যে দেশে দেশে সাধারণ মানুষ এই নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছে, পথে নামছে হাজারে হাজারে, রাষ্ট্রকে তারা বাধ্য করছে সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্ম নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে। জাতি-রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরেও এই টানাপোড়েন চলছে। রাষ্ট্রের ন্যায্যতা রক্ষার জন্যই নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নে রাশ টানার কথা উঠছে। সমাজকল্যাণ কর্মসূচি ছাঁটাই করার সাহস কমছে। কোথাও কোথাও উল্টো হাওয়াও উঠছে (সুইডেনে যেমন কাজের সময় বাড়ানোর বদলে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে)। এ সবই ধীরে ধীরে শক্ত করছে পাল্টা মতাদর্শের জমি— যে মতাদর্শে শ্রমজীবী পুঁজির দাসত্ব করে না, পুঁজি সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে শ্রমজীবীর দাসত্ব করে, মৃত শ্রমের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম হয় জীবন্ত শ্রমের। ❐

.

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বিশ্বায়ন-মতাদর্শ-সংস্কৃতি

সুনন্দন চক্রবর্তী

প্রস্তাবনা

তিনটে শব্দ-এর মধ্যে হাইফেন বসালাম যতে মনে না হয় এর কোনোটা অন্যটার উপরে বা নীচে বা আগে বা পিছে। মতাদর্শ এবং সংস্কৃতি শব্দদুটি-র মধ্যে এত বেশি দিন ধরে সুপারস্ট্রাকচার বা উপরি-কাঠামোর ভূত বাস করেছে যে মানুষের সমাজ, জীবনযাপন, সংস্কৃতি ওতপ্রোত— একটা আরেকটার দরুন নয় বা আগে পরে নয়— এই গায়ত্রী জপ করে না নিলে সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করা অসম্ভব

বিশ্বায়ন শব্দটি নিয়েও টানা-পোড়েন কম নয় । ১৯৯৯-২০০০ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইতিহাস বিভাগ 'মিলেনিয়াম লেকচার' নামে যে বক্তৃতামালা-র আয়োজন করে তার ফসল *বিশ্ব ইতিহাস বিশ্বায়ন* নামে একটি বই।[১] এর সম্পাদক এ জি হপকিন্স। তাঁর জবানি থেকে আমরা জানতে পারছি বিশ্বায়ন শব্দটি ১৯৭০ নাগাদ প্রথম শোনা গেলেও গত শতাব্দী-র আট-এর দশক-এর শেষ থেকে শব্দটি মুখে মুখে এবং লেখায় লেখায় সর্বজন পরিচিতি লাভ করে। তিনি আরও বলছেন তাঁদের এই বক্তৃতামালা-র ঐতিহাসিকরা বিশ্বায়ন-এর চারটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। হপকিন্স অবশ্য পর্যায় নয়, ফর্ম— চারটি চেহারার কথা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তারপর চারটি ফর্মের একটি করে মোটমাট সময়সীমাও দিয়েছেন। সেটা মনে রাখলে আমার মতো ইতিহাসবেত্তা নয় এমন পাঠকদের একটু সুবিধে হয়। কালের এই পর্যায় আমার কাছে ইতিহাস-এর বহমানতার চিহ্ন হিসেবে স্বস্তিদায়কও বটে। কেননা বিশ্বায়ন-এর এক ধরনের তাত্ত্বিকতা ইতিহাস-এর সমাপ্তি সাড়ম্বরেই ঘোষণা করেছে।

হপকিন্সরা বিশ্বায়ন-এর শ্রেণীবিভাগ করেছেন এই রকম— আর্কেয়িক, প্রোটো, মডার্ন এবং পোস্ট কলোনিয়াল— অতি প্রাচীন, আদিম, আধুনিক এবং উত্তর-উপনিবেশিক। এর মধ্যে আধুনিক বিশ্বায়ন-এর কালসীমা ধরা হচ্ছে ১৮০০-এর পর থেকে। নেশন-স্টেটের অভ্যুদয় এবং শিল্পায়নের সূচনা ও দ্রুতগতি হয়ে ওঠা এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। উত্তর-উপনিবেশিক বিশ্বায়ন-এর সূত্রপাত মোটামুটি ১৯৫০ থেকে, যদিও জনমানসে ঐ শতাব্দী-র শেষ দুই দশকই এই অপ্রতিরোধ্য বিশ্বায়নের যুগ বলে চিহ্নিত। নতুন শতাব্দীতে তার রফতার, রফতানি বাড়তির দিকেই। যদিও এই নিবন্ধ মূলত এই শেষ দুটি পর্যায়-এর একটা বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করবে তবু আরও কয়েকটি মুহূর্তকে একটু ফিরে দেখার চেষ্টা করতে হবে। যেটাকে ঐতিহাসিকরা আদিম বিশ্বায়ন বলছেন— ১৬০০ থেকে ১৮০০-এর তিনটি দশক— ১৭৬০ থেকে ১৭৯০— তার একটি প্রবণতাকে আমরা একটু বিশদভাবে দেখব কেননা সেটা বিশ্বায়ন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় আমাদের চিন্তা-র সঙ্গে সম্পর্কিত।

হপকিন্স তাঁর ভূমিকার শেষে বিশ্বায়ন-এর নবতম পর্যায় সম্পর্কে শিবির বিভাজনের বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

> ইতিহাস বা মতাদর্শ কিছুই শেষ হয়ে যায়নি। ধনতন্ত্র-এর মুক্ত-বাণিজ্যের উকিলরা বিশ্বায়নকে দেখেন একটি ইতিবাচক, প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে যা কর্মসংস্থান করছে এবং শেষ বিচারে পৃথিবী জুড়ে জীবনযাত্রার মান বাড়াচ্ছে। আর এর সমলোচকরা একে দেখেন গরিব দেশগুলোকে ঋণ-এর ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে তাদের সম্পদসমূহ আত্মসাৎ করার একটি উপায় হিসেবে, যে উপায় উচিতমূল্য-হীন শ্রম-এর ব্যবহারে উৎসাহ দেয়, প্রকৃতি- পরিবেশকে কলুষিত করে।[২]

হপকিন্স এই যে দু-পক্ষের কথা বলছেন তাঁরা বাদে একটি তৃতীয় পক্ষ আছে। এঁরা উত্তর-গঠনবাদী বা উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিকগণ। একটা দীর্ঘসময় পর্যন্ত ধ্রুপদী ঘরানার মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা উত্তর-আধুনিকতাকে পুঁজি এবং এক-বিশ্ব ব্যবস্থা-র তাঁবেদার তত্ত্ব হিসেবেই সন্দেহ করেছেন এবং আক্রমণ করেছেন। 'ফ্রেডেরিক জেমসন-এর 'উত্তরআধুনিকতা অথবা বিলম্বিত ধনতন্ত্র-র সাংস্কৃতিক যুক্তি' কিংবা আইজাজ আহমদ-এর 'ইন থিয়োরি'-র কথা আপনাদের মনে পড়বে)। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতার দীর্ঘতম ব্যক্তিত্ব জাক দেরিদা যখন ঘোষণা করলেন তাঁদের প্রজন্ম মার্কস-এর ভূতগ্রস্ত (স্পেকটারস অফ মার্কস, ১৯৯৪), বাম চিন্তার জগত খেয়াল করতে শুরু করল উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের সরাসরি প্রতিপক্ষ না ভাবলেও চলে। একথাও অবশ্য মনে রাখা দরকার যে উত্তর-আধুনিক কথাটার মধ্যে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাবিদদের পাওয়া যাবে যাঁদের চিন্তাগুলো একেবারেই একরকম নয়, বা যাঁদের প্রাথমিক আগ্রহের ক্ষেত্রগুলিও আলাদা। কেউ হয়ত মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাবনা শুরু করছেন, কেউ হয়ত স্রেফ ভাষাতত্ত্ব। এঁদের সাধারণ মিল হিসেবে আমরা বলতে পারি এঁরা মহাআখ্যান-এ (গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ) আস্থা রাখেন না এবং যে কোনো ধারণা, ব্যবস্থা, তন্ত্রকে বোঝার জন্য এঁরা বিনির্মাণ বা অবিনির্মাণ (ডিকনস্ট্রাকশন) হাতিয়ারটি ইস্তেমাল করায় বিশ্বাস রাখেন। (বিনির্মাণ শব্দটি শ্রীশিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবিনির্মাণ শব্দটি শ্রীমতী গায়িত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক বাংলায় চালু করেন)। এই সূক্ষ্ম সব তর্ক-মীমাংসা একাডেমিয়া-র বাইরে স্বল্প-পরিচিত (আমিও সেই অনধিকারী সমাজ-এর একজন)। কিন্তু দার্শনিক

তত্ত্ব সবসময়েই একাডেমিয়াকে উপচে আপামর জনগোষ্ঠী-র মধ্যে চুঁইয়ে পড়ে। তাই ''ইতিহাসের মৃত্যু হয়েছে'', ''কেন্দ্র বলে কিছু নেই'', ''লেখকের মৃত্যু'', ''বাস্তব হলো একটা নির্মাণ (কনস্ট্রাক্ট)'' এই জাতীয় কিছু বাক্যবন্ধ উত্তর-আধুনিক ভাবনা-র সূত্র হিসেবে কারও কাছে প্রিয় কারও কাছে ঘৃণ্য হয়ে ওঠে। পাঠ-এর ভিন্নতা, গ্রহণ-এর ভিন্নতা, সূক্ষ্ম কূট-কচালির খাঁজ এবং ভাঁজ-এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা আরও নানা তত্ত্বগত বিতর্ক, ইতিহাস, কাহিনী, অভিজ্ঞতা, রাজনীতি এই দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে সঙ্কুল করে রেখেছে (যাঁরা সেই চক্রবূহে প্রবেশ করতে চান না তাঁরা শ্রী শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'অথ বি-নির্মাণ'[৩] বিবরণ-বিশ্লেষণটি পড়ে দেখতে পারেন)। আমরা আপাতত শুধু মাত্র এই আপস প্রস্তাব করছি যে উত্তর-আধুনিক তত্ত্বভাবনা এবং তাকে ঘিরে যে বিতর্ক সেগুলি কতগুলি নিবিড় নিরীক্ষা-র হাতিয়ার (ক্রিটিকাল টুলস্) তৈরি করছে। নারীত্ব নির্মিতি-র প্রশ্ন, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব-র ধারণাটির বিপজ্জনক বাঁক এবং অন্তর্লীন বিপদ, রাষ্ট্র ও পার্টির আমলাতন্ত্র-এর হাতে ক্ষমতার ঘনীভবন, যুক্তি ও বিজ্ঞানের নাম করে 'একমাত্র' সত্য-র দাবিদার হয়ে ওঠা— উত্তর-আধুনিকতা থেকে ঠিকরে ওঠা এইসব প্রশ্ন-র মোকাবেলা না করে মার্কসীয় দর্শন-এর উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলা অসম্ভব। ঠিক যেমন অসম্ভব শ্রম থেকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য-র বিশ্বজোড়া বর্ষণ-এর মধ্যে যে দুর্নিবার অসাম্য তাকে কমিয়ে আনা-র (শূন্য করে দেওয়ার যত কাছাকাছি যাওয়া যায়) প্রয়াস বাদ দিয়ে কোনও বিশ্বায়িত বিশ্বকে কল্পনা করা।

বামপন্থার রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলি এ-দেশে এবং বিশ্বজুড়েই একাধিক ধাক্কা খেয়েছে। আমরা উপনিবেশ বিস্তার এবং বিশ্বায়ন-এর আদিম ও আধুনিক পর্যায়-এর দু-একটি প্রকল্প এবং বিতর্ক-র দিকে মনোনিবেশ করব এই আশায় যে তার থেকে কিছু দিশা পাওয়া যেতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদ না সাম্রাজ্য?

এটা একটা সমাপতন যে ঠিক প্রায় একশ বছর আগে লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্র-র সর্বোচ্চ পর্যায়' সন্দর্ভটি পেশ করেন। একদম গোড়াতেই লেনিন বলেছেন যে (সাম্রাজ্যবাদ-এর) অ-অর্থনৈতিক (নন-ইকনমিক) দিকটি সম্পর্কে তিনি এখানে কিছু বলতে পারবেন না, **যতই সেগুলো আলোচনা যোগ্য হোক না কেন**[৪] (বড়ো হরফ আমার যোগ করা)। ওঁর মতে সাম্রাজ্যবাদ-এর চরিত্রলক্ষ্মণ হলো: ১। উৎপাদন উচ্চস্তরে পৌঁছে একচেটিয়া পুঁজি-র দখলে চলে যাওয়া; ২। শিল্প পুঁজি আর ব্যাঙ্ক পুঁজি মিলে গিয়ে লগ্নি পুঁজি-র উদ্ভব, যার ফলে একটি লগ্নিকারী ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীতন্ত্র-এর জন্ম; ৩। পণ্যের বহির্বাণিজ্য-র বদলে পুঁজি-র বহির্বাণিজ্য; ৪। বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া মুনাফাকারীদের সংঘ গড়ে ওঠা যারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়াটা বাঁটোয়ারা করে নেয়।

সাম্রাজ্য (Empire) কল্পিত হল ২০০০ সালে।[৫] বলা হলো, ভৌগোলিক সীমানা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কাজেই মতাদর্শগত বা জাতীয় দ্বন্দ্ব অবমৃত হল। এখন শত্রু সে, যে আইনভঙ্গকারী (যেমন সন্ত্রাসবাদী)। মুশকিল হচ্ছে ইরাক, আফগানিস্তান বা সিরিয়া কোন যুদ্ধ-ই তৃতীয় বিশ্ব-র (বা একসময়ে যা তৃতীয় বিশ্ব নামে অভিহিত হত) কোন অধিবাসীকেই এই ভরসা দিতে পারবে না যে সাম্রাজ্যবাদ/লগ্নিপুঁজি-র নিয়ন্ত্রক-চক্র সত্যি এতখানি বীতশোক হয়ে গেছে। কিন্তু ভুবনজোড়া এই ফাঁদ থেকে পরিত্রাণ-এর উপায় কী? বা কী কী? এম্পায়ার নিয়ে উত্তর-আধুনিক এবং উত্তরাধুনিক-মার্কসবাদীরা এমন একটা চিন্তা উস্কে দিচ্ছেন যে শুধু অর্থনৈতিক চরিত্র লক্ষণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে না সংজ্ঞায়িত করে তাকে সমাজ-মতাদর্শ-সংস্কৃতি এই সমগ্রতায় দেখা দরকার এবং বিরোধিতা করা দরকার। যেটা নিয়ে লেনিন কথা বলেননি বা যেগুলো নিয়ে বলেননি, আন্তনিও গ্রামশি সে প্রসঙ্গগুলি নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন। অতি চেনা হলেও তাঁর কয়েকটি কথা আমরা আরেকবার ঝালিয়ে নিতে পারি। তাঁর প্রথম প্রতিজ্ঞা, সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই বুদ্ধিজীবীরা রয়েছে। উৎপাদনে তার অংশগ্রহণ-এর ধরন দিয়ে সে কোন্ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তা নির্ধারিত হয়। প্রভুত্বকারী শ্রেণী নিজের প্রয়োজনে এই বুদ্ধিজীবীদের স্তরকে প্রসারিত করতে আগ্রহী থাকে (যেমন শিল্প-বিপ্লব-এর কালে চাহিদা থাকবে দক্ষতা সম্পন্ন নতুন নতুন মজুর-এর)। এরপর গ্রামশি বলছেন উৎপাদন-এ কার কী ভূমিকা তা দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের একটা স্তরভেদ করা যায়।

> ...at the highest level would be the creators of the various sciences, philosophy, art etc, at the lowest the most humble "administrators" and divulgators of pre-existing, traditional, accumulated intellectual wealth.[৬]

এই বুদ্ধিজীবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরি হয় শিক্ষাব্যবস্থা। গ্রামশি বলছেন, কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা কত উন্নত তা সেই দেশের প্রশিক্ষণ স্কুল-এর সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু এরপর তিনি একটি ধাঁধা-র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ধরনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-এর কেন্দ্র বেশি হওয়াটা আসলে গণতন্ত্র প্রসারের চিহ্ন নয় :

> The most paradoxical aspect of it all is that this new type of school appears and is advocated as being democratic, while in fact it is destined not merely to perpetuate social diffirences but to crystallize them...[৭]

এই প্রায় একশ বছর আগের ইতালি-র সঙ্গে আমাদের পরিস্থিতি-র অনেক মিল। উচ্চশিক্ষা-র (যদিও কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা-কে একরকম উচ্চ-মধ্যশিক্ষা বলা

যেতে পারে) সরকারি অভিমুখ সীমিত লক্ষ্যের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাহিনী তৈরি করা। বেসরকারি লগ্নিপুঁজি-র একমাত্র আগ্রহ এই সীমিত লক্ষ্যের শিক্ষাকেন্দ্র তৈরিতে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষক মহল ছাড়া কাউকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুনিনা। ঠিক যেমন দেখি না 'শিক্ষার অধিকার' আইনের প্রয়োগে আপামর দেশবাসী-কে যুক্ত করার প্রয়াসকে রাজনৈতিক কর্মসূচি-র অঙ্গ করে তোলার প্রচেষ্টা। শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়াগুলি আমাদের দেশে সাধারণত অর্থনৈতিকতা-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মূল বিবেচ্য থাকে সরকারি বাজেট-এর কতখানি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। কিন্তু পাঠক্রম সংক্রান্ত সমস্যা ধরে নেওয়া হয় একমুঠো বিশেষজ্ঞদের এলাকা। সাবেকি মার্কসীয় ধারণার জনপ্রিয় ব্যাখ্যাও এই রকম যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা গেলে নতুন রাষ্ট্র যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা পত্তন করবে তাই নতুন সামাজিক মানুষের জন্ম দেবে।

জ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয় এ প্রসঙ্গে মিশেল ফুকোকে স্মরণে রাখা বামপন্থী শিক্ষা আন্দোলন-কে সমৃদ্ধ করতে পারে (শাশ্বত সত্য-র অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ নিয়ে কোনও চরম অবস্থান না নিয়েও এটা করা যায়)। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল-এর প্রকল্প যেমন শুধু শীতপ্রাসাদ দখল নয়, ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র অসংখ্য সোভিয়েত তৈরির সাফল্য-র উপর নির্ভরশীল, শিক্ষারও তেমনি অজস্র সোভিয়েত তৈরি-র উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা আমরা কি ভাবতে পারি?

ভবিষ্যতের জন্য খামখেয়াল

এই প্রসঙ্গে আমরা নানা এনজিও-র সঙ্গে সাবেকি মার্কসীয় রাজনীতির সম্পর্কের টানাপোড়েন খেয়াল রাখতে পারি। ধরা যাক কোনো এলাকায় পরিবেশ নিয়ে কাজ করে অথবা মেয়েদের নিয়ে কাজ করে এমনি একটি এনজিও আছে। খানদানি বামপন্থী পার্টি-র রেওয়াজ তার ফান্ডিং-এর চরিত্র দিয়ে তাকে ভাবা। যেন এই সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলি এই এনজিও-র কাজ থেকে উঠে আসছে, সেটা তার অর্থের উৎস দিয়ে নিটোলভাবে নির্ধারিত। যেন বড় পুঁজির বা লগ্নিপুঁজি-র 'একমাত্র সত্য'-কে একমাত্র পার্টি-র 'একমাত্র সত্য' দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়। 'জ্ঞান' এবং 'সত্য' নির্মিত হওয়ার প্রত্যেকটি মুহূর্তের মধ্যে যে ফাটল, ভিন্নস্বর, ভিন্নস্বর-এর অনুপস্থিতি আছে তা-ও যে বড় পুঁজি আর লগ্নি পুঁজি-র আধিপত্যকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার কাজে ঝলকে উঠতে পারে এটা বিবেচনার মধ্যে নেই বলেই হয়ত রাজনৈতিক আন্দোলন-এর যৌথ মঞ্চ খোঁজার সময় এইসব 'সীমান্তবর্তী' আন্দোলনকারীরা তেমন পাত্তা পান না।

টোনি ব্যালান্টাইন একটি সন্দর্ভে আমাদের জানাচ্ছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনদশক— যেটা আধুনিক বিশ্বায়ন-এর কাল— পাশ্চাত্য কীভাবে গোটা দুনিয়াটাকে গুণে গেঁথে সুসম করে নেওয়ার কাজে ব্যাপৃত হয়েছিল।[৮] ক্যাপ্টন কুক-এর বিখ্যাত সমুদ্রযাত্রা শুধু নয়, সাম্রাজ্য-র প্রতিটি অচেনা কোণ ভৌগোলিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিকভাবে চিনে নেওয়ার এক দুনিয়াজোড়া আয়োজন শুরু হয়েছিল তখন-ই। উপনিবেশগুলি মুক্ত হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদ যদি সাম্রাজ্যের চেহারা নিয়ে প্রবলপ্রতাপে টিকে থাকতে পারে তা শুধু পুঁজি আর সামরিক শক্তি-র জোরে নয়, উপনিবেশ-এর সঙ্গে আদান প্রদান তার বৌদ্ধিক সম্পদ কুক্ষিগত করার-ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে।

উত্তর আধুনিকতা আরেকটি পরিসর-এর দিকে দৃষ্টি সংহত করেছে— গণসংস্কৃতি (পপুলার কালচার /মাস কালচার)। দীর্ঘদিন পর্যন্ত খানদানি মার্কসীয় অবস্থান ছিল মাস কালচার জনগণের আফিম। সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজ পাল্টা সাংস্কৃতিক পণ্য তৈরি করা। গণমাধ্যম-এর মালিকানা বড় পুঁজি-রা, অতএব সাংস্কৃতিক পণ্য বিনিময়-এর পাল্টা বাজার, পাল্টা বাজার-এর রাস্তা তৈরি করা দরকার। গণমাধ্যম-এর মধ্যে বিশেষত চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সংবাদমাধ্যম, প্রকাশনা— এখন তার সঙ্গে যোগ করতে হবে অন্তর্জাল— এগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বড় পুঁজি নির্ভর। গত শতাব্দী-র তিন দশক— ১৯৬০-১৯৮০— সাংস্কৃতিক কর্মীরা রাস্তার নাটক, সস্তা-র সিনেমা, অল্প প্রচারিত প্রকাশনা এবং বেসরকারি বেতার দিয়ে যে গৌরবময় লড়াই জারি রেখেছিলেন আজ তা খুব ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তোলে। অন্তর্জালকে একসময় মনে করা হচ্ছিল লগ্নিপুঁজি-র প্রাধান্যের বাইরে রাখা যাবে। উইকিলিক্স প্রভৃতি 'এথিক্যাল হ্যাকার' গোষ্ঠী যদিও সক্রিয় তবু মোদ্দা যেন লগ্নিপুঁজি-র পাঞ্জা ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে।

এন্ড্রু বয়েড ডগলাস রাসকফ-এর অনুসরণে এর নাম দিয়েছেন মাধ্যম-বীজাণু যুদ্ধ (meme warfare)। গণমাধ্যম থেকে যে কিছু শব্দ, কথা, ফ্যাশন, ধারণা বীজাণুর গতিতে জনমানস আক্রমণ করে সেইরকম বীজাণু ছড়ানোর রাজনৈতিক /সাংস্কৃতিক কর্মসূচি-র কথা তিনি বলেছেন। একটা স্কুল-এর দেয়ালে 'সত্য এক বীজাণু' বাক্যবন্ধটি স্প্রে-পেইট দিয়ে লেখা দেখে মাথায় তাঁর চিন্তাটি আসে। ২০০০ সাল-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-এর সময় বয়েড ও তাঁর দলবল 'বুশ (অথবা গোরে)-র জন্যে কোটিপতিরা' বলে এমন একটি মিম তৈরি করেন যার উদ্দেশ্য ছিল মসকরা আর শ্লেষ দিয়ে দুটি মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে মানুষকে জানানো— নির্বাচনী প্রচার-এ দুর্নীতি-র টাকা এবং আর্থিক অসাম্য। মাধ্যমে-বীজাণু যুদ্ধ এবং সামাজিক আন্দোলন-এর সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা তাঁর কথাগুলো আমরা শুনতে পারি :

> Social movements cannot live by meme alone. Yet memes are clearly powerful - both analytically and operationally. A vital movement requires a hot and happening meme, The Declaration of Independence,

এর পর ৪৬ পৃষ্ঠায়

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সময়-এর নান্দনিক মাত্রা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শিরোনামটি সকলের পক্ষে সহজপাচ্য হবে না— একথা জেনেও শেষ অবধি এটিকেই বেছে নিলুম। সময় বা কাল কাকে বলে? দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা এর এক ধরনের উত্তর দেবেন। সে উত্তরের সঙ্গে অনিবার্যভাবে দেশ বা স্থান-এর কথা আসবে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় : নন্দনতত্ত্ব, শিল্পকর্মর স্বরূপ বিচার। তার সম্পর্ক সূত্রেই সময়-এর পরিচয় হলো : কোনো শিল্পকর্মর প্রতিভাব (রেসপন্স্)-এর পরিবর্তন যার নিরিখে ধরা যায়।

যেমন, উনিশ শতকের যে-প্রজন্ম ইংরিজি শেখার সুযোগ পেলেন, সম্পূর্ণ অচেনা একটি সাহিত্য ভাণ্ডারের দরজা তাঁদের কাছে খুলে গেল। সেই ভাণ্ডারের নাম, এককথায়, ইওরোপীয় সাহিত্য বা, আরও ব্যাপক অর্থে, পশ্চিমী সাহিত্য। অর্থাৎ শুধু ইওরোপ না, তার সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার গল্প-কবিতা-উপন্যাস ইত্যাদি। এই ছাত্রদের পূর্ব-পুরুষরা ফার্সি শিখেছিলেন। ফার্সি সাহিত্যও কম সমৃদ্ধ নয়। তার কিছু স্বাদ তাঁরাও পেয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্যে বাঙলা সাহিত্যর রূপ বা রুচি কোনোটাই পালটায় নি। ফার্সি না-জানা লোকদের মতো তখনকার বাঙালি হিন্দুরা নানা দেবদেবী নিয়ে লেখা মঙ্গলকাব্য শুনতে ভালোবাসতেন। বৈষ্ণব কবিতা, শাক্ত পদাবলী ইত্যাদিও তাঁদের অপছন্দ ছিল না। আঠারো ও উনিশ শতকে ভারতচন্দ্র আর দাশু রায় দুজনেরই 'গোঁড়া' ছিলেন অনেক।

কিন্তু তাঁদের নাতিপুতিরা ভারতচন্দ্র নিয়ে আপত্তি না করলেও দাশু রায়কে ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। হুতোম-অনুসারী এইরকম এক লেখক (ছদ্মনাম : চিড়িয়াখানার *নিশাচর*) মন্তব্য করেছিলেন :

> পাঁচালিওয়ালা দাশরথি রায় বড় মন্দ ছিলেন না। তিনি উত্তম গীত বাঁধতে পারতেন। তাঁহার অনুপ্রাসগুলিও প্রশংসনীয়, কিন্তু দাশু রায়ের গোঁড়ারা আমাদিগকে ক্ষমা করবেন, তাঁহার উপহাস-রসিকতা প্রবল দেখে গায়কদিগের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করা যায় নাই। (পৃ. ১৫২ টী. ১)

ভারতচন্দ্র সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। প্রথম জীবনে রামমোহন রায়ও, আরও হাজার হাজার বাঙালির মতন, কবি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যথাকালে তাঁর মনে হলো : ভারতচন্দ্রকে ছাড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না (নির্মাল্য বাগচী, পৃ. ১৩৫)। পরে তিনি মন দিলেন গদ্য লেখায়। সেক্ষেত্রে তাঁর কোনো পূর্বসূরি ছিলেন না, যিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁকে পথ দেখাবেন।

যে-গোঁড়ারা দাশু রায়ের নাম শুনলে মুর্ছা যেতেন, তাঁদের সবাইকে তুচ্ছ করে দেখার কারণ নেই। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে দাশু রায়ের অনুরাগী ছিলেন অনেকেই। কোনো এক পাঁচালীতে দাশু রায় কোদণ্ড (=ধনুক) শব্দটি কোদাল অর্থে ব্যবহার করেন। দাশু রায়ের বিরোধী এক ছাত্র সে-নিয়ে ''বিদ্রুপহাস্য করিয়া কটু মন্তব্য করেছিল। ইহা শুনিয়া নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ সভামধ্যেই উক্ত ছাত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন যে দাশরথি কবি, সিদ্ধবাক, বাণীর বরপুত্র, তাঁহার মুখ দিয়া যখন কোদালী অর্থে কোদণ্ড শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন কোদণ্ড শব্দের এই অর্থও প্রচলিত হউক।'' (হরিপদ চক্রবর্তী পৃ. ১১)

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ থেকেই দাশু রায় ও তাঁর পাঁচালী দুই-ই বাঙালি সমাজ থেকে বিদায় নিতে শুরু করল। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুচি বদলায়। এককালে যাঁকে মহাকবি বলে ধরা হতো, তিনি পেছনে চলে যান; কালের নিয়মেই অন্য কবির কথা ও তাঁর কবিতা শ্রোতা-পাঠকের মনে জায়গা করে নেয়। ২৯শে এপ্রিল ১৮৫০-এ *জ্ঞান সঞ্চারিনী পত্রিকা* থেকে জানা যায়:

> ভাগিরথীর পশ্চিমপাড়ে চক্রবেড় নামক গ্রামে কৃষ্ণ কালীপূজার মহাধুমধাম লাগিয়াছিল...। পূজার প্রসিদ্ধ কার্য্য ব্রাহ্মণ ভোজন তাহা ভূরিভোজন বিধানে হইয়াছিল, এবং নৃত্য গীত তামাশা তাহাও সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক সমাধা হইয়াছে। পূজার প্রথম দিবস, গোবিন্দ যূগীর যাত্রা, দ্বিতীয় দিবস কবিতা [অর্থাৎ কবিগান], তৃতীয় দিবসে দাসু রায়ের পাঁচালি ইত্যাদি আমোদপ্রমোদ দ্বারা পূজা ব্যাপার সমাধা হওয়াতে সাধারণ জনগণের অন্তঃকরণের [হুবহু] অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিয়াছে। (বিনয় ঘোষ, পৃ. ৬৬)

তার জন্যেই শিল্প-সাহিত্যর একটি মাত্রা হলো : সময়। যাঁরা দাশু রায়ের পাঁচালী শুনে বা পড়ে মুগ্ধ হতেন তাঁদেরও একটি নিজস্ব রুচি ছিল। আবার তাঁদের পরের প্রজন্ম ভারতচন্দ্র ও দাশু রায় দুজনকেই ছেড়ে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র-য় মজলেন। তাঁদের রুচিও অবজ্ঞা করার নয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুচিভেদ হয়— এ নিয়ে আরও ছড়িয়ে বলার দরকার নেই। গত পাঁচশ বছরে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস দেখলেই তা ধরা পড়ে। রচনারীতিও উনিশ শতকের আগে অবধি বদলায় নি। চৈতন্যচরিত লিখতেও পদ্য, মনসামঙ্গল লিখতেও পদ্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন :

> প্রাগ্-আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল— ইহার মধ্যে গদ্যের একান্ত অভাব। এতাবৎকাল বাংলা ভাষা

ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবের ন্যায় কেবল ছন্দোবদ্ধ, নৃত্যশীল পদক্ষেপেই অভ্যস্ত ছিল। গীতিধর্মী, সুরের ছোঁয়াচ লাগা ধ্বনিপ্রবাহের সাহায্যেই সে সাহিত্যের বিচিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, ইহারই মাধ্যমে সে যুক্তিতর্ক করিয়াছে, গল্প বলিয়াছে, জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৭-৮)

এই অবধি তো ঠিকই আছে। এর পরে শ্রীকুমারবাবু যা লিখেছেন সেটি বেশ মজার :

ইহার কারণ বোধ হয় বাঙালীর সমস্ত মনন ও তথ্যজ্ঞান এক অবিচ্ছিন্ন কাব্যময়, আবেগপ্রধান মনোভাবের মধ্যেই বিধৃত ছিল (ঐ, পৃ. ৮)

অর্থাৎ শ্রীকুমারবাবু যেন বলতে চান : বাঙালী জাতি আদতে গদ্যবিমুখ। কিন্তু মনে রাখবার এই যে, গদ্যর আবির্ভাব বিশেষ করে সাহিত্যিক গদ্য-র, আপনা থেকেও হয় না : তার জন্যে একটি বিশেষ সামাজিক পরিবর্তনও দরকার পড়ে। এই সহজ সত্যটি শ্রীকুমারবাবুর মতো কলাকৈবল্যবাদীরা বোঝেন না। তিনি লিখেছেন,

ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে পদ্যর গদ্যান্বয় করিলে বা ব্যবহারিক জীবনের সংলাপ রীতিকে সাহিত্যে প্রয়োগ করিলেই যে গদ্যের অনায়াসে জন্ম হইতে পারিত, সেই সামান্য পরিবর্তন বা অনুসরণের কল্পনাও কোন প্রাগ্-আধুনিক লেখকের মনে জাগে নাই। (ঐ, পৃ. ৮)

পুরো ধারণাটি চূড়ান্ত বিষয়ীসর্বস্ব (সাবজেকটিভ) : যেন ইচ্ছে করলেই পদ্য ছেড়ে গদ্য লেখা যায় : বাইরের কোনো তাগিদ বা ধাক্কার দরকার পড়ে না। মুখের ভাষা আর গদ্য যে এক জিনিস নয় এটিও, আরও অনেকের মতো, শ্রীকুমারবাবু বুঝতেন না। উল্‌টে মলিয়ের-এর *বুর্জোয়া ভদ্রলোক* নাটকের সেই চরিত্র, মঁসিয় জুঁরর্দ্যা-র মতো তিনিও দুটিকে এক বলে মনে করতেন। (পরিশিষ্ট দ্র.)

ঘটনা এই যে, বাঙলায় গদ্য লেখার চল ষোলো-সতেরো শতক থেকেই ছিল। চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, এমনকি নব্যন্যায়-এর প্রথম পাঠ, বৈষ্ণবদের কড়চা— এ সবই গদ্যে লেখা হয়েছে। কিন্তু এ হলো নিতান্তই কেজো গদ্য, সাহিত্যিক গদ্য নয়। অর্থাৎ এই গদ্যে গল্প-উপন্যাস দর্শন-বিজ্ঞানের আরও উঁচুস্তরের বিষয়ে কিছু লেখা যেত না। শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য বাঙালি গদ্য পড়তে শিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহর উদ্যোগে সংস্কৃত মহাভারত-এর বাঙলা গদ্য অনুবাদ বেরোনোর পর। রামমোহন, এমনকি বিদ্যাসাগর, অক্ষরকুমার দত্ত-র গদ্যরচনা দিয়ে যার শুরু, বঙ্কিম-এ তার বিকাশ। মধ্যে অবশ্যই আছেন টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) আর হুতোম প্যাঁচা (কালীপ্রসন্ন সিংহ)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনে আমূল পরিবর্তনের ফলেই বাঙলা গদ্যরচনা সম্ভব হলো। কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ইচ্ছে বা খেয়ালে তার উদ্ভব হয় নি।

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)-এর ভূমিকায় টেকচাঁদ লিখেছিলেন :

...যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে, সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের [উপন্যাসাদির] অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই পুস্তকখানি রচিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য কি, পাঠ করিলেই প্রকাশ হইবে। এই প্রকার পুস্তক লিখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য সদোষ হইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র যদি শুধু বাঙলা আর ফার্সি শিখে ক্ষান্তি দিতেন, ইংরিজি না শিখতেন, তবে উপন্যাস লেখার কোনো বাসনাই তাঁর হতো না। *আলাল*-এর ইংরিজি ভূমিকায় তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন : এটিই প্রথম মৌলিক বাঙলা উপন্যাস, ''দ অ্যাবভ অরিজিনাল নভেল ইন বেঙ্গলি [ইজ] দ ফার্স্ট ওয়র্ক অফ দ কাইন্ড...।'' এই সচেতনতা উনিশ শতকের আগে প্রত্যাশা করা যেত না। যে বাঙালি কোনো পুরুষে কখনও একটি উপন্যাসও পড়েনি, নভেল কাকে বলে তাই জানত না, তাকে দিয়ে উপন্যাস পড়ানো— রীতিমতো একটি চ্যালেন্‌জ। আর, একবার নভেল-এর স্বাদ পাওয়ার পর বাঙালি, রাজশেখর বসুর ভাষায়, 'নভেলখোর' হয়ে উঠল (গ্রন্থাবলী ২:৩৩২)। তখন থেকেই গল্প লেখার একমাত্র বাহন হয়ে দাঁড়াল : গদ্য।

মূল কথা ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেছি— এমন ভাববেন না। আসলে নভেল-এর রুচি একেবারে শূন্য থেকে শুরু হয়েছিল। দুদশক যেতে না যেতে বাঙালির এই পরিবর্তন অন্য একটি দিক তুলে ধরে। সেটি হলো : বই-এর অর্থনীতি। বাঙালি যে নভেল-এ এত মজল তার প্রধান কারণ : বটতলা। চাহিদা ও জোগানের সূত্র অনুযায়ী নভেল লেখা, ছাপা, পড়া, কেনা— এই বাণিজ্যচক্র ঘুরতে থাকল। অন্য অঞ্চলের প্রকাশকরা (যেমন, কলেজ স্ট্রিট) যোগ দিয়েছেন অনেক পরে। কিন্তু সব মিলিয়ে এক-একটি বিশেষ ধরনের গল্প, কবিতা, নাটক ইত্যাদি নতুন রুচি গড়ে উঠল সময়ের সঙ্গে তাল রেখে। ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন দাশু রায় আর কবিয়াল-এর দল। হুতোমের নকশায় তার চমৎকার বর্ণনা আছে :

কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই ফুল আখড়াই পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। সহরে যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। (পৃ. ৭৫-৭৬)

যথারীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই

ইত্যাদিও বিদায় নিলেন। আবার রুচি বদলাল, নতুন নতুন টান দেখা দিল। তার মধ্যে প্রধান হলো : নভেল। নিশ্চিন্দিপুরের মতো অজ পাড়াগাঁয়ে সতু-রানীদের বাড়িতে কালে দেখা দিল পারিবারিক গ্রন্থাগার। সেখানেই অপু পড়েছিল *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা*-র পাশাপাশি *সরোজ সরোজিনী*, *গোপেশ্বরের গুপ্তকথা*, (*পথের পাঁচালি*, পরিচ্ছেদ ৮)। শুধু বাঙলার নয়, তিরহুত-এও (মিথিলা, বিহার) এমন অনেক 'বেঙের ছাতা' ঔপন্যাসিকের বই পৌঁছত। সবাই পড়তে পারতেন না, তাই একজন পড়ে শোনাতেন আর গোল হয়ে বসে শুনতেন বাকিরা। শশিশেখর বসুর একটি রম্যরচনায় তার চমৎকার বিবরণ আছে। (পৃ. ৫৫)

এর থেকেই অবশ্য বাঙলার দুধরনের রুচির সূচনা। একদল পড়তেন তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের বই; অন্যদল পড়তেন বটতলার ও তার অনুকারী লেখকদের, শশিশেখরের ভাষায় : 'থার্ড-কেলাসের নভেল'। আর কিশোর অপুর মতো সর্বভুক পাঠক নির্বিচারে সবই পড়তেন। তার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছিল অপুদের সাহিত্য রুচি। একশ বছর আগে জন্মালে তাঁদের সে-রুচি তৈরি হতো না।

এর মানে কিন্তু এই নয় যে, একশ বছর আগে কোনো সাহিত্যরুচি ছিল না। তখনও সেই সময়ের বাঙালির এক সাহিত্যরুচি ছিল। বিচারের নিরিখ ছিল তারও। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সংসারে যে বড় রকমের রদবদল ঘটে গেল, তার ধাক্কার অনিবার্যভাবেই পাল্টে গেল পাঠকের রুচি।

এই কারণেই কোন্ রচনাকে 'যথার্থ সাহিত্য' বলা হবে, আর কোনটিকে নাকচ করা হবে ফালতু বলে— এ ব্যাপারে সময়-নিরপেক্ষ কোনো মাপকাঠি থাকতে পারে না। বলার শুধু এই যে, কিছু ক্লাসিক রচনা বাদ দিলে, সব যুগই দাবি করে সেই যুগের উপযোগী নতুন রচনা। সে-রচনায় ধরা থাকবে সেই যুগের সাহিত্যরুচি। এমন কি চিরায়ত রচনার ক্ষেত্রেও একই কারণে, সব যুগে একই রচনার কদর হয় না, এক-এক যুগে এক-এক কারণে কদর হয় বা কদরের ধরন ও মাত্রার এধার-ওধার হয়। সব মিলিয়ে তাই এই সিদ্ধান্ত করতেই হয়: নান্দনিক প্রতিভাব (রেসপন্স)-এর ক্ষেত্রে সময়-এর একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে তার দরুণই রুচির অদল-বদল হয়। আর সেই অদলবদলকে বোঝার জন্যে সাহিত্যশিল্প-অতিরিক্ত এই মাত্রা— সময় এর মাত্রা— খেয়াল রাখা এত জরুরি।

পরিশিষ্ট

মলিয়ের (Moliere) সতেরো শতকের ফ্রান্সের বিখ্যাত কমেডি লেখক। তাঁর *ল্য বুর্জোয়া জাঁতীয়ম* নাটকে আছে : জনৈক হঠাৎ-নবাব জানতেন না গদ্য কাকে বলে; যখন তাঁকে বলা হলো তিনি সারা জীবন গদ্যেই কথা বলেছেন, তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন :

দর্শন-বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই—নিজের কথা প্রকাশ করার জন্যে গদ্য বা পদ্যই তো শুধু আছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ— গদ্য বা পদ্য ছাড়া আর কিছু নেই?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই— না, স্যার, যা কিছু গদ্য নয়, তা হল পদ্য, আর যা কিছু পদ্য নয়, তা হল গদ্য।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ— আর আমরা যখন কথা বলি, সেটা তাহলে কী?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই— গদ্য।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ— তার মানে? যখন আমি বলি : ''নিকোল, আমার চটি জোড়াটা নিয়ে আয় তো, আর আমার রাত্রিতে পরার টুপিটা দে''— সেটা গদ্য?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই— হাঁ স্যার।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ— তাজ্জব ব্যাপার! আমি এই চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গদ্য বলে আসছি আর সেটা একদম জানি না; একথাটা আমাকে জানানোব জন্যে আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ জানবেন। [জাতে ওঠার পাঁচালি, দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য। মঁলিয়ের-এর নাটকটি প্রথম বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৪, ২য় সং, ১৯৮০)। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে নাটকটির অভিনয় হয়েছিল। অনুবাদটি অবশ্য যথেষ্ট মূলানুগ নয়।] ❐

রচনাপঞ্জি

কল্যাণকুমার দত্ত। *মোলিয়্যার-এর তিনটি নাটক*। পুঁথিপত্র, ১৯৮৮

কালীপ্রসন্ন সিংহ। *হুতোম প্যাঁচার নক্সা ও অন্যান্য সমাজচিত্র*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৩

চিড়িয়াখানার *নিশাচর। সমাজ কু চিত্র* (১৮৬৫) কালীপ্রসন্ন সিংহ দ্র.।

নির্মাল্য বাগচী। *রামমোহন চর্চা: ইতিহাসে বঞ্চনা ও অবহেলা*। সুবর্ণরেখা, ১৯৯৫।

প্যারীচাঁদ মিত্র। *আলালের ঘরের দুলাল*। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২০১৫।

বিনয় ঘোষ। *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*। খণ্ড ১ : প্যাপিরাস ১৯৮০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *পথের পাঁচালী। বিভূতি-রচনাবলী*, খণ্ড ৩। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭।

রাজশেখর বসু । *গল্পের বাজার, চলচ্চিন্তা। পরশুরাম গ্রন্থাবলী*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৮৮।

শশিশেখর বসু। *যা দেখেছি যা শুনেছি*। মিত্র ও ঘোষ, ২০০৫।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*। খণ্ড ২। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৫।

হরিপদ চক্রবর্তী সম্পা.। *দাশরথি রায়ের পাঁচালী*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পার্থসারথি মিত্র, প্রদ্যুৎ কুমার দত্ত, সিদ্ধার্থ দত্ত ও শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বুদ্ধিজীবীর রাজদর্শন : সংস্কৃতির বিড়ম্বনা

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। তাঁদের বৈপ্লবিক ভূমিকা যেমন সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছে, তেমনই তাঁদের প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কিম্বা অপ্রত্যক্ষ শরিক হয়ে ওঠার কাজও কম সমালোচিত হয়নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবী নামক এই শিলাখণ্ডটির তাতে কোনোদিন কিছু আসে যায়নি। এঁদের শোয়া এবং বসার মধ্যে পার্থক্যরেখা টানা প্রায় অসম্ভবের শিল্পচর্চার সামিল। তবু এঁরা এমনই একটি বর্গ যাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর এই বর্গীয়রা যেহেতু তাঁদের এই ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে অতি-সচেতন, তাই তাঁরাও প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনারহিত হয়ে সব ব্যাপারেই কিঞ্চিৎ নাক গলিয়ে কিছু না কিছু সমস্যার জন্মদান অবধারিত করে তোলেন।* তাঁরা আসলে নিজেদের ওপর অতি-আস্থার কারণে নিজেদের সমাজের, মনুষ্যত্বের, মানবিকতার এবং সর্বোপরি সমাজ বিপ্লবের অভিভাবক ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

এরিখ হবসবম তো বলেছেন যে আজকের দিনে যাঁরা বিপ্লবী তাঁরাই বুদ্ধিজীবী, যদিও বিপ্লবী মানেই বুদ্ধিজীবী নন। আর এই বুদ্ধিজীবী হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ায় শিক্ষাগত মান বা যোগ্যতা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দের পরিসীমিত সময়কালে দেখা গিয়েছে যে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর পঁচিশজন সদস্যের মধ্যে মাত্র নয়জনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল, দু'জনের শিক্ষা সেমিনারি পর্যায়ের, ছ'জন স্কুল-হাইস্কুল পর্যায়ের আর বাকিরা 'ট্রেড স্কুল' কিম্বা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এখানে সম্ভবত প্রথাগত বা অ্যাকাডেমিক শিক্ষার চাইতে অপ্রথাগত শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও একজনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবীর দায়িত্বপালন অসম্ভব নয়। বাস্তবে এমন তথ্য তো আমাদেরই দেশেই সহজলভ্য। কবির, দাদু, নানক, লালন ফকির, কাঙাল হরিনাথ সহ উত্তরকালের অনেক প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীর দেখা মেলে যাঁরা প্রথাগত শিক্ষায় অনধিকারী ছিলেন এবং আমাদের সমাজবিকাশের ধারায় তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গিয়েছেন।

বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ব্যাপারে সচেতন থেকেই শাসকশ্রেণী চিরকাল এই সম্প্রদায়কে স্ব-স্বার্থে কিম্বা তাঁদের কায়েমি স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। শাসকশ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থতার কারণে সেই সব বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্নভাবে পুরস্কৃতও হয়েছেন। কিন্তু শাসকশ্রেণী যখনই এঁদের স্ব-স্বার্থে ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছেন তখনই সেই অবাধ্য বুদ্ধিজীবী রাজদ্রোহী বা আধুনিক পরিভাষায় দেশবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। বুদ্ধিজীবীর স্বাধীন মতপ্রকাশ কিম্বা মতাদর্শ অনুসরণের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে, বিদ্রোহ করার মতো ন্যায়সঙ্গত অধিকারও নিশ্চয়ই থাকবে, অন্তত থাকা উচিত। কিন্তু শাসক মতাদর্শ তার ভাবরাজ্যে ভিন্নমতের চিন্তাচর্চা কিম্বা মতদ্বৈধতার অধিকারের স্বীকৃতি দেয় না। ফলে শাসকের কায়েমি স্বার্থের সেবাব্রতে আজ যিনি মহিমান্বিত হন আগামীকালই তিনি কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে অমিত্রসুলভ আচরণের দরুন শত্রু ঘোষিত হয়ে ওঠেন।

(২)

এবার শুরু করা যাক কবি হাইনরিশ হাইনে-র বক্তব্য দিয়েই। হাইনে লিখেছিলেন :

আমি এক খোলা তলোয়ার
আমি এক আগুনের শিখা
তোমার অন্ধকার ঘরে আমিই তো আলো নিয়ে আসি
আবার যখন যুদ্ধ শুরু হয়
আমি তোমার লড়াইয়ের সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াই

যে কবি এরকম কথা বলবেন তিনি কখনও রাজার বা শাসকের প্রিয়পাত্র হতে পারেন না। যত ভালো কথাই প্রচার করুন না কেন রাজা বা শাসকশ্রেণী কখনও এমন কোন বক্তব্য বা কথা অনুমোদন করবেন না যা তাঁর বা তাঁদের কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে বিরোধাত্মক সম্পর্ক তৈরি করে। রাজা বা শাসক কখনও শাসিতের বন্ধু হয় না। রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণের আন্দোলনের দমনের হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করে থাকে। রাজা বা শাসকশ্রেণী যখন দৃশ্যত কোনও জনমঙ্গলকর কাজ করে থাকেন,

* জর্মনিতে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ফরাসি বিপ্লবের 'ভাবকল্পের' প্রতিধ্বনি করে পরবর্তীতে রোমান্টিসিজম ও পুনরুজ্জীবনের 'পতাকাবাহী" হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালির বুদ্ধিজীবীরা বামপন্থী রাজনীতিকে সমর্থন করলেও উত্তরকালে ফ্যাসিজমের স্বপক্ষতা করেছিলেন। এখানে এইসব বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাচর্চায় কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনানুগত্যের চাইতে বড়ো হয়ে উঠেছিল তাঁদের চলতি-হাওয়ার-পন্থী হওয়ার প্রবণতা। এরকম নিদর্শন কি আমরা পশ্চিমবাংলায় অহরহ প্রত্যক্ষ করছি না? পশ্চিমবাংলার সুদীর্ঘ তিনটি দশকেরও অধিক সময় 'বাম' আধিপত্য দুর্দণ্ড প্রতাপে কায়েম থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী এবং হিন্দুত্ববাদীদের সংগঠনের বাড়বাড়ন্ত কী করে হয়, তার ব্যাখ্যা কিন্তু ওইসব 'বাম'পন্থীরা আজও দেননি। বরং দেখা গিয়েছে যে সরকারি বামপন্থীদের স্বর্গরাজ্যে হানা দিয়ে দক্ষিণপন্থী ও হিন্দুত্ববাদীরা অবাধে শক্তি সঞ্চয় করেছে। বহু 'বাম' বুদ্ধিজীবী অবলীলায় তাঁদের আনুগত্যের বদল ঘটিয়েছেন!

তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই এর পেছনে তাঁদের কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। উনিশ শতকে ব্রিটিশশাসিত ভারতে ইংরেজরা যখন রেললাইন বসিয়ে রেলব্যবস্থা চালু করেছিল, তখন তা আপাতভাবে জনমঙ্গলকর হওয়া সত্ত্বেও এর পেছনে ব্রিটিশ শাসকদের শাসকবিরোধী গণআন্দোলন দমনে অতিদ্রুত ভূমিকা গ্রহণের বিষয়টি কার্যকরী ছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে রেললাইন পাতার কাজে তাদের শস্তা শ্রমের ব্যবহার এবং সাঁওতাল মহিলাদের ওপর অত্যাচারের বিষয়গুলি তো ইতিহাসে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। বালজাকও বলেছিলেন যিনি যত বড়ো দানশীল ও ধার্মিক তিনি আসলে তত বড়ো ভণ্ড।

তবু শাসক বা রাজা বিভিন্ন কবি বা বুদ্ধিজীবীকে আনুকূল্য দিয়ে নিজের একটা গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি তৈরি করতে সবসময়ই যত্নবান হন। অবশ্য এর পেছনে তাঁদের গূঢ় উদ্দেশ্য সবসময়ই কার্যকরী থাকে। আসলে এই আনুকূল্যদানের মাধ্যমে তাঁরা শিল্পীর মেধাকে কিনে নেন, স্ব-স্বার্থে তাঁকে ব্যবহার করেন আর এর পুরস্কারস্বরূপ তাঁদের উপঢৌকন দিয়ে অনুগৃহীত করেন। সেইসব শিল্পীরাও তার প্রতিদানে রাজস্তুতি করেন, তাঁদের কাছে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। রাজমাহাত্ম্যই তাঁদের সৃষ্টকর্মে প্রকীর্তিত হয়। বর্ধমানে মহারাজা মহতাবচাঁদ তাঁর প্রিয় ফারসি কাব্য *ইসকন্দরনামা*-র অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর রাজসভার কবি মুন্সি মহম্মদি ও গোলাম রব্বানিকে। আসলে *ইসকন্দরনামা* ছিল ফারসি কবি নিজামির সৃষ্ট কাব্য। এই কাব্যের উপজীব্য ছিল গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের দিগ্‌বিজয়ের কাহিনি। দিগ্‌বিজয়ের সঙ্গে তো পরদেশ আগ্রাসনের বা অধিকারের নিবিড় সম্পর্ক। আর মহারাজা মহতাবচাঁদের প্রিয় এই ফারসি কাব্য তাঁর ইচ্ছার মূল্য দিতে অনুবাদ করেছিলেন পুর্বোক্ত দু'জন। কবি খোন্দকার সামসুদ্দিন সিদ্দিকিও মহতাবচাঁদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজানুগত্যের মূল্য দিতে তিনি তাঁর 'ভাবলাভ' কাব্যগ্রন্থের রাজার প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছিলেন:

ভূপ ভূপতির চাঁদ মহারাজ।
কর্মেতে মহাতাব চন্দ্র সুখ্যাতি বিরাজ।।

এই মহারাজ মহতাবচাঁদ তাঁর রাজসভার কবি রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্যারিমোহনকে যথাক্রমে 'কবীন্দ্র' ও 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। মহতাবচাঁদের পূর্বপুরুষ প্রতাপচাঁদের সভা আলো করতেন বিখ্যাত কবি ও গীতিকার কালী মির্জা বা কালিদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'শ্রীশ্রী কালীকুণ্ডলিনী' কাব্যে তিনি রাজা প্রতাপচাঁদের প্রশস্তি করতে গিয়ে লিখেছিলেন:

তেজচন্দ্র তনয় প্রতাপচন্দ্র নাম।
সর্বজনপ্রিয় আর সর্বগুণ ধাম।।
সর্বত্র সুযশ ছিল সর্বত্র সম্মান।
কার্যে সুপ্রখর বুদ্ধি শাস্ত্রে সুবিদ্বান।।
ছোট মহারাজ বলি খ্যাতি ছিল যাঁর।
ধর্মপ্রাণ ধীরচিত্ত সুচিন্তা ভাণ্ডার।।

বর্ধমানের রাজা চিত্রসেনের চরিতকাব্য 'চিত্রচম্পূ' অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় চম্পূকাব্য রচনা করেছিলেন কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। রাজজীবনী হিসেবে এতে রাজার মনোরঞ্জনের আধিক্য স্বভাবতই শব্দায়িত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই কবি বাণেশ্বর বারবার রাজা-বদল করে আনুগত্যের বদলনামা উপস্থাপিত করেছিলেন। বাণেশ্বর ছিলেন হুগলির গুপ্তিপাড়ার শোভাকর পণ্ডিতের বংশধর রামদেব তর্কবাগীশের পুত্র। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগরের রাজসভায় যোগদান করেন। উত্তরকালে কোনও কারণে রাজার বিরাগভাজন হওয়ায় বর্ধমান রাজসভায় চিত্রসেনের অনুগ্রহপ্রার্থী হন। রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুত্তর পর্যায়ে তিনি আবার কৃষ্ণনগরের রাজসভায় ফিরে এসে পুনরানুগত্য বদলান। পরবর্তীতে তিনি আবার আনুগত্য বদল করে কলকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের সভা আলোকিত করেন।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের অনুগ্রহধন্য হয়েছিলেন। রাজপ্রশস্তি করতে গিয়ে ঘনরাম লিখেছেন:

জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়।
মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র রায়।।
আশীর্বাদ করি তায় বসিয়া বারামে।
কইয়র পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।।

ঘনরাম আরও লিখেছিলেন:

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিনতি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও রাজা কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন। জগন্নাথকে কীর্তিচন্দ্র বিপুল পরিমাণ নিষ্কর জমি ও পুকুর দান করেছিলেন। আর এই অনুগৃহীত পণ্ডিত রাজস্তুতি করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে রাজা কীর্তিচন্দ্রের কীর্তি চন্দ্রের মতো আকাশে বিরাজ করছে, যা দেখে চন্দ্রের পত্নী রোহিণী স্ব-স্বামীকে যাতে চিনতে ভুল না করেন তার জন্যে নিজের স্বামীর গায়ে একটি দাগ এঁকে দিয়েছিলেন, যা আদতে চাঁদের কলঙ্ক নয়। এই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একসময় কৃষ্ণনগর রাজসভাও অলঙ্কৃত করেছিলেন। সাধক কবি কমলাকান্তও বর্ধমান রাজসভার আনুকূল্য পেয়েছিলেন।

বর্ধমানের রাজসভার মতো কৃষ্ণনগর রাজসভায়ও কবি, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবীদের সমাগম ঘটেছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যাঁদের আলোয় আলোকিত হতো তাঁরা হলেন : রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, শঙ্কর তর্কবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ,

শরণ তর্কালঙ্কার, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামগোপাল সার্বভৌম প্রমুখ। এই আলোকিত সভায় যোগ দেন কবি ভারতচন্দ্র। প্রথমে তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা মাসিক বেতনে রাজসভায় সভাকবি হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অপার অনুগ্রহে তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধিভূষিত হন। রাজার আদেশে লেখেন *অন্নদামঙ্গল*। রাজার মনোরঞ্জনের ফলশ্রুতিতে তিনি মূলাজোড় গ্রাম উপঢৌকন পান। এই 'অন্নদামঙ্গল'-এর সূচনায় 'গণেশ বন্দনা' এবং 'শিব-বন্দনা'-র শেষে ভারতচন্দ্র লিখেছেন:

কৃষ্ণচন্দ্র-ভক্তি আশে ভারত সরল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।।

'গ্রন্থ-সূচনা'-র প্রাক-পর্যায়ে প্রতিটি বন্দনার শেষে কবি ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্তুতিগীত গেয়েছেন। এছাড়া কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ''কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়'' কিম্বা ''কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে'' ইত্যাদি। সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গেও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বর্তমান ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকেও ''একশ বিঘা নিষ্কর জমি'' উপহার এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেছিলেন। রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে 'বীভৎসরুচির' 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছেন তবে একইসঙ্গে তিনি মহারাজের 'সভাসদ' হওয়ার প্রস্তাব কিম্বা নবাব সিরাজদৌল্লার অধীনে উচ্চরাজকর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাজস্তাবক ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কবি রামপ্রসাদের পার্থক্য এখানেই।

বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ দিল্লী থেকে প্রখ্যাত ধ্রুপদি সঙ্গীতগায়ক বাহাদুর খাঁ-কে মাসিক 'পাঁচশ' টাকা বৃত্তি দিয়ে তাঁর রাজসভায় নিয়ে এসেছিলেন। এর প্রতিদানে বাহাদুর খাঁ তাঁর একটি গানে রাজপ্রশস্তি করতে গিয়ে লিখেছিলেন:

সবগুণ নিধান মহারাজ রঘুনাথ
তুঅ দরবার সায়ত শোহাও এ।
* * *
তুঅ সোম রাজ জগমেঁ নহি দুজো
ইস লিয়ে বাহাদুর নিশি দিন গুণ গাওএ।

বিষ্ণুপুর রাজসভায়ও বিদূষক, সভাপণ্ডিত, গায়ক প্রভৃতির অভাব ছিল না। তবে সভাকবির কথা বলতে গেলে অবশ্যই উল্লেখ হবে দ্বিজ কবিচন্দ্রের নাম। দ্বিজ কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম ছিল শঙ্কর কবিচন্দ্র। তিনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের পরপর চারজন রাজার আমলে সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর *শিবমঙ্গল* কাব্যে মহারাজা বীরসিংহ বন্দিত হয়েছেন। তাঁর *অনাদিমঙ্গল* এবং *বিষ্ণুপুরী রামায়ণ*-এ রাজা রঘুনাথ সিংহ বন্দিত হয়েছেন। তাঁর পূর্বোক্ত রামায়ণে তিনি রঘুপতির উদ্দেশ্যে রাজা রঘুনাথের যুদ্ধজয়ের প্রার্থনা করেছেন। তাঁর ব্যাসদেবের মহাভারতের সারানুবাদে তিনি রাজা গোপাল সিংহের প্রশস্তি করতে গিয়ে লিখেছেন:

শ্রীযুক্ত গোপালসিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্তি দেখিলে ঘুচয় মনস্তাপ।।

এছাড়া গোপালসিংহ সমসময়ে কবি উত্তম দাসের *শ্রীপ্রকাশরস*, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ধর্মমঙ্গল* কাব্যেও প্রশংসিত হয়েছেন। প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়ও তাঁর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে রাজা গোপালসিংহ এবং তাঁর পুত্র চৈতন্য সিংহের মঙ্গলকামনা করেছেন।

(৩)

এইসব রাজকবি ও রাজানুগত বুদ্ধিজীবী বা বুদ্ধিচর্চাকারীদের কাছে রাজার প্রশংসা, রাজার এবং তাঁর বংশের অন্যান্যদের কল্যাণকামনা যতখানি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতো, দেশের সাধারণ মানুষজন তাঁদের কাছে ততখানি অবিবেচনার শিকার হয়েছেন। বাস্তবিক এঁরা ছিলেন সমসময়ে দেশের বৃহত্তর জনমানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশের কথা, মানুষের অবস্থা যে কখনও তাঁদের সৃষ্টকর্মে বর্ণিত হতো না, এমনটি নয়। তবে রাজপ্রশস্তি ও রাজার গুণ প্রকীর্তনের বাহুল্যে তা ছিল একান্তই অনাদরগ্রস্ত রাস্তার ধারের বর্ণহীন ফুলের মতো।

রাজার স্তুতিগান রচনার কাজ কবিরা আমাদের দেশে বৈদিক যুগ থেকেই করে আসছেন। রাজার এইসব স্তুতিগায়কদের বলা হতো সূত। এই সূত কারা? ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত ক্ষত্রিয় সন্তানকে সূত বলা হতো। আর বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের মিলনে জাত সন্তানকে বলা হতো মাগধ। এ তথ্য মহাভারতেই মেলে। এই সূত এবং মাগধরা রাজার নিকট থেকে বৃত্তিলাভ করতেন। রাজা পৃথু দুজন সূত এবং মাগধকে বিপুল পরিমাণ জমিদান করেছিলেন। রাজদরবারে এঁদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। স্বভাবতই উপরে আমরা যেসব রাজকবির কথা বললাম সেইসব রাজপ্রশস্তিকারদের আবির্ভাব যে নতুন নয়, তা এই সূত এবং মাগধদের তথ্যেই প্রমাণ হয়। আসলে সূত এবং মাগধদের রূপান্তর ঘটেছিল প্রাগাধুনিক পর্যায়ে। আধুনিক ইতিহাসে আমরা এর নতুনতর সংস্করণের সঙ্গে পরিচিত।

বাস্তবিক রাজসভার এবং রাজানুগৃহীত কবি বা বুদ্ধিচর্চাকারীরা তাঁদের আনুকূল্যপ্রদানকারী রাজাদের মনোরঞ্জনের বিষয়ে যতখানি উৎসাহী থাকতেন ঠিক ততখানি অনুৎসাহী থাকতেন সমসময়ের দেশের জনসাধারণের জীবনধারণের সংগ্রাম ও সমাজব্যবস্থার রক্তাক্ত ক্ষত সম্পর্কে। এই প্রশ্নাতীত রাজসেবাকেই তাঁরা তাঁদের চিন্তাচর্চা ও কাব্যকৃতিতে প্রাধান্য দিয়েছেন, রাজার স্তুতিগাথায় হাজার হাজার শব্দের তাজমহল নির্মাণ করেছেন। রাজা প্রীত হয়েছেন, কবিকে নানাবিধ উপঢৌকন দিয়েছেন। রাজা-মহারাজা প্রমুখ, এককথায় দেশের শাসকশ্রেণী, কবি তথা বুদ্ধিচর্চাকারীদের রুটিরুজির

ব্যবস্থা করেছেন, নিরাপদ জীবনের অনুকূল শর্ত সৃষ্টি করেছেন তাঁদের প্রশ্নাতীত রাজস্বার্থসেবার প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে। *পবনদূত* কাব্যরচনার জন্যে সভাকবি ধোয়ী-কে রাজা লক্ষণ সেন 'কবিরাজ' শিরোপা দিয়েছেন, নানাবিধ পুরস্কার ও উপঢৌকন দিয়েছেন। বাণভট্ট তাঁর *হর্ষচরিত*-এ লিখেছেন, যে রাজা হর্ষবর্ধন তাঁর প্রজ্জ্বলিত প্রতাপের দেওয়াল দিয়ে 'জগতকে' রক্ষা করে চলেছেন, সেই হর্ষবর্ধনের জয় হোক।—এ ধরনের রাজস্তুতি তো রাজার খুশির কারণ ঘটাবেই। সন্ধ্যাকর নন্দী রাজা রামপালকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে রামপালের কীর্তিবর্ধন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সভাকবি উমাপতি তাঁর *চন্দ্রচূড়চরিত* কাব্যরচনার জন্যে রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নিকট থেকে পুরস্কার ও উপঢৌকনস্বরূপ অন্য অনেককিছুর সঙ্গে তিনলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা এবং একশ গ্রামের অধিকারিত্ব অর্জন করেছিলেন। কবি মালাধর বসু রাজসেবার মূল্যে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র তো তাঁর প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি প্রশংসার ভাণ্ড উজাড় করে দিয়েছিলেন।

কবি র‍্যালে মহারানি এলিজাবেথের পায়ে যাতে কাদা না-লাগে তার জন্যে কর্দমাক্ত রাস্তায় নিজের গায়ের আবরণ পেতে দিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। অথচ এই রাজানুগত র‍্যালেই আবার উত্তরকালে রানির কোপানলে পড়ে জীবনের শেষ পনেরো বছর কারাবাস করেন এবং রানির আদেশে তাঁর গর্দান যায়। অনুরূপভাবে রাজা লক্ষ্মণসেনকে নারীসঙ্গ বিষয়ে 'অবাঞ্ছিত' পরামর্শদানের কারণে মন্ত্রী উমাপতিধরকে কর্মচ্যুতি এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন (পরে অবশ্য এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়েছিল)। এলিজাবেথান যুগের অন্যতম প্রধান সভাকবি সারে রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে রাজদ্রোহের অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্বভাবতই দেখা যাচ্ছে রাজা বা শাসকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল কাজের জন্যে কবি বা বুদ্ধিচর্চাকারীরা যেমন পুরস্কৃত হয়েছেন, তেমনই রাজা বা শাসকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূল কাজ বা আচরণের জন্যে চরম মূল্য দিয়েছেন। আসলে রাজা-মহারাজা কিংবা এককথায় শাসকশ্রেণী স্তাবকতা পছন্দ করতেন। তাঁরা অর্থমূল্যে কিংবা পুরস্কার বা উপঢৌকনের মূল্যে এই প্রশ্নহীন স্তাবকতা ক্রয় করতেন। এই স্তাবকতার বিপরীত চিন্তা বা কাজকর্মকে চিহ্নিত করা হতো রাজবিরুদ্ধতা বা বিদ্রোহ হিসেবে। আর এই বিদ্রোহদমন ছিল রাজার ধর্ম, রাজধর্ম। এর কোনও ব্যত্যয় কি আজও প্রত্যক্ষ করা যায়?

কার্ল ম্যানহাইম বলেছেন যে এইসব কবিদের কবিকৃতিকে মূল্য দিয়েই কেনা হতো, আর এইসব কবিকৃতির অধিকাংশই ছিল নিছক রাজপ্রশস্তি বা রাজার নির্লজ্জ তোষামোদ। এইসব কবি, বুদ্ধিজীবী কিংবা বুদ্ধিচর্চাকারীরা তাঁদের কাব্য বা চিন্তাচর্চায় শুধুমাত্র রাজা বা শাসকের বন্দনা গীতি গেয়েছেন, সমসময়ের সমাজ ও মানুষের জীবনসংগ্রাম তাঁদের কাছে চর্চাযোগ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি। দেশ ও সমাজের সাধারণ মানুষের শ্রম ও লড়াই সম্পর্কে তাঁদের কোনো অনুভূতি ও শ্রদ্ধা ছিল না। শেকসপিঅরের কিং লিঅর নাটকে লিঅর-এর অমোঘ খেদোক্তির মতো তাঁরা 'ঈশ্বরের খোচর' হিসেবেই সবসময় রাজার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্লান্তিহীন প্রয়াস পেয়েছেন।

রানি অ্যান-এর শাসনকালে ইংলন্ডে উপার্জনহীন স্বাধীন লেখক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতেন, কেননা নির্দল-থাকা তাঁরা শ্রেয় বিবেচনা করতেন না। এই দলীয় আনুগত্যের পরিণতিতে তাঁরা যেসব উপঢৌকন পেতেন তা আসতো হুইগ অথবা টোরি-র নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে। অর্থাৎ এইসব 'স্বাধীন' লেখক কোনো একটা রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যনামা হাজির করার পর আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ উপঢৌকন পেতেন। এখন এই আধুনিক ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে এমনকি এই খোদ পশ্চিমবঙ্গেও কি এর ব্যতিক্রম কিছু দেখতে পাই আমরা?

(৪)

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীতে এদেশ বিদেশির করতলগত হওয়ার পর থেকে এই উপঢৌকন ও খেতাবের রাজনীতি একটা নতুন মাত্রা অর্জন করেছিল। রাজস্তুতির ধরনেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। শাসক এবং শিক্ষিত বুদ্ধিচর্চাকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিদেশি শাসকদের বিদেশি না-ভেবে একান্ত আত্মজন বিবেচনায় আমাদের দেশের, বিশেষত বাংলার, শিক্ষিত বুদ্ধিচর্চাকারীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অবিরোধ ও মিত্রতার নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হন। সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহগুলিকে তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। সরকারের বিপন্নতাকে তাঁরা তাঁদের নিজেদের বিপন্নতা হিসেবে গণ্য করতেন। অন্যদিকে যেসব গণআন্দোলন মূলগতভাবে সরকারবিরোধী নয়, বরং কিছু সংস্কারের মাধ্যমে সরকারকেই মান্যতা দিতে চায়, সেইসব আন্দোলনে তাঁরা সামিল হয়ে প্রকৃত অর্থে আন্দোলনকারী এবং সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন। রাজানুকূল্য প্রদর্শনের এটাই ছিল নতুন ধরন যা উনিশ শতকের বাংলায় দেখা গিয়েছিল। আর এইসব বুদ্ধিচর্চাকারীদের সরকার রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুর, সিআইই (কম্পেনিঅন অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার), কেসিআইই, খানবাহাদুর ইত্যাদি খেতাব প্রদান করে সম্মান জানাতেন। উনিশ শতকের বাংলায় অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিচর্চাকারীরা এইসব খেতাব পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের কাব্যে-সাহিত্যকর্মে-বক্তৃতায় সরকারের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যের নির্দশন রেখেছেন। আর এর বিপ্রতীপে বেয়াড়া বিদ্রোহীরা সরকারের নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়ে বেঘোরে

প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কারও প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসি হয়েছে, কারও হয়েছে ফাঁসিকাঠে। কারও মৃত্যু ঘটেছে পুলিশের গুলিতে, কারও জেলের ভেতর অত্যাচারে। কিন্তু রাজানুগৃহীতদের এ নিয়ে খুব একটা হেলদোল কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম আবার নতুন করে বিকাশলাভ করতে থাকে। সরকারের ক্রমাগত জনবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে বিশেষত মধ্যবিত্তদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হতে থাকে। নরমপন্থীরা এই পথ অনুমোদন না করলেও সবসময় সরকারের সরাসরি সমর্থনও আর করতে পারছিলেন না। এই পর্যায়ে সরকারের তরফ থেকে খেতাবদানের বিষয়টি সঙ্কুচিত হতে থাকে।

সাতচল্লিশ-উত্তর ভারতবর্ষে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় শাসকশ্রেণীর তরফ থেকে সমাজে প্রভাবশালী বুদ্ধিচর্চাকারীদের প্রলুব্ধ করার এবং সরকারের স্তাবক হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া কার্যকর হতে শুরু করে। গত শতকে ইন্দিরা জমানায় বুদ্ধিক্রয়ের বিষয়টি একটি বিশেষ চর্চার বিষয় (কনসেপ্ট) হিসেবে গণ্য হতে থাকে। পঁচাত্তরে জরুরি অবস্থা জারির আগে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী একদল বুদ্ধিচর্চাকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে কুখ্যাত জরুরি অবস্থা জারির পক্ষে তাঁদের সমর্থন নিশ্চিত করেন। এইসব বুদ্ধিচর্চাকারীরা সত্তরের রক্তঝরা কালো দিনগুলিতে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের প্রতি নীরব ঔদাসীন্য প্রদর্শনই শ্রেয় বিবেচনা করেছেন। অথচ এঁরাই আবার সাতাত্তর-উত্তর পরিবর্তনের 'বাম' জমানায় ভোলবদল করে সরকারের আস্থাভাজন স্তাবকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। চৌত্রিশ বছরের 'বাম' জমানার অবসানে নতুন পরিবর্তনের অসহনীয় জমানায় তাঁদের অনেকেই আবার বর্তমান সরকারের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন। অতিপরিচিত ঘোর 'বামপন্থী' অনেকেই এখন আবার বর্তমান সরকারের সেবকত্বে ব্রতবদ্ধ হয়েছেন। এখন তাঁরা নানাভাবে পুরস্কৃত হন, সম্মানিত হন। গণমানুষের ন্যায্য আন্দোলন এখনও তাঁদের বিবেককে দংশন করেনা।

একই ধারাবাহিকতার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে। কবি ফেডারিকো গার্সিয়া লোরকা লিখেছিলেন:

> প্রিয়তমার মুখে চুম্বনের জ্যোৎস্না আঁকতে গিয়ে
> এখন বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে
>
> বিধ্বস্ত বিবর্ণ মানুষগুলোর রক্তাক্ত মুখের কোণে
> ঝুলে থাকে এক টুকরো হাসির কথা।

কিন্তু না, কবি লোরকার মনে পড়লেও আমাদের দেশের পূর্বোক্ত রাজসেবক বুদ্ধিচর্চাকারীদের সেইসব মুখ মনে পড়ে না!

(৫)

শব্দগুলো আসলে বোমা কিংবা বুলেট নয়, তারা বরং ছোট ছোট পুরস্কার, আর সেই পুরস্কারের একটা অর্থ ও তাৎপর্য থাকে। —কথাগুলো ফিলিপ রথ-এর। শাসক যখন কাউকে কোনো পুরস্কার দেন, তখন তা নিছক সম্মান জানানোর জন্য নয়, এর বাইরেও তার আর একটা নিগূঢ় অর্থ থেকে যায়। যার জন্যে দেখা যায় এই পুরস্কার বা সম্মাননা সকলেই পাননা, কেউ কেউ পান। অনেক লেখক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, অনেকে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাননি। এই 'কেন পাননি' প্রশ্নের উত্তর নিহিত থাকে একটি নির্দিষ্ট রাজনীতির মধ্যে।

শাসকশ্রেণী সবসময়ই চায় লেখক-শিল্পী-গায়ক-চিত্রকর এমনকি প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ এমন কিছু না করুক যা কিনা সরকারের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। বরং সরকার অনেক সময় প্রতিবাদী কণ্ঠকে পুরস্কারের মাধ্যমে কিনে নিতে চায়। জনসমক্ষে তাঁকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে জনগণের তারিফও পাওয়া যায়, আবার পুরস্কারের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদের মানসিকতাকে পঙ্গু করে দেওয়া যায়। অন্যদিকে সরকার তার শ্রেণীমিত্রকেও পুরস্কারের মাধ্যমে তার সর্বাত্মক সহযোগিতার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে চায়। আদানি যেমন নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক মিত্র হয়ে তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হয়ে উঠেছেন, কর্পোরেট স্বার্থপূরণে মোদিকে ব্যবহার করছেন, পশ্চিমবঙ্গে তেমনই ভূমিকা পালন করছেন গোয়েঙ্কা হাউসের সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। বিদেশ সফরে আদানি যেমন মোদির ছায়াসঙ্গী, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মমতার ছায়াসঙ্গী সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এহেন অকৃত্রিম বন্ধুকে মমতা ব্যানার্জী 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে আদানিও ভারতরত্ন হয়ে যাবেন! কিন্তু শিল্পী বা প্রতিবাদী ব্যক্তিকে পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে যেমন তাঁকে একটা বন্ধনের ফাঁসে আবদ্ধ করে থাকে সরকার, পুঁজিবাদী বা কর্পোরেট দৈত্যকে কিন্তু সরকার সেরকম কোনো শৃঙ্খল-আবদ্ধ করার বিপরীতে তাঁকে তাঁর কাজ অবারিত প্রক্রিয়ায় চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। গতবছর ২০ মে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে সম্মাননা-জ্ঞাপনের পরের দিনই অর্থাৎ ২১ তারিখেই গোয়েঙ্কার সিইএসসি-র বিদ্যুতের দাম বেড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ সম্মানিত হয়েই তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ন্যূনতম ২৫ থেকে ৩৫ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ওপর বিদ্যুতের বর্ধিত দাম হয়েছিল যথাক্রমে ১৮.৭০ শতাংশ এবং ১৮.৪০ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে স্মরণ থাকতে পারে যে ২০১৪-র মার্চ পর্যন্ত সিইএসসি-র লাভ হয়েছিল ২৪৩ কোটি টাকা, আর গতবছরের মার্চ পর্যন্ত এই লাভের পরিমাণ ছিল ২৪৪ কোটি টাকা।

গতবছর ২০ মে তারিখে বঙ্গবিভূষণ প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবীর সুমন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সময় থেকে সুমন তাঁর প্রতিবাদীসত্তাকে সর্বসমক্ষে হাজির করতে সমর্থ

হয়েছিলেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের সর্বাত্মক বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে, নিজের গানের মধ্য দিয়ে ও আন্দোলনকারীদের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিবাদী মননের সামনে একটা প্রত্যাশার অবারিত আকাশকে উপস্থাপনা করেছিলেন। জঙ্গলমহলে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান বেঁধে, সেই গান গেয়ে প্রতিবাদী মানুষের কাছে তিনি প্রতিবাদের আইডল হয়ে উঠেছিলেন। অথচ এই মানুষটিই শেষপর্যন্ত তৃণমূলের সাংসদ হলেন! মূলগতভাবে বামপন্থী মননের মানুষ হয়েও সিপিএম-এর কট্টর বিরোধিতার জায়গা থেকে তিনি তৃণমূলের সাংসদ হয়ে গেলেন। সাংসদ হওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দল তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাঁধতে থাকে। তিনি দলীয় নীতির তোয়াক্কা না করেই পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোকে নিয়ে গান বাঁধলেন। ২০০৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ছত্রধরকে অনৈতিক পদ্ধতিতে, সাংবাদিকের ছদ্মবেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সুমনের ছত্রধরের গান, ছিতামণির চোখ, লালমোহনের লাশ প্রমুখ গানগুলি প্রতিবাদী সুমনের অবিসম্বাদিত প্রতিবাদী ভূমিকাকেই সামনে নিয়ে এসেছিল। এইভাবে তিনি একদিকে জনগণের আন্দোলনের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, আবার একইসঙ্গে সমস্ত বিরোধ সত্ত্বেও তৃণমূলের সাংসদপদ বজায় রেখে এক অদ্ভুত রকমের সুবিধেবাদী দর্শনের প্রায়োগিক অনুশীলন করে যাচ্ছিলেন। স্বয়ং তৃণমূলেশ্বরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকে। তবু তিনি তাঁর সাংসদ পদ বজায় রেখে তাঁর সুবিধেবাদকে অনাবৃত করতে দ্বিধাগ্রস্থ হননি। গত সংসদ নির্বাচনে তিনি স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের আনুকূল্য পাননি। সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক ও হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-র বিরোধিতার প্রশ্নে তিনি আবার ক্রমশ তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে যত্নশীল হন। স্বয়ং মমতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতিও হতে থাকে। এরপর তাঁর এই তৃণমূল তথা মমতা-বিরোধিতার অবনমনের পুরস্কার তিনি পেতে থাকেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে গত বছরের ১২ মে তারিখে বিচারকের রায়ে ছত্রধর, সুখশান্তি বাস্কে, শম্ভু সোরেন, সাগর মুর্মু সহ মাওবাদী নেতা রাজা সরখেল ও প্রসূন চ্যাটার্জীর যাবজ্জীবন সাজা ঘোষিত হওয়ার পর ১৪ মে কবির সুমন আবার কবিতা/গান লিখে এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর বিবেক যেন আবার জেগে ওঠে! তিনি লেখেন :

সলমন খান জামিন পাবেই, পাবেই জয়ললিতা
এদিকে ওদিকে জ্বলছে জ্বলবে গণতন্ত্রের চিতা
ছত্রধরের জামিন হবে না, যাবজ্জীবন পাবে
আসুন আসুন, সবাইকে আজ মাওবাদী বলা যাবে।
জঙ্গলে একা টহল দিচ্ছে কোটেশ্বরের ভূত
ভদ্রলোকেরা এ গান শুনো না, এই সুর অচ্ছুৎ।
স্পার্টাকাসকে দেখিনি কখনও, ছত্রধরকে দেখেছি
আর কোনোও কাজ জানি না বলেই তাকে গানে ধরে রেখেছি
দেশদ্রোহী যে কাকে বলে তা কি জানে অন্তর্যামীও
অমিত শা যদি ছাড়া পেতে পারে, দেশদ্রোহী তো আমিও।
যাবজ্জীবনে দণ্ডিত সব যে দিন মুক্তি পাবে
সেইদিনই এই দেশের মুখটা স্বদেশের বলা যাবে।

অথচ এই কবিতা/গান লেখার মাত্র ছয়দিনের মাথায় সুমন অবলীলায় মমতার হাত থেকে নতমস্তকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন! আত্মসমর্পণকারী জাগরী বাস্কে আর আত্মসমর্পণ-না-করা ছত্রধরের মধ্যে সুমন নির্দ্বিধায় জাগরীর পথ অনুসরণ করলেন। তিনি ছত্রধর সহ যাবজ্জীবন সাজা-পাওয়া বন্দিদের মুক্তির মধ্যেই স্বদেশের প্রার্থিত মুখ খুঁজে পেতে চাইলেন আবার একইসঙ্গে আত্মসমর্পণকারী জাগরীর মতোই শাসকের কৃপাপ্রার্থী হলেন! রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা তাঁর প্রিয় ঘোড়াটিকে তাঁর আইনসভার সদস্য করে নিয়েছিলেন, কেননা এই ঘোড়া তাঁকে পিঠে নিয়ে ঘুরতো। কবীর সুমন কি সেরকম কোনো অঙ্ক কষে মমতার প্রিয় ঘোড়ার দলে নাম লেখাতে চাইলেন? যে সুমন একসময় লিখেছিলেন ''আমাকে নয়, আমার আপস কিনছ তুমি'' সেই সুমন শেষে নিজেই আপস করে বসলেন। নিজেই আপসের বোড়ে হয়ে নিজেকে বিক্রি করলেন। আইনস্টাইন একসময় বলেছিলেন : বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ হয় পরিবর্তনের সামর্থ্যের মধ্যে দিয়ে। নিজের অবস্থান পরিবর্তনের সামর্থ্যের মধ্যে দিয়ে সুমন প্রমাণ করছেন যে তিনি বুদ্ধিমান! আর এই বুদ্ধিমান 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবী এবছর তৃণমূলেশ্বরীর একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে হাজির হয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতায় মমতাকে দেবীর আসনে অভিষিক্ত করে ভবিষ্যৎবক্তার মতো ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে একদিন মমতার নামে মন্দির হবে আর সেইসব মন্দিরে মমতা পূজিতা হবেন আরাধ্যা দেবী হিসেবে! এই স্তুতির সঙ্গেই তিনি আবার সবিনয়ে মমতার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের কারান্তরালে থাকা রাজবন্দিদের মুক্তির বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন।! ধৃষ্টতার সীমা অতিক্রম করতে এই ব্যক্তিটির কোনো সমস্যা হয় না।

আর এক বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী হলেন কবি সুবোধ সরকার, যিনি সিপিএম-এর ডাকসাইটে বুদ্ধিজীবী হিসেবে 'বামফ্রন্টের' বুদ্ধিজৈবিক প্রহরী ছিলেন। 'বাম' জমানায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক বিদ্রোহ এবং 'বাম' সরকারের দমন-পীড়ন-গণহত্যা- ধর্ষণ-হার্মাদি সংস্কৃতির সঙ্গে অবিরোধ সম্পর্কে আবদ্ধ সুবোধ সরকারের জনবিরোধী ভূমিকার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনিই হঠাৎ 'পরিবর্তনের জমানায়' কামদুনির নির্মম ঘটনার প্রতিবাদী মিছিলে এসে যোগ দিলেন তাঁর 'পরিবর্তিত' বিবেকবোধের তাড়নায়। এদিন তিনি স্বীকার করলেন যে সিঙ্গুরের তাপসী মালিকের হত্যার প্রতিবাদী মিছিলে তিনি যোগ না দিয়ে ভুল করেছিলেন! তাঁর এই হঠাৎ পরিবর্তিত বিবেক কিছুদিনের মধ্যেই আনুগত্য বদল করে তৃণমূল নামক চরম দক্ষিণপন্থী দলটির অনুগামী হয়ে তার বুদ্ধিচর্চার

নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন। এখন তিনি তৃণমূলের পরিবর্তিত জমানায় সুবিধাভোগের প্রাসাদবাসী হয়ে আক্রান্ত মূল্যবোধের আর্তনাদের মধ্যে সুমধুর সঙ্গীতের মূর্ছনার আবেশে সমাহিত।

আর একজন 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবী যিনি বিপ্লবচর্চায় এবং 'সামাজিক ফ্যাসিবাদের' বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রামের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক বিদ্রোহের সময় তৃণমূলেশ্বরীর রাজনৈতিক দিগদর্শনে মোহিত হয়ে তার সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, এখন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি-বিশ্বস্ত সাংস্কৃতিক যোদ্ধা এবং তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নির্বাচিত প্রশাসক! আরও একজন যিনি একসময় অতি-বিপ্লবীপনায় চূড়ান্ত নিদর্শন রাখতে কোনও খামতি রাখতেন না, কথায় কথায় ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়তেন, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের উত্তপ্ত সময়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চর্চার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে তাঁর একসময়ের শ্রেণীশত্রুর মধ্যে বিশ্বস্ত মিত্রের সন্ধান পেয়ে তাঁদের সমস্ত জনবিরোধী অপকর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকার হয়ে ওঠেন। বামফ্রন্টীয় শিল্পগাথার উল্লেখযোগ্য সঙ্গতকার হিসেবে তাঁর সঙ্গত সিপিএম-এর মধ্যেই অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। তিনি অবশ্য পরিবর্তনের জমানায় আর নতুন করে জামা পরিবর্তন করেননি এবং বর্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম-এর জোটতত্ত্বের অন্যতম প্রধান সৈনিক। তাঁর এক সময়ের বেশ কিছু সহযোদ্ধা এখন তৃণমূলায়িত হয়ে অতীতচারণার বিপ্রতীপে বর্তমান ও আগামীদিনের নতুন স্বপ্নের মহান দ্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। এমনও একজন 'আগুনখোর বিপ্লবী' আছেন যিনি রাজনৈতিক সুবিধাবাদের চূড়ান্ত করতে কখনও সরকারি বামপন্থার, কখনও আবার খোদ তৃণমূলের সমর্থনে নির্বাচনে প্রার্থী হন, আবার বাজারি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের জোটের তত্ত্বায়ন হাজির করেন এবং সিপিএম-কে বাদ দিয়ে 'বাম আন্দোলন' অসম্ভব বিবেচনায় (অপ)-যুক্তির সমারোহ ঘটান। এরকম আরও অনেকে আছেন। তাঁরা সভা-সমিতির অভ্যন্তরে বর্তমান পরিবর্তিত জমানার পুনঃপরিবর্তন প্রত্যাশায় কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম সহ অন্যান্য সমস্ত বামশক্তির সম্মিলিত জোটের মধ্যে ইতিহাসের নির্দেশ শোনাতে তৎপর হয়ে ওঠেন! এঁরা সকলেই বুদ্ধিমান। কিন্তু এঁরা বিস্মৃত হন যে এই ধরনের বুদ্ধিমানদের ইতিহাস কোনোদিন রেওয়াত করেনি।

এতৎসত্ত্বেও এই অন্ধকারতলার নৈঃশব্দ্য, বিবেকহীনতা এবং অবনতচিত্ততার দেওয়ালের বাইরে থেকে ভেসে আসে বব ডিলানের কণ্ঠস্বর:

বাইরে লড়াই
গর্জন এখন বাড়তে বাড়তে শেলতীব্র
সজোরে ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে উঠবে
তোমার জানলা।
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে সমস্ত প্রাচীর।
কারণ সময় এখন বদলায় নিজেকে।

এই চলতি স্রোতে গা-ভাসানোর বিপ্রতীপে সাঁতার কেটে নিজেদের বদলাবার প্রক্রিয়ায় কিন্তু অনেকেই যুক্ত আছেন, তাঁদের সংখ্যাল্পতা আর যাই হোক রক্তাল্পতায় ভোগে না।

(৬)

আঁদ্রে বেতিলে তাঁর 'ইডিয়োলজিস অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল্‌স' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে বুদ্ধিজীবীদের মনে এই ধারণা প্রোথিত হয়ে আছে যে বর্তমান পরিব্যবস্থা বদলাতে হবে আর এজন্যে ক্ষমতাসীন শাসকদের প্রতিবর্তে দাঁড়িয়েই এই কাজ তাঁদেরই সমাধা করতে হবে। —স্পষ্টতই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতি-সচেতন এমন তথ্যই এখানে প্রতিষ্ঠা পায়। রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই ভূমিকায় কীভাবে বুদ্ধিজীবীরা অবতীর্ণ হবেন এবং কে ও কারা তাঁদের শক্তি যোগাবেন, এবিষয়ে বেতিলের ব্যাখ্যা পাইনি। তিনি এই বিষয়টিকে একটি প্রসারিত ক্ষেত্র ধরে নিয়ে মতাদর্শগত সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন।

বেতিলে বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক অবস্থান ঠিক কী তা স্পষ্ট করেন নি। তিনি অবশ্য পোলিশ সমাজতাত্ত্বিক ভেভোলস্কির বক্তব্যের সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন, মার্কসবাদের বুদ্ধিজীবীদের 'শ্রেণী' হিসেবে নয় একটি 'বর্গ' হিসেবে দেখা হয়েছে। আবার অন্যত্র তিনি কার্ল ম্যানহাইমকে উদ্ধৃত করে লিখছেন, বুদ্ধিজীবীরা আসলে সামাজিকভাবে অসম্পৃক্ত। তাহলে তাঁর বক্তব্য ঠিক কী তা বোঝা দুষ্কর। তবে একথা ঠিক, বুদ্ধিজীবীরা যেহেতু মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাই সামাজিক আন্দোলনের উত্তাপ তাঁদের স্পর্শ করে। তাঁরা অনেক সময় এতে প্রতিক্রিয়াও জানান, কখনো অতি উৎসাহের বশে পথেও নামেন, তারপর অনেক হিসেবের পর আবার গৃহকোণের নিভৃতে আশ্রয় নেন। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। তাঁরা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে অভিযোজিত হয়ে সমাজবিপ্লবীর দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু হিসেবিদের তুলনায় এঁরা একান্তই সংখ্যালঘু।

কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস এমন একটা সমাজের প্রত্যাশা করতেন যেখানে আমি আমার পছন্দমতো আজ একরকম কাজ করতে পারবো, আগামিকাল অন্যরকম। আমি সকালে শিকার করতে বেরোতে পারবো, বিকেলে মাছ ধরতে পারবো, সন্ধ্যায় পশুদের নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবো, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর প্রাণ খুলে আলোচনা করতে পারবো। আমার এমন একটা স্বাধীন মন থাকবে যার ফলে আমি শিকারি, জেলে, মেষপালক কিম্বা আলোচক-সমালোচকের কাজ নির্দিষ্টভাবে বেছে নিতে পারবো। পাবলো নেরুদাও অনেকটা এই ধরনের কথা বলেছিলেন যেখানে এই স্বপ্নপূরণের জন্য আমি থেকে আমরা হওয়ার প্রক্রিয়ায় গণমানুষের মিছিলে সামিল হওয়ার কথা বাণী অনুরণিত হয়েছিল।

মার্কস তো মানবের সামাজিকীকরণ আর একই সঙ্গে সমাজের মানবিকীকরণের কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ সমাজ এবং মানবতার

মধ্যে একটা যোগসূত্রের কথা বলতে চেয়েছিলেন। এখানে বুদ্ধিচর্চার পরিক্ষেত্রে সৃজনশীল স্বাধীন ভাবনার পরিসর নির্মিত হয়। কিন্তু পার্টি নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীন চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রভূমি থেকে নির্বাসিত হন। তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, পার্টির প্রতি প্রশ্নাতীত অনুরক্তি অবমূল্যায়নের শিকার হয়। সমাজবিপ্লবে তাঁরা তাঁদের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত সৃজনশীল ভাবনার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হন। হৃদয়ের ওপর মস্তিষ্কের শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাও জে দং বলেছিলেন : ''আরও কত বছর গেলে পার্টির বাঁধা বুলি ও তার শিরঃপীড়া উদ্রেকের দাপট থেকে আমরা রেহাই পাবো?'' চীন বিপ্লবের পর মাত্র ছ'বছরের মাথায় স্বয়ং মাও-কেই এই উচ্চারণ করতে হয়েছিল। মার্কসবাদ একটা সৃজনশীল দর্শন, এখানে কোনও গোঁড়ামির স্থান নেই। অথচ গোঁড়ামি ও বাঁধা-বুলি এক যৌথবাহিনীর মতো পার্টির অনুগত বুদ্ধিজীবীদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। পার্টি নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতায় অনেক সময়ই পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তবু পার্টি এ থেকে খুব একটা শিক্ষা নিয়েছে এমনটি মনে হয় না। মাও বলেছিলেন যে বুর্জোয়া শিবির পার্টি বুদ্ধিজীবীদের 'টেনে নেওয়ার ব্যাপারে' আমাদের সঙ্গে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এই প্রতিযোগিতা তো আজও বর্তমান, পার্টি সেক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে? বরং পার্টিনেতৃত্বের একটা অংশ তাঁদের গোঁড়ামি এবং বাঁধা-বুলি আউড়ে কূপমণ্ডুকতার সপক্ষতা করে থাকেন। শুধুমাত্র পার্টি বুদ্ধিজীবী নয়, 'পার্টিবর্হিভূত বুদ্ধিজীবীদের' যে অংশ আমাদের প্রতি 'সহানুভূতিসম্পন্ন' তাঁদের সঙ্গে আমাদের সজীব সম্পর্ক স্থাপন করা অবশ্যকর্তব্য বলেও মাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা মাও মনে করতেন যে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে সঠিক নীতি নির্ধারণ বিপ্লবের জয়যুক্ত হওয়ার অন্যতম শর্ত। কিন্তু পার্টির স্বঘোষিত এবং সর্বজ্ঞ নেতৃবর্গ এই বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেন, এমন নজির সুদুর্লভ।*

এখানে দেখা যাচ্ছে মাও বিপ্লবে জয়যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যথাযথ গুরুত্বদানের কথা বলেছেন, অর্থাৎ বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার কথা এখানে স্বীকৃত। লেনিনও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ সচেতন থেকেও বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন সমাজবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে। তিনি জোর দিয়েই বলেছিলেন, কোনোরকম সামাজিক ক্ষেত্রেই জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ব্যতিরেকে বুদ্ধিজীবীরা কখনও তাঁদের গুরুত্ব সপ্রমাণ করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও পারবেন না। বুদ্ধিজীবীদের নেতিবাচক প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও তিনি সংগঠনের প্রতি দশজনে আটজন শ্রমিকের সঙ্গে দুজন বুদ্ধিজীবীকে রাখার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বিষয়টি লক্ষণীয়।

(৭)

বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত এবং মার্কসবাদ' শীর্ষক আলোচনায় লিখেছেন যে ''আজকের বেসুর বেতাল বেআব্রু জীবন'' যতখানিই ''আপাতবিসদৃশ'' এবং ''উৎকট'' হোক না কেন তারও একটা 'আন্তরমিল' আছে যা কিনা খুঁজে বের করার দায়িত্ব 'বুদ্ধিমান মানুষের' অর্থাৎ 'বুদ্ধিজীবীদের'। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বিনয় ঘোষ বুদ্ধিজীবীদের 'বুদ্ধিমান' মানুষ হিসেবে গণ্য করেছেন। যারা যত বুদ্ধিমান, তারা তত হিসেবি। যারা যত হিসেবি তারা তত সুবিধালিপ্সু। যারা যত সুবিধালিপ্সু তারা তত দ্বিধাগ্রস্ত। পাশের বাড়ি আগুন লাগলে এঁরা প্রথমত ভাবেন আমার ঘরে তো আর লাগেনি। কিম্বা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন এই আগুন কোনক্রমে তাঁর বাড়িতে লাগতে পারে কিনা। এইরকম হাজার গন্ডা প্রশ্নোত্তর চর্চার পর যখন তিনি ঘর থেকে বাইরে আসেন, তখন সব শেষ, সেই বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, কেউ হয়ত পুড়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার তিনি ভাবতে থাকেন সব যখন মিটেই গিয়েছে তখন আর আমার গিয়ে কী লাভ! তিনি আবার নিজের ঘরে ফিরে যান। এই চারিত্র্যের অর্গল ভেঙে অনেক সময় এই মানুষটিই আবার বেরিয়ে আসেন এবং এক অসাধারণ সামাজিক ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিনয় ঘোষ এই আলোচনা-নিবন্ধে অন্যত্র লিখেছেন যে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বুদ্ধিজীবীরা চিরকালই মূলত শাসকশ্রেণীর পারিষদের ভূমিকা পালন করেছেন। এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। কিন্তু ব্যতিক্রমও তো আছে।

জর্মনিতে নাৎসি শক্তির আগ্রাসনের বিপ্রতীপে নিজেদের ভিন্ন অবস্থানের দরুন ব্রেখট, ব্রুকনার, উলফ প্রমুখ সাহিত্যিককে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময়েও ব্রেখটকে শাসকশ্রেণীর নিকট নিজের চিন্তাচর্চার ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। পল রোবসনকেও আন-আমেরিকান অ্যাকটিভিটিজ কমিটির সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তিনি তো সেখানে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর বাবা একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং যেহেতু তাঁর স্বজাতীয়রা এই দেশ গড়বার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাই তিনি কোনও ফ্যাসিবাদীর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দেশেই থাকবেন।

---

* পার্টিনেতৃত্বের উদ্দেশ্য লেনিনও একসময় বলেছিলেন: ''অর্জিত সমস্ত জ্ঞান যদি চেতনার মধ্যে ঢেলে সাজা না হয়, তাহলে কমিউনিজম হয়ে উঠবে একটা ফাঁকা কথা, একটা সাইনবোর্ড, আর কমিউনিস্ট হয়ে দাঁড়াবে নিতান্ত এক বাক্যবাগীশ।'' লেনিন মনে করতেন, 'পল্লবগ্রাহিতা' মারাত্মক ক্ষতিকর। আমি কম জানি, খুবই কম জানি— একথা জানা থাকলে আরও জানার আগ্রহ তৈরি হয়, কিন্তু কেউ যদি মনে করে সে 'কমিউনিস্ট' তাই তাঁর আর নতুন করে কিছু জানার দরকার নেই, তাহলে তা র পরিণতি হয় মারাত্মক।

''ক্রীতদাস পোষার দল, আমাদের উৎপীড়ক ও হত্যাকারী'' বলায় ডেভিড ওআকার তো গুম-খুন হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা তো আপস করেন নি। এঁরা তো আত্মস্বার্থমগ্নতায় সুখী গৃহকোণে আশ্রয় নেননি। এঁরা তো এঁদের সর্বশক্তি দিয়ে শাসক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কেননা এঁরা নিশ্চিতভাবেই জানতেন শাসক সন্ত্রাসের মুখে নিরপেক্ষতা তথা রাজহংসের মতো 'পালক না-ভিজিয়ে বিকল্প পন্থা' গ্রহণের অর্থ তো শাসকশ্রেণীর সঙ্গে একটা রফা করে নেওয়া। এঁরা কেউ সেই পথে পা বাড়ান নি। আমাদের দেশে এই ধরনের নজির গড়ে গিয়েছেন সরোজ দত্ত, দ্রোণাচার্য ঘোষ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, স্মরণ চট্টোপাধ্যায়, সুব্বারাও পানিগ্রাহী, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি সহ অসংখ্য মানুষ। গণমুক্তির স্বপ্ন বুকে নিয়ে আজও আমাদের দেশে চরম দারিদ্র্য বরণ করে আপসহীনতায় বেঁচে আছেন অনেক 'বুদ্ধিমান' মানুষ তথা বুদ্ধিজীবী। একটুখানি আপস করলেই নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের চাবিকাঠি হাতের ভেতরে এসে যেতে পারে জানা সত্ত্বেও সেই প্রলোভন দূরে ঠেলে ফেলে অতিকষ্টের জীবন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন এমন অনেক 'বুদ্ধিমান' মানুষ তথা বুদ্ধিজীবী তো আমাদের আশপাশেই আছেন। এইসব 'বুদ্ধিমান' বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বুদ্ধিকে মগজ বিক্রির কাজে লাগান না, মগজকে শানিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

(৮)

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারে খাদ্যআন্দোলনের প্রথম শহিদ হন ষোলো বছরের এক কিশোরী। পুলিশের গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। লাল হয়ে গিয়েছিল 'স্বাধীন' ভারতের মাটি। স্বাধীন ভারতে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিধানসভায় ক্ষোভচঞ্চল পরিস্থিতিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়।* ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য আন্দোলনে শহিদ হয়েছিলেন আশিজন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের বসিরহাটে কিশোর নুরুল ইসলাম তার রক্ত দিয়ে এক নতুন আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিল। এইসব ঘটনাবলী সমসময়ে সুতীব্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সময়কে উত্তাল করে তুলেছিল। এইসব বিবেকতাড়িত এবং উত্তাপ-সঞ্চারিত সময়ে স্বকালের তড়িদাহত বুদ্ধিজীবীরা স্থির-নির্বাক থাকতে পারেননি। আন্দোলনের তীব্রতা, জনস্রোতের প্রাবল্য এই সময়ের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের চেতনাকে ধূসর, নির্লিপ্ত এবং নির্বিবেক আত্মকেন্দ্রিকতার নিগড়ে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। সামাজিক জীব হিসেবে এইসব বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলনরত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিগত শতকের সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কালো দিনগুলিতে যখন পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই বিবেক বন্ধক রেখে নিজে বেঁচে থাকার সঙ্গে পিতৃনামের সম্পর্ক রক্ষার চিন্তাচর্চায় সব্যস্ত থেকেছেন সেই সময় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অসম সাহসে মাথা উঁচু করে পথে নেমেছিলেন, প্রতিবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। সরকারি শ্বেতসন্ত্রাসের রক্তচক্ষুর সামনে প্রতিস্পর্ধায় কবিতার অমোঘ আয়ুধ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ পুলিশ-মিলিটারির যৌথ বেষ্টনীর মধ্যে অভিমন্যুর মতো লড়াই করতে করতে শহিদ হন কবি আশু মজুমদার। সেদিন সেই ঘটনা সংঘটনের সময় যাদবপুরেই ছিলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবি বীরেন্দ্র এবং আরএসপি নেতা বামাচরণ চক্রবর্তীর চোখের সামনেই গুলিবিদ্ধ আশুকে ভ্যানে তুলেছিল পুলিশের বীরপুঙ্গবরা। সেদিন রক্তাক্ত আশুর সঙ্গে পুলিশ কবি বীরেন্দ্র এবং বামাচরণবাবুকেও থানায় নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছিল। তার চোখের সামনে এক তরুণ নকশালপন্থী কবিকে এভাবে হত্যা করার পুলিশি অপকর্মকে কবি বীরেন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। এর মাস পাঁচেকের মাথায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট রাতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে কবি সরোজ দত্তকে তুলে নিয়ে এসে পুলিশ ভোরবেলায় তাকে গুলি করে হত্যা করে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে, যাতে করে তাঁকে আ র সনাক্ত করা না যায়। এই মর্মান্তিক সংবাদে মর্মযন্ত্রণা অনুভব করেন কবি বীরেন্দ্র। পুলিশ সরোজ দত্তকে খুন করে প্রচার করে দেয় তিনি নিখোঁজ। কবি বীরেন্দ্র এই ঘটনার প্রতিবাদে 'বিচার' শীর্ষক একচি কবিতা লিখেছিলেন, যা অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয়েছিল *দর্পণ* পত্রিকায়। কবির এই কবিতাটি প্রকাশের পর পুলিশ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কবির গতিবিধির ওপর পুলিশের নজরদারি শুরু হয়। কবি বীরেন্দ্র ভয় পাননি। তিনি তার অনমনীয় প্রতিবাদের ঝান্ডা তুলে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, জেলে জেলে গিয়ে নকশালপন্থী সহ সরকারি কালাকানুনে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং পরে বন্দিমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এক উজ্জ্বল ইতিহাসের নির্মিতি দিয়েছিলেন।

সাতাত্তরে কংগ্রেসি জমানার অবসানকল্পে বুদ্ধিজীবীরা যে সদর্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বামফ্রন্ট সরকারের প্রবর্তনা ও তার শাসকশ্রেণীর অঙ্গীভূত হয়ে পড়ার পর্যায়ে সরকার বিরোধিতার ক্ষেত্রে বামমনস্ক বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধাচিত্ততা কাটতে অনেক সময় লেগেছিল। শেষপর্যন্ত সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়, নেতাই-এ 'বাম' সরকারের রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় হার্মাদি সন্ত্রাসের ন্যাক্কারজনক ঘটনাবলী স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। এখানে আবার অবশ্য নেতিবাচক ঘটনাও যথেষ্ট ঘটেছে। তীব্র সিপিএম বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল তৃণমূলের মধ্যে সদর্থকতার সন্ধান

*১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের অন্তর্বর্তী সময়ে স্বদেশি কংগ্রেসি শাসকদের জমানায় ১৯৮২ বার গুলিচালনার ঘটনা ঘটে। তার ফলে নিহত হন ৩৭৮৪ জন, আহত হন ১০০০০, আর কারারুদ্ধ হন ৫০০০০ মানুষ (দ্র. মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। পৃ.১৭৮)

পেয়ে বামপন্থা তথা কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছেন। এঁদের অনেকের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পরিবর্তনের সময়কালের পালিত ভূমিকায় মসীলিপ্ত হচ্ছে। প্রখ্যাত বামপন্থী কবি সমীর রায়ের একটি কবিতার গীতিরূপ দিয়ে প্রতুল মুখোপাধ্যায় একসময় কলম না-বেচার যে বাণী মিটিং মিছিলে শুনিয়ে আন্দোলনকারীদের উদ্দীপিত করতেন, এখন তাঁর তৃণমূলাপেক্ষিতা তাঁর অনুগামীদেরও বিস্ময়াহত করেছে। পশ্চিমবাংলায় বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারও পূর্বতন সরকারের মতোই বুদ্ধিজীবীদের স্বস্বার্থে ব্যবহারের যে প্রক্রিয়া* গ্রহণ করেছেন তাতে এককালের সিপিএম রাজনীতির অনুগামীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মতোই একদা নকশালপন্থী কিম্বা নকশাল-অনুরাগী সমর্থকদের অনেকেই সামিল হয়েছেন! কিন্তু আদর্শ বজায় রেখে, আপসহীন অবস্থান বজায় রেখে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হওয়ার মতো বুদ্ধিজীবীরা আজও আছেন। নীরবে সশ্রদ্ধায় এঁদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন অনেক নতুন মুখ, আগামীদিনের সূর্য।

সারা দেশ জুড়ে দলিত হত্যা, মুসলিম হত্যা, মাওবাদী দমনের নামে নিরীহ আদিবাসী হত্যা, বস্তারে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ঘোষণা, গো-রক্ষার নামে আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ, কাশ্মীরে সেখানকার জনসাধারণের 'আজাদি'র সর্বজনগ্রাহ্য দাবির মোকাবিলায় ভারত সরকারের পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, মণিপুরে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উলঙ্গ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, আফস্পা, ইউএপিএ প্রমুখ কালাকানুন প্রত্যাহারের দাবিতে, পশ্চিমবাংলার জেলগুলিতে ছত্রধর মাহাতো, সুখশান্তি বাস্কে, শম্ভু সোরেন, সাগর মুর্মু সহ মাওবাদী নেতা রাজা সরখেল ও প্রসূন চ্যাটার্জীর মতো যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত নকশালপন্থী সহ সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সংঘটিত আন্দোলনে এইসব বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করে তাঁদের সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখতে এগিয়ে আসছেন। এঁরা সংখ্যায় হয়তো বেশি নন, তবে তাঁরা শপথদীপ্ত। সংখ্যাগুরু দিয়ে ইতিহাস রচিত হয় না। অল্পসংখ্যাই একদিন সমগ্রের দাবিদার হয়ে ওঠে। কবি পাবলো নেরুদার সেই আহ্বান ইতিহাসের কণ্ঠস্বরে ভর করে আজ যেন বেজে উঠছে :

এসো, আমার শিরা উপশিরার মধ্যে চলে এসো,
এসো, আমার মুখের অভ্যন্তরে
আমার কণ্ঠে ভর করে কথা বলো
আর আমার রক্তের মধ্যে দিয়ে
কল্লোলিনী নদী হয়ে যাও। ❐

সহায়ক গ্রন্থ

১. লেনিন : *অন দ্য ইন্টেলিজেনশিয়া*, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৮৩
২. আঁদ্রে বেতিলে : *ইডিয়োলজিস অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল্‌স*, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৮০
৩. আলভিন ডব্লু গোল্ডনার : *প্রোলোগ টু আ থিয়োরি অব রেভুল্যুশানারি ইন্টেলেকচুয়ালস* (টেলোজ ২৬, উইন্টার ১৯৭৫-৭৬)
৪. মাও জে দং : *প্রব্লেমস অব আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার*, পিপলস পাবলিশিং হাউস, বোম্বে, ১৯৫০
৫. মাও জে দং : শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৮
৬. কার্ল ম্যানহাইম : *সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০
৭. পল রোবসন : *যে পথে দাঁড়িয়ে*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৮
৮. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *রাজসভার কবি ও কাব্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬
৯. বিনয় ঘোষ : *মেট্রোপলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৯৮৪
১০. আহমদ রফিক : *বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি*, মুক্তধারা, বাংলাদেশ, ১৯৮৬
১১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : *সোনার আলপনা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮০
১২. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : *বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৮৩
১৩. *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৪
১৪. *রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭
১৫. অশোক চট্টোপাধ্যায় : *সামাজিক আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবী*, চর্যা প্রকাশনী, কাঁচড়াপাড়া, ২০১৩
১৬. অশোক চট্টোপাধ্যায় : 'রামপ্রসাদ সেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নবাব সিরাউদ্দৌল্লা ইত্যাদি', *উবুদশ*, জানুয়ারি ২০১৩

* খুব অবাক লাগে, সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে দেখা যাবে নবীন প্রজন্মের অনেকের সঙ্গে প্রবীণ প্রজন্মের অনেক প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী লেখকরা ফেসবুকে তাঁদের বাড়ির প্রিয়জনদের ছবি পোস্ট করছেন, কেউ তাঁর স্মৃতিকথা বিবৃত করছেন, কেউ আনন্দ-উৎসবের ছবি প্রদর্শনের আহ্লাদে মেতে উঠছেন, আবার কেউ সময়-অচিহ্নিত কবিতা বা কবিতাংশ পোস্ট করে তৃপ্ত হচ্ছেন। তাঁদের কিছু স্তাবকবৃন্দ আছেন যারা আহা-উহু করছেন। স্বদেশের, স্বকালের সংঘটিত নির্মম ঘটনাবলী, হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, আর্ত মানুষের কান্না এঁদের বিবেকবোধে এতটুকু দাগ কাটতে পারে না। এঁদের এই আপাত নিরীহ নিরপেক্ষ অবস্থান যে প্রকারান্তরে শাসকশ্রেণীর কায়েমি স্বার্থের পরিপোষক, এঁরা কি সে বিষয়ে সচেতন নন? নাকি এটাই তাঁদের অঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান? সাংস্কৃতিক অবক্ষয় যে পশ্চিমবাংলার সমাজ জীবনে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, এগুলো তার অন্যতম প্রমাণ। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রামের দেশ ধর্মশালা, শ্যামের লঙ্গরখানা / যদুর দেশের পশুপক্ষীর কথা বলতে মানা।
মধুর দেশ মধুর নয়, তিনিই শুধু গোলাম / যত দেখলাম দেশবিদেশ, ততই মুগ্ধ হলাম।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সোভিয়েত সাহিত্য— একটি অন্য সংস্কৃতি গড়ার পরীক্ষা

সমরেশ মিত্র

সংস্কৃতি মানুষের প্রাচীনতম অভিব্যক্তির অন্যতম। লিপির যুগের আগে থেকেই মানুষের এই নন্দনতাত্ত্বিক প্রকাশের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ-বিবর্তনের ছাপ রয়েছে এই নান্দনিক প্রকাশের প্রতিটি মাধ্যমেই। তাই দেখা যায়, ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিচার করা হয় ঐতিহাসিক কালপর্বের প্রেক্ষিতে— রেনেসাঁসের সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য ইত্যাদি।

প্রাচ্যের দেশগুলিতেও তাই। এখানেও সাহিত্যকর্ম ঐতিহাসিক কাল-বিভাজনের প্রেক্ষিতেই চিহ্নিত হয়ে এসেছে। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ক্রমে সমকালীন সাহিত্যকর্ম পর্যন্ত ইতিহাসে তার নিজস্ব গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত। আমাদের উচিত সেই ধরনের বিতর্কে জোর দেওয়া, যেখানে কোন্ সমাজের, সমাজের কোন্ অংশের মানুষের কী ধরনের ছাপ সাহিত্যে থাকছে, থাকলে তা বাস্তব-সম্মত কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

যখন সংস্কৃতি চর্চার সমস্ত বিভাগে শিল্পী বিষয় নির্বাচনে প্রায় অবধারিত ভাবেই তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে রসদ সংগ্রহ করেন। যে অর্থনৈতিক-সামাজিক বর্গে শিল্পীর অবস্থান, শিল্পীর শিল্পকর্মে সেই বর্গের ধ্যানধারণা তাই সাধারণত শিল্পীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিল্পের বিভিন্ন উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারিত হয় শিল্পীর মতাদর্শ দিয়ে, যে মতাদর্শ শিল্পীর চৈতন্যে ধীরে ধীরে প্রোথিত হয়েছে সমাজের চলমান বাস্তব দিয়ে, যার চালিকা শক্তি সমাজে চলমান রাজনীতি-অর্থনীতি।

সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা তাই সমাজে চলমান রাজনৈতিক -অর্থনীতি দ্বারা জটিলভাবে 'নিয়ন্ত্রিত' একটি প্রক্রিয়া। সংস্কৃতি-বিচারধারার একটি বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি রয়েছে। আমরা এখানে সাম্য-ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক বিচারধারার কিছু মূলসূত্র প্রয়োগ করে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির কিছু ইতিবাচক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমাদের এই প্রচেষ্টার মূল দিশা হলো, বর্তমানের বিশ্বায়ন তথা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির জোয়ার যেভাবে মানুষের যাবতীয় নান্দনিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে সেই আগ্রাসন প্রতিহত করা যায়, সে সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেওয়া।

সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির কয়েকটি মূল সংকেত

পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি আসলে পুঁজিবাদকে একটি সুস্থির আর্থিক তন্ত্র হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার, সমাজে তার সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করার ও শক্তিশালী করার একটি কোমল হাতিয়ার। এই সংস্কৃতি সর্বতো উপায়ে আগ্রাসনের জয়গান করে এবং সমাজে অর্থনীতিক অবস্থানের ভিত্তিকে বর্গীকরণের দ্বারা নির্ণীত শ্রেণীর ধারণাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। এই সংস্কৃতি জাতি-বিদ্বেষ, বিভাজন এবং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির চমৎকার সূত্রায়ন করেছেন গোপাল হালদার :

> বিপুল তাহার বিজ্ঞান সাধনা। কিন্তু সেই বিজ্ঞান সেই বিদ্যা অধিকাংশই উৎসর্গীকৃত সামরিক উদ্দেশ্যে। অপ্রতিহত তাহার প্রচার ক্ষমতা; যুদ্ধের প্রচারে আণবিক ধ্বংস সম্পর্কে মানুষকে অজ্ঞ বা উদাসীন ও ভ্রান্ত রাখিতে তাহা প্রযুক্ত। শিল্পে সাহিত্যেও তাহাদের যে যুগ-যুগ আয়ত্ত কলানৈপুণ্য তাহাও ক্রমশঃ প্রযুক্ত হইতেছে রিরংসার চিত্রণে, অপরাধ প্রবণ মানসিকতার ব্যাখ্যানে, পাশবিকতাকে পৌরুষ বলিয়া প্রশংসায়, মানবতার প্রতি (কোথাও রাষ্ট্রীয় পাপবোধের নামে কোথাও জৈব বিজ্ঞানের নামে) অবিশ্বাস সৃষ্টিতে। ইহাই ক্ষয়িষ্ণু ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতির সর্বাধুনিক রূপ।

জার্মান ইডিওলজি গ্রন্থে মার্কস-এঙ্গেলস মানবজাতির দৈহিক বিবর্তনের পাশাপাশি তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আর্থিক জীবনের আন্তঃসম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হলো যে প্রকৃতিতে মানুষ (বা মানবজাতি বলাই অধিকতর সঠিক হবে) অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে নিজেদের পার্থক্য সূচিত করে কেবল তখনই, যখন তারা তাদের (প্রজাতি হিসেবে) বেঁচে থাকার জন্য উপকরণ 'উৎপাদন' করতে শুরু করে। এটা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র হাত এবং মস্তিষ্কের সমন্বিত ব্যবহারের দ্বারাই, যা তাকে অন্যান্য প্রাণীকুলের চেয়ে আলাদা করেছিল (শারীরস্থানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য জীব-প্রজাতির চেয়ে মানুষের হাত এবং বিশেষত আঙুলের গঠন আলাদা, আর মস্তিষ্ক অনেক বড়ো ও জটিল)। মানবজাতি যখন তার বেঁচে থাকার উপকরণ (খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি) উৎপাদনে সক্ষম হলো তখনই তার বৌদ্ধিক, নান্দনিক এবং বস্তুগত জগৎ গড়া শুরু হলো।

সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা নান্দনিক ক্রিয়াকলাপ, যে নামেই একে অভিহিত করা হোক না কেন, তা আসলে সমাজের এক সামগ্রিক রূপেরই পরিচায়ক— যা উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের অক্ষ-র মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্ব উৎক্রমণের ফলে সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস। এই ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, অন্য উপাদান ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক।

ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সামাজিক আর্থিক বৈষম্যকে ব্যক্তির

দুর্ভাগ্য বা প্রতিভাবান ব্যক্তির সফলতার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে একটি গভীর নৈতিক প্রশ্নকে সর্বদাই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। এই মত অনুসারে, মানব জাতির ইতিহাসে সবল সর্বদা দুর্বলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, অতএব এটাই বুঝি মানুষের সামাজিক সংগঠনের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। যা ঘটে আসছে, তা ঘটা কতটা নৈতিক সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা এবং তাকে পরিবর্তন করে অধিকতর নৈতিক সামাজিক সংগঠন নির্মাণ একটি গভীর সাংস্কৃতিক প্রশ্ন, যে প্রশ্নটি তুলেছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা। বাস্তবেও এমন সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজ এক সময়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল। বাস্তবের সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অনুশীলন কেমন ছিলো, তা বিশ্লেষণ করলে আমরা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কীভাবে ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিপরীতে অন্য এক জীবনের, অন্য ধরনের নৈতিকতার কথা বলতে পারে, সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। এই নিবন্ধে সেই চেষ্টাই করা হবে।

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির রূপের অনুসন্ধান

কী কী সংকেতকে আমরা বিচারের জন্য বেছে নেব, তার একটি রূপরেখা হাজির করা জরুরি। এই সংকেতবাহী লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ নয়, কেবলমাত্র নিবন্ধের পরিসর সংক্ষিপ্ত করার জন্যই এগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চা শ্রেণীর অস্তিত্বকে, শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্বকে এবং সর্বোপরি উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের নিরসনের মাধ্যমেই যে সমাজ একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে উপনীত হয়, এই সত্যটিকে অস্বীকার করে। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ক্রিয়াকলাপের মূল অক্ষ এই সত্যের প্রকাশ্য স্বীকৃতি। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি তাই প্রকাশ্যেই শ্রেণী- বৈষম্যের বিপক্ষে এবং সমাজে যে শ্রেণীটি শেষ পর্যন্ত চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার কথা বলে।

যে কোনও বৌদ্ধিক প্রশ্ন সমাধানের সর্বজনগ্রাহ্য এবং স্বীকৃত রূপ হলো অবাধ, স্বাধীন এবং আধিপত্যহীন প্রতর্ক। প্রতর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত যুক্তি-ভিত্তিক ও বস্তুবাদী ভাবনা অনুসারী। সংস্কৃতির চর্চার ভিত্তি রচিত হওয়া উচিত শোষণহীন সমাজের পক্ষে— একমাত্র তখনই যে মানুষের চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পথ প্রশস্ত হবে, এই ধারণা নিয়ে চলা। ইতিহাসের অবসান নয়— মানুষের সত্যিকারের ইতিহাসের তা হবে সূচনাবিন্দু। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির পক্ষের অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী ধনিকতন্ত্রের বীভৎসতা দেখে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সঠিক সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন। সেই সমস্ত দৃষ্টিকোণ, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্নির্মাণ করাও জরুরি। এবং শেষ কথা হলো অবাধ গণতন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা।

পুনর্নির্মাণের কয়েকটি দিক

সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোর্কি বলেছেন :

> আমাদের সোভিয়েত সাহিত্য, যেখানে তার সামগ্রিক বৈচিত্র্যময় প্রতিভাদীপ্ত ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী নতুন লেখকদের আগমন ঘটছে, তাকে সুসংবদ্ধ সংহত একটি মাত্র সংগঠনে পরিণত করতে হবে। এটাই হবে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির দক্ষ হাতিয়ার।

বাস্তবের সমাজতন্ত্র গঠনের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা-সম্পৃক্ত নতুন মানুষ নির্মাণের কাজ উপেক্ষা করলে সমাজতন্ত্র গঠন প্রক্রিয়া যে অধরা থাকে, বাস্তবের সমাজতন্ত্র নির্মাণের রূপকারবৃন্দ সে বিষয়ে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। গোর্কি লিখেছিলেন :

> নতুন মানুষের লক্ষ্য হলো শ্রমজীবীদের প্রাচীন কুসংস্কার, যেগুলির মধ্যে পড়ে জাতিগত দিক, শ্রেণী, ধর্ম থেকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন সমাজের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা— এমন এক সমাজ গড়া যেখানে প্রত্যেকে তাদের সাধ্যমতো শ্রম দেবে এবং প্রয়োজনমতো বাঁচার সামগ্রী তাকে এই নতুন সমাজ দেবে।

গোর্কি চেয়েছিলেন, শিল্পী-সাহিত্যিকদের নতুন সংগঠনটি সোভিয়েত সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে, সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য সচেষ্ট হবে। গোর্কির মত ছিলো :

> সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সংগঠনে জড়ো করাই এই সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো না— বরং এই পেশাগত ঐক্য তাদের সম্মিলিত শক্তি সম্পর্কে সচেতন করবে এটাই ছিলো উদ্দেশ্য। সামগ্রিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের বৈচিত্র্যময় প্রবণতাগুলি, তাদের সৃজনক্ষমতা, দিশা এবং মসৃণভাবে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়গুলি প্রাঞ্জল করবে— এটাই ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই সংগঠন গড়ার পেছনে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতায় লাগাম পরানোর কোনো বাসনা ছিলো না, বরং আরও বিস্তৃত অর্থে সেই সৃজনশীলতাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ায় একে নিয়োজিত করার কথা ভাবা হয়েছিলো।

ধনতন্ত্র যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলে, তার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে গোর্কির সুচিন্তিত মন্তব্য ছিলো :

> আমাদের শ্রমজীবী বীরবৃন্দ, যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে থেকে উঠে এসেছেন, তাঁদের ভেতর দিয়েই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হচ্ছে— এই স্বাতন্ত্র্য সম্মিলিত শ্রমের আবহাওয়া ছাড়া বিকশিত হতে পারে না। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো পুঁজিবাদের আওতায় যে বিকৃত স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হচ্ছে, তার থেকে শ্রমজীবী মানুষদের মুক্ত করা।[৫]

সমাজতান্ত্রিক মানুষ গঠন : শিশু ও কিশোর সাহিত্য

মৃত্যুর তিন বছর আগে গোর্কি একটি প্রবন্ধ লেখেন পার্টির পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া'-য়। শিশু সাহিত্য নিয়ে নিবেদিত সেই প্রবন্ধে তাঁর

মূল প্রতিপাদ্য ছিলো যে শিশু-কিশোর সাহিত্য তাদের মনে কৃষ্টি ও সাহিত্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগানোর পাশাপাশি তাদের শিল্প-সাহিত্য-কৃষ্টি বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলবে। অবশ্য শিশুসাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ না থাকে। তাতে যেন যথোচিত পরিমাণ মজা থাকে— তারা যেন হাস্যরসে পটু হয়ে ওঠে। শেষে গোর্কি মন্তব্য করেন :

> শিশু-কিশোররা যেন এই বাস্তবতায় শিক্ষিত হয় যে তাদের পিতা-মাতারা এক পুরনো বাস্তবতা ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন যাতে তাঁরা এই শিশু-কিশোরদের জন্য নতুন এক বাস্তবতা সৃষ্টি করতে পারেন।

পুরনো রুশ-রূপকথা কীভাবে উপস্থাপিত করা হবে, তাতে কল্প-বাস্তবতা কীভাবে স্থান পাবে, এই নিয়ে রাশিয়ায় বিরাট বিতর্ক হয়েছিলো। বস্তুত লেনিনের স্ত্রী ক্রুপ্‌স্কায়া রূপকথার সর্বতো বিরোধী ছিলেন।

১৯৩৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সেই দেশের প্রথম শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গোর্কি নির্দেশিত পথে এই প্রকাশনার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিলো ''big literature for the little ones''— ক্ষুদেদের জন্য বৃহৎ সাহিত্য। সে যুগের সোভিয়েত সাহিত্যের দিকপাল কবি সামুইল মারশাক এই প্রকাশনার মুখ্য সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি সেই সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের শিশুসাহিত্য নির্মাণে আহ্বান রাখেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন কোরনে চুকোভস্কি— যাঁকে সোভিয়েত জমানার শিশু সাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য কাব্যিক গল্প লেখা শুরু করেন এবং এই সমস্ত বই-এর মাধ্যমে তিনি শিশু-কিশোরদের কাছে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার খুলে দেন। বস্তুত এই সময়েই সোভিয়েত রাশিয়ায় জ্যাক লন্ডন সহ অন্যান্য বহু বিদেশি লেখকের বই অনূদিত হয়ে প্রচারিত হতে থাকে। সোভিয়েত জমানায় চুকোভস্কির বই বিক্রি হতো কোটির হিসেবে। মস্কোর প্রান্তে তাঁর বাড়িটিতে শিশুদের ভিড় লেগে থাকত, আর উঠতি শিশুসাহিত্যিকরা শিক্ষানবিস হিসেবে সেখানে নিয়মিত পাড়ি জমাতেন। শিশুশিক্ষা এবং শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর ধ্রুপদী পুস্তক 'দুই থেকে পাঁচ' আজও সারা পৃথিবীতে শিশুশিক্ষা সংগঠিত করার দিশারী।

'দাদুর দস্তানা', 'সোনালী খুর', 'চুক আর গেক' না পড়ে বড়ো হওয়া শিশু সোভিয়েত রাশিয়ায় কেন এ দেশের শিক্ষিত পরিবারগুলিতেও খুঁজে পাওয়া ভার। নিকোলাই নোসভ, ভিতালি বিয়াঙ্কা বা আর্কাদি গাইদার বা ভালেন্তিকা কাতায়েভ পড়েনি এবং উদ্বুদ্ধ হয়নি, এমন শিশু আমাদের শৈশবে আমাদের চারপাশে প্রায় বিরল ছিলো। শিশুশিক্ষা এবং শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সমাজের ভূমিকার কথা ধরে নিয়েই নতুন সোভিয়েত নাগরিকদের জন্য বাস্তবের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আরও কতকগুলি ব্যবস্থা নেয়, যেগুলিকে নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ার ইতিবাচক সাংগঠনিক প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি কারখানা, এমনকি দীর্ঘক্ষণের রেলযাত্রার জন্যও ক্রেশ-এর বন্দোবস্ত করা হয়। ফলে শিশুরা বোধের বয়েসে পৌঁছেই শিশুদের বিষয়ে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিষেবা বিষয়ে সচেতন হতে শুরু করে। ক্রেশ-এর সেবিকাদের জন্য পোস্টার ছাপানো হয় যাতে লেখা থাকে :

> বাচ্চারা যাতে বিপজ্জনক বস্তুকে খেলনা মনে করে ঘাঁটাঘাঁটি না করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন— বাচ্চার আনন্দ এবং দুঃখের শরিক হওয়ার চেষ্টা করুন— এটা হলে তবেই বাচ্চাটির যখন প্রয়োজন হবে তখন সে আপনার কাছে আসবে। ভূত-ভগবান-শয়তান, ইত্যাদি যা চোখে দেখা যায় না সেগুলি সম্পর্কে বাচ্চাদের গল্পের ছলেও বলবেন না।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের এই মেজাজ বদল ধনতান্ত্রিক সমাজেও আলোড়ন তোলে। ১৯৩২-এ একজন মার্কিন শিল্পী রাশিয়ার উদাহরণ টেনে বলেন যে ১৯২৫ সালে বোরিস এন্ডার বাচ্চাদের বই 'দুটি ট্রাম গাড়ি'-তে কেবলমাত্র কালো, ধূসর এবং লাল রং ব্যবহার করে এমন চমৎকার চিত্র তৈরি করেছেন যে তা শিশু সাহিত্যের চিত্রাঙ্কনে বিপ্লব এনেছে। ১৯৩৯-এ ব্রিটেনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নোয়েল ক্যারিংটন সোভিয়েত শিশু সাহিত্যের বিষয়, চরিত্র এবং চিত্রাঙ্কনে মুগ্ধ হয়ে প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন এবং পেলিক্যানকে সোভিয়েত আদলে শিশু সাহিত্য ছাপতে অনুপ্রাণিত করেন।

কিশোর সাহিত্যের মূল ঝোঁক ছিলো উদাহরণ দিয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করা। কমসোমল আন্দোলন তখন গোটা রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিপুল সংখ্যক কিশোর কিশোরী এই আন্দোলনের টানে আকৃষ্ট হচ্ছে। কমসোমলিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সোভিয়েত সমাজের বাস্তব উদাহরণ থেকে রচিত হচ্ছে আর্কাদি গাইদারের 'ইস্কুল', নিকোলাই অস্ত্রভস্কির 'ইস্পাত', ব্রুনো ইয়াসেনস্কির 'গোত্রান্তর' আরও কত বই। 'তিমুর ও তার দলবল' পড়ে বড় হয়েছে এমন কিশোর '৩০-৪০ দশকের রাশিয়া ছাড়াও সারা পৃথিবীতে অন্তত ১ কোটির খোঁজ পাওয়া গেছে। বস্তুত কমসোমল আন্দোলন কতটা সফল হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যার খানিকটা বর্ণনা পাওয়া যায় আলেকজান্ডার ফাদেয়েভ রচিত 'তরুণ রক্ষী' নামক সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত উপন্যাসে। বলশেভিক-বিরোধী লেখক হ্যারিসন স্যালিসব্যুরি প্রায় ৯০০ অবরুদ্ধ থাকার পর অবরোধ-মুক্ত লেনিনগ্রাদে গিয়ে তাঁর বইয়ের রসদ সংগ্রহ করার সময় তিমুর-অনুপ্রাণিত কমসোমলিদের দেখা পান যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়েছে। শূন্য ডিগ্রীর চেয়েও ৫ ডিগ্রি কম তাপমাত্রায় যাতায়াতে ১১ কিমি পথ অতিক্রম করে, নিজেরা

অভুক্ত থেকে চলৎশক্তিহীন মানুষদের খাবার ও পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে।

বস্তুত সেই ১৯২০ সালেই বুখারিন তাঁর 'এবিসি অফ কমিউনিজম' বইতে এই নতুন মেজাজের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

> The Salvation of the young mind and freeing of it from noxious reactionary beliefs of their parents is one of the highest aims of the proletarian government.

সোভিয়েত বিপ্লবের পূর্বক্ষণে এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পী-সাহিত্যিকরা সৃজনশীলতার নানা নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। তখন সেই সমস্ত নিরীক্ষায় রাষ্ট্রের সশ্রদ্ধ প্রশ্রয় ছিলো। ১৯১৮ সালে, মায়কভস্কি ''শ্রমিকদের কাছে খোলা চিঠি''-তে লেখেন :

> কেউই জানে না ভবিষ্যতে কেমন প্রখর সূর্যালোক আমাদের জীবনকে সূর্যকরোজ্জ্বল করে তুলবে। এমনও হতে পারে শিল্পী-সাহিত্যিকরা শহরগুলোর ধূসর ধূলিকণাগুলিকে শত রঙে রঞ্জিত রামধনু করে তুলবে। আগ্নেয়গিরির ছেদহীন গম্ভীর সুরলহরীকে বাঁশরীর সুরে পর্যবসিত করে পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনি তুলবে। সাগরের ঢেউ স্বরলিপির জালে ধরা দিয়ে তরঙ্গের আকারে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়বে।

একটি মাত্র প্রকাশনালয়, একটি মাত্র শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগঠন নির্মাণের আগের যুগের সোভিয়েত সাহিত্য নতুন মানুষ নির্মাণের কাজে উদাহরণ সহ আরও নানান পদ্ধতি ব্যবহার করা শুরু করেছিলো, যেগুলি নতুন সংগঠনও বাতিল করে দেয়নি। এমন নয় যে তাঁরা পুরোনো যাবতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বর্জনীয় বলে দেগে দিয়ে কেবলমাত্র ''পবিত্র সর্বহারা সংস্কৃতি''-র জন্ম দেবেন বলে ধুয়ো তুলেছিলেন, বা সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছে বাড়তি অগ্রাধিকার পেয়েছিলেন। মায়কভস্কি স্বয়ং তথাকথিত ''প্রোলেকাল্ট''-এর বিরোধিতা করে কবিতা লিখেছেন। ১৯৩০-এর পর ধারাবাহিকভাবে ''রেভলিউশনারি এ্যাসোসিয়েসন অফ প্রোলেতারিয়ান রাইটার্স''-কে সমালোচনা করা হতে থাকে এবং তা এক সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

'সোভিয়েত রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন', যেটা গোর্কি তৈরি করেছিলেন, সেটি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আত্তীকরণের পথ নেয়। ১৯২৩-এ প্রকাশিত দিমিতি ফুরমানভ রচিত ''চাপায়েভ'' উপন্যাসকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়— বইটির বিষয়বস্তু ছিলো কেমনভাবে একজন ভদ্র, ধৈর্যশীল বলশেভিক কমিশনার একজন বিশৃঙ্খল গৃহযুদ্ধের নায়ককে শৃঙ্খলাপরায়ণ জনগণের সৈনিক স্তরে উন্নীত করলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন শিল্পায়ন এবং তার অভিঘাতে কেমনভাবে সমাজতান্ত্রিক মানবীয় উন্মেষ ঘটছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ সমন্বিত উপন্যাস, ফেদর গ্লাদকভ রচিত ''সিমেন্ট'' (১৯২৫) পুস্তকটি সোভিয়েত কর্ণধারদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তলস্তয় ধাঁচের উপন্যাস যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সর্বদাই বিপরীতে অবস্থান করে এমন নয়— সেই বার্তাই পাওয়া যায় রাশিয়ার পূর্বপ্রান্তের গভীরে চলমান লালরক্ষী গেরিলাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে আলেকজান্দার ফাদেয়েভ রচিত ''ছত্রভঙ্গ'' উপন্যাসে (১৯২৭)। এছাড়া শলোকভের 'ধীর প্রবাহিনী ডন' বা 'কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো' উপন্যাস দুটিও বহুল চর্চিত এবং পঠিত।

গৃহযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ— এই বিস্তীর্ণ সময় জুড়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষের যে ধারণা গড়ে ওঠে এবং যা গল্প-উপন্যাসে ধীরে ধীরে স্থান করে নেয় তার নির্যাস খানিকটা এই রকম :

১) এই নতুন সমাজতান্ত্রিক মানব সমস্ত ধরনের বুর্জোয়া ধারণা বর্জিত হবে;

২) সমাজতান্ত্রিক এবং শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদী মূল্যবোধ সমৃদ্ধ হবে;

৩) এই নতুন মানুষ প্রশ্নহীনভাবে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করবে;

৪) সে কাজ করবে ব্যক্তিগত আনন্দের তাগিদে;

৫) সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় তার অগাধ আস্থা থাকবে।

এই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই চেরনাইকোভস্কির ''কী করতে হবে'' বা গোর্কির ''মা'' উপন্যাস প্রাঞ্জল করে উপস্থাপিত করেছিল।

বস্তুত, সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা যে মানুষের সৃজনশীল উদ্যোগের দ্বার খুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলো, তার একটি নিরপেক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি যে জারের সমগ্র সময় কালে মাত্র তিনজন রাশিয়ান নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, আর প্রায় ৭০ বছরের সোভিয়েত রাজত্বে প্রতি পাঁচ বছরে একজন করে রাশিয়ান কোন না কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পার্গামোন প্রেস, নিজেদের খরচে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান গবেষণার পত্রপত্রিকা-সমূহ মূল রাশিয়ান ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তৎসত্ত্বেও ২০০৮-২০১৩, এই সময়সীমায় দেখা যাচ্ছে যে খণ্ডিত রাশিয়ার ইউরোপ অংশে আবার পূর্বতন সোভিয়েত জমানার সাহিত্যের প্রতি, বিশেষত শিশু-কিশোর এবং উদ্বুদ্ধকারী সাহিত্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নিকোলাই নোসভ, আর্কাদি গাইদার প্রমুখের বই প্রায় এক কোটি কপি বিক্রি হয়েছে, যেমন বিক্রি হয়েছে বরিস পলেভয়-এর 'মানুষের মতো মানুষ', দিমিত্রি ফুরমানভের 'চাপায়েভ' বা নিকোলাই অস্ত্রভস্কির 'ইস্পাত'।

আজকের দিনে সোভিয়েত রাশিয়া সুদূর অতীতের এক দূর দ্বীপ। এশিয়া থেকে ইউরোপে বিস্তৃত যে ভূখণ্ডে প্রথম সমাজতন্ত্রের পতাকা উড়েছিলো, যে দেশের প্রলয় ঝঞ্ঝা বিপ্লবের রূপ নিয়ে পুরোনো পৃথিবীর জঞ্জাল দূর করতে উদ্যত হয়েছিলো, সেই দেশটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আপাতত বিলুপ্ত। দেশটির উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে মানবজাতির ইতিহাসের এক অপূর্ব অংশ, এক মতাদর্শ। আজ, সেই প্রথম বাস্তবের সমাজতান্ত্রিক দেশের পতনের পর মতাদর্শের খাতিরেই কিছু অপ্রিয় কথা ও কাহিনী আলোচনা করা জরুরি। জরুরি এই কারণে যে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজ যেন অতীত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে পরিহারযোগ্য বিকৃত অনুশীলন এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।

বাস্তবের সমাজতন্ত্রে সীমাবদ্ধতা

১৯৩৪ সালে গোর্কির সঙ্গে আন্দ্রেই ঝানভ সোভিয়েত পার্টির পক্ষ থেকে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে দায়িত্ব পান। ঝানভ তাঁর ভাষণে যে রূপরেখা তুলে ধরেন তা আসলে (অন্তত আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে) সাহিত্যে 'সেন্সরশিপ'-এর নামান্তর মাত্র। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন :

> ...সোভিয়েত শিল্পসাহিত্যের সাফল্যের চাবি নিহিত রয়েছে সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের সাফল্যের মধ্যেই— এখানেই সাহিত্যের সাফল্য খুঁজতে হবে। ...আমাদের (সমাজতান্ত্রিক) সাহিত্য সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তরুণতম। একই সঙ্গে তা আদর্শের দিক থেকে সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে অগ্রগামী এবং সবচেয়ে বিপ্লবী। ...সোভিয়েত সাহিত্যে আমাদের নায়কদের ছবি আঁকতে হবে; আমাদের সাহিত্যে ভবিষ্যতের আভাস থাকতে হবে। এবং কষ্টকল্পিত স্বপ্ন নয়, আমাদের আগামীকাল অদূরের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠছে— তা ঘটছে আমাদের সচেতন পরিকল্পনার জন্যই। ...আপনারা ভবিষ্যতের সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ এমনভাবে নিজেদের সংগঠিত করুন যাতে আপনাদের সৃজনশীল ক্ষমতা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান ও ভবিষ্যত বিজয়ের জন্যই নিয়োজিত হয়।

১৯৩৬ সালে গোর্কির মৃত্যুর পর ক্রমশই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নামে একটি একদেশদর্শী, অনৈতিহাসিক পীড়নমূলক ব্যবস্থা কায়েম হতে থাকে। এর ফলে অনেক সৃজনশীল শিল্পী সাহিত্যিক কেবলমাত্র এই যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে প্রকাশ্য লেখা ছেড়ে দিয়ে গোপনে লেখালেখি শুরু করেন। এই সমস্ত লেখা সোভিয়েতের পতনের পর বা স্তালিনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে।

লেনিনের জীবদ্দশায় সোভিয়েত রাশিয়ায় মতাদর্শগত বিতর্ক এবং সেইসঙ্গে সাহিত্যিক মহলে প্রকাশের রূপ এবং বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্ক এবং নিরীক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ই ছিলো। কিন্তু লেনিনকে হত্যার চেষ্টার পর সেই খোলামেলা পরিবেশ ক্রমশ পরিসরের দিক থেকে কমে আসতে থাকে।

জারের আমলে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা জারি ছিলো তার অনেকটাই ১৯০৫-এর ব্যর্থ বিপ্লবের সময় উঠে যায়। এপ্রিল ১৯১৭-তে যে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তা এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে। ১৯১৮-তে যখন ডিক্রি জারি করে রুশ রাষ্ট্রকে সরকারিভাবে রুশ অর্থোডক্স চার্চ থেকে পৃথক করা হয়, তখন আবার নানা রকম নিষেধাজ্ঞা ফিরে আসতে থাকে।

১৯২২ সালে ''গ্লাভিল্ট'' নামে একটি কেন্দ্রীয় সেন্সরশিপ দপ্তর চালু হয়। ক্রমে ক্রমে এই দপ্তরটির হাতে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক মতাদর্শ প্রচারকারী সংবাদপত্র, লেখা ইত্যাদি নিষেধ এবং বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র ধর্মীয় পত্রপত্রিকা-পুস্তিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে থাকে। সামান্য কিছু বলশেভিক রাষ্ট্র-বিরোধী প্রচারপত্র ও পুস্তিকাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে। ক্রমশ এই নিষেধাজ্ঞা ''পার্টি-বিরোধী'' পূর্বতন পার্টির নেতাদের লেখাপত্র, এমনকি একেবারেই পার্টি-বিরোধী নয় এমন লেখার মুখবন্ধ লিখেছেন একজন পার্টি থেকে বহিষ্কৃত নেতা, সেই সমস্ত লেখাও নিষেধাজ্ঞার ফতোয়ার কবলে পড়ে।

'পেরেস্ত্রইকা'-র যুগে যখন মস্কো-স্থিত রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরির নিষিদ্ধ বই-এর সংগ্রহটি সর্বসাধারণের জন্য কয়েকদিন খোলা হয়, তখন দেখা যায় ১৯২২ থেকে ১৯৮৮, এই সময়কালে ২৭ হাজার রুশ বই, দু লক্ষ ৫০ হাজার বিদেশি বই, ৮০০০ নানান পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের হেনস্থা

সোভিয়েত সমাজের প্রথম দিকের মন্থনটি অনেকের কাছেই খুব হিংস্র হিসেবে প্রতিভাত হয়। যাঁরা বিপ্লবের জঙ্গিপনা এবং তথাকথিত ''অসংস্কৃত'' মানুষদের ''বাড়াবাড়ি'' দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পুরনো আমলের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ। কবি সের্গেই ইয়েসেনিনকে এঁদের অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। তাঁর বিদ্রোহী চরিত্রে শৃঙ্খলার হয়ত অভাব ছিলো, মদ এবং নারী আসক্তি তাঁর শেষ জীবনের সঙ্গী হয়ে পড়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বলশেভিক বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর কবিতা আজও সমান জনপ্রিয়। তিনি এক সময় বিখ্যাত মার্কিন নর্তকী ইসাডোরা ডানকানকে বিবাহ করেন। ইসাডোরা ডানকান তাঁর জননী হওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, কানাডার চিকিৎসক ডাক্তার নর্মান বেথুন সেটিকে রাশিয়ার বিপ্লবের সময়কার টালমাটাল অবস্থার বর্ণনা করার জন্য চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন। ইসাডোরা বলেছিলেন রক্তপাত, গর্ভযন্ত্রণা আর নবাগত শিশুর ক্রন্দন শুনে যিনি মাতৃত্বের বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি বন্ধ

করার জন্য ছটফট করবেন। কিন্তু তাঁকে যখন বলা হবে যে নবজাতকের জন্য এই যন্ত্রণা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে এবং নতুন জন্মের জন্য তা আবশ্যিক, তখন ঐ সকল প্রক্রিয়া যতই অপছন্দের হোক না কেন, তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ার এই টালমাটাল অবস্থাকে মাতৃত্ব নিয়ে ইসাডোরার বক্তব্যের সঙ্গে বেথুন তুলনা করে বলেছিলেন যে বিপ্লব কোনও সুস্থির, পেলব, মনোমুগ্ধকর ঘটনা নয়।

ক্রিসমাসের সময় ১৯২৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর ইয়েসেনিন মস্কোর একটি হোটেলে আত্মহত্যা করেন বলে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই ''আত্মহত্যা''-র আগে তিনি সোভিয়েত অন্তর্ঘাত-বিরোধী পুলিশের নজরদারিতে আসেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের তোড়জোড় চলে বলে শোনা যায়। ইয়েসেনিন রাষ্ট্রীয় ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন— এমন একটা রটনা সেই সময়ে প্রচারিত হয়েছিল। সেটি প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত, কোনোটাই হয়নি। তবে রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থায় এমনটা ঘটা আশ্চর্যের নয়। যেসব তথ্য সর্বজনসমক্ষে রয়েছে তার থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইয়েসেনিনের মৃত্যুর প্রায় ৪০ বৎসর পর পর্যন্ত তাঁর লেখা কবিতা রাশিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁর কবিতা আবৃত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাঁর কবিতার মুদ্রিত রূপ হাতে লিখে প্রচার করার জন্য অনেকে হাজতেও গিয়েছেন।

ইয়েসেনিনের মৃত্যু সোভিয়েত কবি ভ্লাদিমির মায়াকভস্কিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি ইয়েসেনিনের শেষ দিকের কয়েকটি কবিতার বিষাদময় পংক্তিকে আশাব্যঞ্জক পংক্তিতে পরিবর্তিত করেন। মায়কভস্কিকে যদিও রুশ বিপ্লবের সন্তান বলা হয়, কিন্তু তিনিও তাঁর শেষ জীবনে সোভিয়েত আমলাতন্ত্র, যা ফাঁসের মতো ধীরে ধীরে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে গিলে ফেলতে শুরু করেছিল, তার বিষ নজরে পড়ে যান।

সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন সমাজ-সংগঠন নানারকম বিষয়ে নিরীক্ষায় সফল হলেও আমলাতন্ত্রের দাপট এবং স্বার্থান্বেষী, ভাগ্যান্বেষী মধ্যমেধার সুযোগসন্ধানীদের উচ্চ পদে আরোহন ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেকে সোভিয়েত রাশিয়ার আমলাতন্ত্র সহ নানান বিচ্যুতিকে ''চক্রান্ত'' বলে তত্ত্বায়িত করতে চান। এই ''তত্ত্ব'' মেনে নিলেও মৌলিক প্রশ্নটি তবুও অমীমাংসিত থেকে যায়— কীভাবে শ্রমিকদের রাষ্ট্রে শ্রমবিরোধী শক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রে ঘাঁটি গাড়তে পারল। ব্যবস্থা হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্র যে এই ধনতান্ত্রিক প্রবণতা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা স্বীকার না করলে ভবিষ্যতের বাস্তবের সমাজতন্ত্রের পক্ষে বর্জনীয় প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করা ও প্রতিহত করা একই রকম কঠিন হয়ে উঠবে।

মায়কভস্কিও এই সংকীর্ণমনা, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীদের দ্বারা পরবর্তীকালের অন্যান্য অনেকের মতোই হেনস্থার শিকার হন। ১৯২০ সাল থেকেই সোভিয়েত রাজত্বের সেন্সরশিপ বিপরীত মত বা স্রেফ মতান্তরকে প্রথমে সন্দেহ, পরবর্তীকালে বিদেশি রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট অন্তর্ঘাত হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে। মায়কভস্কি এই বিপজ্জনক এবং অনভিপ্রেত প্রবণতার বিরোধী ছিলেন। বেশ কয়েকটি নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি এই সংকীর্ণমনা, স্বার্থান্বেষী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি বিরোধিতায় নামেন। মায়কভস্কির বিরুদ্ধে নানান কল্পিত অভিযোগ উঠতে থাকে— যদিও তাঁর লেখার ওপর তখনও নিষেধাজ্ঞা জারির সাহস করেনি কেউ। তবে মায়কভস্কির ছবির প্রদর্শনী সোভিয়েত শাসন এবং আমলাতন্ত্রের সমর্থক প্রায় সবাই বয়কট করে, মায়কভস্কির ইউরোপ সফরের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে। যেদিন তিনি আত্মহত্যা করেন, তার কয়েকদিন আগে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তাঁর একটি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ছিলো। পার্টির প্রতি বিশ্বস্ত তরুণ ছাত্রবৃন্দ মায়কভস্কির দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সমালোচনার গভীরতা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে সভা পণ্ড করে সভাকক্ষ জুড়ে কুকুর-বেড়ালের ডাক দিয়ে বিপ্লবের সন্তান এই কবিকে সভামঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয়। এই ঘটনার দিন তিনেক পর মায়কভস্কি আত্মহত্যা করেন। এতৎসত্ত্বেও যতদিন গেছে মায়কভস্কির কবিতা ও কাব্য ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিখ্যাত রুশ কবি আলেকজান্ডার ব্লক বিপ্লবের তীব্র সমর্থক হিসেবে কলম তুলে নেন। তিনি ১৯১৯ থেকে সারা জীবন তিনি 'অল রাশিয়ান ইউনিয়ন অফ পোয়েট্স'-এর পেট্রোগ্রাদ শাখার সভাপতি ছিলেন। ক্রমাগত কম সৃজনশীল ব্যক্তিদের খবরদারিতে ব্লক ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৯২১-এ আলেকজান্ডার পুশকিন-এর ৮৪-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি অবশেষে প্রকাশ্য সভায় তাঁর ক্ষোভ উগ্‌রে দেন। ব্লক ক্রমশ সাহিত্য রচনা থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। এক সময় সোভিয়েত সুরক্ষা সংস্থা 'চেকা' সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তের অভিযোগে ব্লককে গ্রেপ্তার করে। এরকম বহু অযৌক্তিক এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই শিল্পী-সাহিত্যিকদের পাইকারি গ্রেপ্তার গোর্কিকেও ব্যথিত করে। বহুক্ষেত্রেই তিনি সরাসরি লেনিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে লেনিনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকদের বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্লক-এর ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য তাঁর যে দেশের বাইরে যাওয়া দরকার বলে গোর্কি নিজেই লেনিনের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের গঠন পর্ব কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে বলশেভিক মতের সঙ্গে ব্লক দ্বিমত পোষণ করতেন, কিন্তু সমাজতন্ত্র নিয়ে তাঁর কোনও দ্বিমত ছিলো না। যাঁরা শিল্পী-সাহিত্যিকদের নীরব করে রাখার নিদান দিচ্ছিলেন, গোর্কি তাঁদের ''চিন্তক গিলোটিন'' নামে অভিহিত করেন। শেষ পর্যন্ত গোর্কির চাপাচাপিতে লেনিন যখন ব্লক-এর চিকিৎসার জন্য তাঁর বিদেশগমন মঞ্জুর করেন, তখন ব্লক এতটাই

দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাঁর পক্ষে আর বিদেশ যাওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর চেকা-র কারাগার থেকে তিনি বাড়ি ফেরেন। ১৯২১ সালের ৭ অগস্ট তিনি প্রয়াত হন।

একই বা আরও খারাপ ঘটনা ঘটে আন্না আখ্‌মাতোভার প্রথম স্বামী, বিখ্যাত কবি নিকোলাই গুমিলেভ বা ওসিপ মান্দেলস্তামের ক্ষেত্রে। আলেকজান্ডার ফাদায়েভও ১৯৫৬ সালে আত্মঘাতী হন। অনেক সাহিত্যিক 'রাজরোষ" থেকে বাঁচতে রাশিয়ার পুরোনো ঐতিহাসিক চরিত্রদের নিয়ে কাহিনী রচনা করা শুরু করেন। ১৯১৭ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে যে কটি হত্যার কাহিনী সামনে এসেছে, তাতে জানা যাচ্ছে যে প্রায় ১৫০০০ জন শিল্পী-সাহিত্যিক হয় ''রাষ্ট্র-বিরোধী" কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, নয় গ্রেপ্তারের পর তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে ''শ্রম শিবির"-এ (যেমন ঘটেছে ওসিপ মান্দেলস্তামের ক্ষেত্রে)! পাস্তেরনাক নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেও তা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন। শিল্প-সাহিত্য জগতের এই মাৎসন্যায়ের সময়েও আবার স্তালিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকদের ''গুপ্তচর" তক্‌মার বিরোধিতা করে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড রোধ করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্প স্তালিনের ''প্রশ্রয়" পেয়ে বিবর্ধিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অজানা, অ-চর্চিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চালু হয়েছিলো স্তালিন প্রাইজ— ১৯৩৬ থেকে যুদ্ধের সবচেয়ে তীব্র বছরগুলি ছাড়া স্তালিনের মৃত্যু পর্যন্ত সেই প্রথা চালু ছিলো।

যে আখ্‌মাতোভাকে সোভিয়েত সাহিত্য সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো, লেনিনগ্রাদ অবরোধের সময় তাঁর কবিতা লেনিনগ্রাদ রেডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে, যে সাস্তানোভিচকে ''দুর্বোধ্যতা"-র অভিযোগ তুলে সমালোচনা করা হচ্ছিলো, লেনিনগ্রাদ অবরোধের সময় অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকীতে তাঁর রচিত সিম্ফনি সম্প্রচারিত হয়েছে।

উপসংহারে এই কথা বলতেই হবে যে হাজার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বাস্তব অনুশীলনে মানুষ প্রজাতি হিসেবে পূর্ণতর জীবনযাপনের পাশাপাশি তার সাংস্কৃতিক চাহিদার দিগন্ত আরো প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। যে কণ্টকাকীর্ণ পথে তার যাত্রা শুরু হয়েছিলো, সেই পথে তার পা অনেকবারই রক্তলাঞ্ছিত হয়েছে। পথভ্রষ্ট হয়ে হয়তো তা বিপ্রতীপে উপস্থিত হওয়ার উপক্রমও করেছে, কিন্তু সঠিক, মানবিক অবস্থানে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা ছিলো সৎ, আন্তরিক। আর এটাই মানবজাতির সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বাস্তবের সমাজতন্ত্রের চিরস্থায়ী অবদান— নতুন করে আরম্ভের সূচনাবিন্দু। ❐

বিশ্বায়ন-মতাদর্শ-সংস্কৃতি

২৬ পৃষ্ঠার পর

> the Communist Manefesto, sit-down strikes in the Thirties, campus building take-overs in the sixties - arguably these were all memes - no more or less, may be, than the militant street carnival of the past decade. What is different in each case is the shape and flow of the specific media pathways these memes must travel and the culture with which they must connect. The contemporary movements profiled here and the techniques they have pioneered will hopefully be of service to those of us who believe that truth is a virus and whose aim is to subvert the corporate meme-machine with a sly guerilla war of signs.[১০]

দুনিয়া জোড়া শিক্ষা-সোভিয়েত গড়ে তোলার কাজে অন্তর্ঘাতের এই পাঠক্রম (যার নিজেকে ক্রমাগত বিশিষ্ট করে বর্ধিত করার ক্ষমতা আছে) অন্তর্ভুক্ত করা আজ জরুরি। ❐

উল্লেখপঞ্জি

১. *গ্লোবালাইজেশন ইন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি*, সম্পা. এ জি হপকিন্স, সিমালকো ২০০২
২. ঐ, পৃ. ৯
৩. বাংলার নির্মাণ / অবিনির্মাণ, সম্পা. অনির্বাণ দাশ, *অবভাষ* ২০০৭, পৃ. ৫৮-১৩৫
৪. ভি আই লেনিন : *কালেক্টেড ওয়ার্কস*, ভল্যুম ২২, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৪, পৃ. ১৯৫।
৫. মাইকেল হার্ডট ও আন্তেনিও নেগ্রি : *এমপাওয়ার*, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০
৬. আন্তোনিও গ্রামশি, *প্রিজন নোটবুক থেকে নির্বাচিত অংশ*, সম্পাদনা ও অনুবাদ : কুইনটিন হোয়ারে ও জফ্রে নোয়েন স্মিথ, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১, পৃ. ১৩
৭. ঐ, পৃ. ৪০
৮. *গ্লোবালাইজেশন ইন গ্লোবাল হিস্ট্রি*, টোনি ব্যালান্টাইন
৯. *কালাচারাল রেজিস্টান্স রিডার*, সম্পা. স্টিফেন ডানকোম্ব। প্রথম প্রকাশ ভেরসো, লন্ডন, ভারতীয় সংস্করণ : আদর্শ এন্টার প্রাইজেজ, নয়া দিল্লী, ২০১২, পৃ. ৩৭০
১০. ঐ, পৃ. ৩৭৮

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর

৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

ধর্ম কি চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে?

সুচরিতা সেন

এই কথাটা নিয়ে বিগত দু-এক দশকে বেশ কিছুটা বিতর্ক ও জল্পনাকল্পনা হয়েছে। একটা, যাকে বলে মতামতের ধার, স্কুল অফ থট, আছে। ধর্ম প্রায় অবক্ষয়ের পথে চলেছিল। কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে। আজ সবল, সক্রিয়।

ধরা যাক, শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় কৃষ্ণা বসুর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধ। লেখিকা কৃষ্ণা বসু অধ্যাপিকা, রাজনীতিবিদ, লোকসভার প্রাক্তন সদস্য, সর্বোপরি সুভাষচন্দ্রর পরিবারের বধূ। বেশ কয়েকজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দেওয়ার পর কৃষ্ণা যে মন্তব্য করেছেন তা এই রকম। ধর্ম বিশ্বাস মানুষ মাত্রেরই জন্মগত প্রবণতা। কম্যুনিস্টরা সেটা জোর করে খারিজ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়ায় আবার ধর্মের বন্যা বইছে।

কৃষ্ণা বসুর কথা কতখানি সত্য? কমিউনিজম-উত্তর সোভিয়েত ভূখণ্ডে ধর্মের প্রত্যাবর্তনের কথা এক দিক থেকে যথার্থ। রাশিয়া এখন গির্জার ভক্ত, নতুন বা পুরনো মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত ভেঙে তৈরি হওয়া বিভিন্ন যে ''স্তান'' জন্ম নিয়েছে সেখানে মসজিদ-মাদ্রাসার রমরমা। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট শপথ নেন, এক হাত রাষ্ট্রের সংবিধানের ওপর, অন্য হাত কোরানের ওপর রেখে। বিশেষ ব্যাপারে সরকারে নেয় আলেম বা ধর্মগুরুদের পরামর্শ। কিন্তু এই 'রিভাইভাল' বা পুনর্জন্ম কতখানি বাইরের আর কতখানি অন্তরের? রাশিয়ার নতুন শাসক শ্রেণী অঢেল পয়সা খরচ করে গির্জা বানিয়েছে। কিন্তু কতজন তাতে যায়? আর কমিউনিস্ট আমলে ধর্ম নিষিদ্ধ হয়েছিল, এ কথাও অসত্য।

ধর্ম, বলা যায়, গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ, রাশিয়ার সাবেক ধর্ম, চিরকাল প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। তার নব অবতারের কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯৮ সালে শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাই ও তাঁর পরিবারের অবশিষ্ট তুলে এনে রাজকীয় সম্মানের সাথে সমাধিস্থ করা হলো। তার দু বছর পর গির্জা তাঁর মাথায় তুলে দিল সন্তের মুকুট। অর্থাৎ তাঁর আমলে রাশিয়া ছিল স্বর্গ। কেবল বলশেভিক বিপ্লব নয়, যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব জারকে মসনদ থেকে সরিয়েছিল তাও অন্যায় ছিল। সন্তের বিরুদ্ধে আবার বিক্ষোভ কী? কিন্তু সবাই কি একথা মেনে নিয়েছে?

কবে কী ভাবে ধর্মের জন্ম হয়েছিল বলা কঠিন। ধর্মের অর্থ কী তাও স্পষ্ট বা সর্বজনীন নয়। ধর্ম মানে কোন জীব বিশেষের বিশেষত্ব বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হতে পারে এই অর্থেই সম্ভবত বলা হয়েছিল, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। ধর্মে যে সর্বদা ঈশ্বর বা পরলোক থাকে, তাও নয়। বৌদ্ধ ধর্মের আদি যুগে এ সবের স্থান ছিল না, যদিও পরে যুক্ত হয়েছিল। আবার ধর্মের সঙ্গে ম্যাজিকের— মঞ্চে হাতসাফাই নয়, অলৌকিক ম্যাজিক— যোগই বা কী আর পার্থক্যই বা কোথায়? এ বিষয়টি নৃতাত্ত্বিক ফ্রেজার চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত বই The Golden Bough-তে। ধর্মবিশ্বাসীরা নতজানু হয়ে দেবতার কাছে— কে কার দেবতা তা নিয়ে অবশ্য মতপার্থক্য আছে— প্রার্থনা করবে, বিপদ থেকে রক্ষার জন্য, অথবা কোন বাসনা পূর্ণ করার জন্য। আবার যারা বেশি ভক্ত, তারা কোন প্রার্থনা জানাবে না। ঈশ্বর যা ভালো মনে করেন, তাই করবেন। মানুষের উচিত সেটা মাথা পেতে মেনে নেওয়া। ''রাখেন হরি, মারেন হরি/বল ভাই ধন্য হরি।''। অন্য দিকে ''ম্যাজিক পন্থী''রা মনে করেন, দেব দেউলে মাথা কোটা অহেতুক। বরং মন্ত্র বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতাদের বাধ্য করা যায় কাঙ্ক্ষিত বর দিতে। চণ্ডালিকার মা যেমন মন্ত্রবলে ধরে আনে তরুণ সন্ন্যাসী আনন্দকে। ধর্ম আর ম্যাজিক একত্রিত হওয়ার নিদর্শনও মেলে না, তা নয়। ফ্রেজার উদাহরণ দিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইতালি থেকে গোঁড়া ক্যাথলিক দেশেও চাষিদের একাংশ ধর্মযাজকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, মন্ত্র বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভালো চাষের ব্যবস্থা করতে। এমন অবস্থায় আমরা কাকে ধর্ম বলব, আর ধর্মের আদি অন্তই বা কী?

ধর্ম বলতে কী বোঝায়, ধর্মের 'ক্যাটেগরি' কী, তা নিয়েও বিতর্ক কম নয়। দার্শনিক রুশো বলেছেন, বিভিন্ন ধর্ম, একেশ্বরবাদ, বহুদেববাদ, সাকার ও নিরাকার, উপাসনা, এসব প্রকৃত পার্থক্য নয়। সব কিছুর মূল ধর্মী ধারা তিনটি। ঈশ্বর তিন প্রকার। পুরোহিতের ধর্ম। যার বিষয়বস্তু অর্থহীন ও অন্তহীন আচার বিচার। কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ। রবীন্দ্রনাথের অচলায়তনের হাস্যকর নিয়মকানুন। তার পর নাগরিকের ধর্ম। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ধর্ম। কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের অংশ, কোন দল বা সম্প্রদায় যে ধর্মকে নিজস্ব মনে করে। প্রাচীন গ্রীক ও ইতালিয়ান নগর-রাষ্ট্রের নিজ নিজ দেব বা দেবী ছিল। দেবী আথিনার অ্যাথেন্স। হোমারের মহাকাব্যে, ট্রয় যুদ্ধে দেবতারাও শরিক। কেউ এক দিকে, কেউ অন্য দিকে। এক বিখ্যাত ইংরিজি কবিতায় রোমান বীর হরেশিয়াম যুদ্ধের আগে বলছে, And how can a man die better/Than by facing feraful odds/For the ashes of his fathers/And the temples of his gods.

আধুনিক যুগে চার্চ অফ ইংল্যান্ডকে বলা হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতাদর্শগত ঢাল। আমাদের দেশে বিজেপি-র অস্ত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তানের যেমন মুসলমান জাতীয়তাবাদ।

সব শেষে আছে রুশো যাকে বলেছেন মানুষের ধর্ম। উদার, সর্বজনীন। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন religion of man। কোন্ ধর্ম শেষ হয়েছে বা হবে, তার স্থান কী নেবে, বলা কঠিন।

কবে এবং ঠিক কী ভাবে ধর্মের উন্মেষ হয়েছিল বলা কঠিন। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপজাতির নিজস্ব টোটেম ছিল। কোন পশু, পাখি বা উদ্ভিদ প্রকৃতির সন্তানদের পক্ষে, যা স্বাভাবিক। ক্রমে গোষ্ঠী রূপান্তরিত হলো ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে। বিভিন্ন টোটেম মিলে হলো ধর্ম। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'লোকায়ত দর্শন' বইয়ে এই প্রক্রিয়ার এক নিদর্শন তুলে ধরেছেন। প্রাচীন মিশরের এক লিপিতে আছে, ''বাজপাখি গিলে খেল আর সব জানোয়ার''। এর প্রকৃত অর্থ কী? যে গোষ্ঠীর টোটেম বাজপাখি, তারাই অন্য সব গোষ্ঠীকে পরাজিত করল। বাজপাখি গোষ্ঠীর সর্দার হলেন মিশরের রাজা। তাঁর প্রতীক বাজপাখি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রামায়ণের বানর ও ভাল্লুক সৈন্যরা প্রকৃতপক্ষে পশু নয়। এ সবই অনার্য গোষ্ঠীর টোটেম।

কী ভাবে মানুষ কল্পনা করেছিল আদিম দেবতাদের? বলা বাহুল্য, তার নিজেরই প্রতিমূর্তি রূপে। ''দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।'' গ্রীক, ভাইকিং দেবতারা ছিলেন সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন। মহা শক্তিশালী, সুদর্শন, কিন্তু প্রথম দুই রিপুর বশ। ভাইকিং অর্থাৎ স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা কল্পনা করত, স্বর্গ বা ভালহালায় সারা দিন যুদ্ধ চলে। রাতে মৃত বীররা সবাই জীবিত হয়ে ওঠে। আহতদের নিরাময় হয়। সারা রাত চলে ভোজ। পরদিন আবার...। আসলে ভাইকিংরা কেবল দুটি আনন্দের, উপভোগের কথা ভাবতে পারত, যুদ্ধ আর ভোজ। তাদের ইচ্ছাপূরণের ভালহালায় ওই দুটিই স্থান পেত স্বাভাবিক ভাবেই। আমাদের দেবরাজ ইন্দ্র আর্য দলপতিদের আদলে গড়া।

সবাই অবশ্য এই দর্পণ রূপ খুব পছন্দ করত না। দার্শনিক প্লেটো বিলাপ করেছেন, ক্রোধ ও কাম-পরায়ণ দেব দেবীরা সমাজের আদর্শ হবে কী করে? তরুণরা এমন পুরাণ, শাস্ত্র পড়ে, পুরাণ-ভিত্তিক থিয়েটার দেখে কী শিক্ষা পাবে! কেমন করে গড়ে উঠবে উন্নত চরিত্র? চরমপন্থী প্লেটো বরং কবি ও নাট্যকারদের তাঁর আদর্শ প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক থেকে নির্বাসন দিতে আগ্রহী। প্লেটো আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি পড়লে বোধ হয় হার্ট ফেল করতেন!

মানুষের আদলে দেব চরিত্র অঙ্কন, যাকে বলে Anthromorphism, প্রাচীন ধর্মের সামাজিক ভিত্তি ও শক্তি ছিল। কিন্তু ধর্মের পতনের বীজও ছিল সেখানে নিহিত। নগর-রাষ্ট্র যখন বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হলো তখন স্থানীয় দেবদেবীরা গুরুত্ব হারালেন। অন্য দিকে নবীন খ্রিস্টান ধর্ম ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল বন্যার মতো। আর সাবেক গ্রীক রোমান ধর্মকে আক্রমণ করল প্লেটোর মতোই, নৈতিক দিক থেকে। সন্ত অগুস্তিন ''ঈশ্বরের নগর'' নামক পুস্তকে, অন্য অনেক খ্রিস্টান প্রচারক, সন্ত ও মনীষী, অনুরূপ যুক্তি দেখালেন। যে ধর্মে দেবতারা এমন নীতিহীন ক্রোধ, বিবাদ ও প্রেম লীলায় উন্মত্ত, তা কি কোন বিবেকবান মানুষ অনুসরণ করতে পারে? সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ নাট্যকার Massinger-এর নাটক The Virgin Martyr-এর এটাই বক্তব্য।

খ্রিস্টান প্রচার সফল হলো। খ্রিস্টান ধর্ম ক্রমে বিভিন্ন ধরনের বহুদেববাদ (polytheism)-কে পরাজিত করে পৃথিবীর এক বড়ো অংশকে দখল করল। পরে আবার অনেক জায়গায় তাকে হটিয়ে দিল। কিন্তু পুরনো বিতর্ক, ধর্ম (religion) বনাম নীতি (morality), শেষ হলো না। ফিরে এলো নব রূপে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উঠতি বুর্জোয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা একই মাঠে নেমে চ্যালেঞ্জ জানালেন প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান ধর্মকে। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি সাহিত্যিক ভিনি মন্তব্য করলেন, অগুস্তিন যেমন 'পেগান' দেবতাদের নীতিবোধ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি আলোকের যুগের অন্যতম মনীষী ভোলতেয়ার আক্রমণ করেছেন খ্রিস্টান নীতি ও কাজকর্মকে। অবশ্য সেমিটিক ধর্মের একেশ্বর পেগান দেবতাদের দোষগুলির শরিক হতে পারেন না। কিন্তু অকারণ নিষ্ঠুরতা, মানুষের বিরুদ্ধে নির্মমতার অভিযোগ এ ক্ষেত্রে আনা যেতে পারে। বাইবেল নাকি 'পবিত্র আত্মা'র (Holy Spirit) রচনা। অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্দেশে লেখা। 'পবিত্র আত্মা' কি এর চেয়ে ভালো কিছু সৃষ্টি করতে পারত না? ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী কী? ভাই ভাইকে ছুরি মারছে। পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, মসনদের লোভে। বস্তুত, বাইবেলের পুরনো টেস্টামেন্ট ছিল খ্রিস্টপূর্ব ইহুদি জাতির ইতিহাস। অন্যান্য দেশের ইতিহাসের মতো এখানেও লক্ষণীয় ছিল রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির ছড়াছড়ি। অন্য অনেক জাতির মতোই। আর 'লেভিটিকাসে' যে আইন ও শাস্তির তারিকা দেওয়া হয়েছে তা আধুনিক যুগের চোখে বর্বর। যেমন সমকামীদের মৃত্যুদণ্ড, ব্যাভিচারী বা ধর্ম-বিরোধীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা। যাকে বলে মুশা বা মোজেসের আইন।

ভিন্নি ভোলতেয়ারের রচনাকে তুলনা করেছেন 'ঈশ্বরের নগর'-এর সঙ্গে। অগুস্তিনের 'কনফেশন'-কে রুশোর অনুরূপ নামের বইয়ের সাথে।

নীতি ভিত্তিক সমালোচনা ও আক্রমণের আঘাতে (অন্য নানা কারণও ছিল) পেগান ধর্ম ভেঙে পড়েছিল। খ্রিস্টান ধর্ম হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম।

আলোকের যুগে তবে খ্রিস্টান ধর্মের স্থান নিল কী? ইউরোপ আমেরিকার মাটিতে, বিশেষ ফ্রান্সে, শিক্ষিত মানুষের এক বড়ো অংশ বিভক্ত হলো নিরীশ্বরবাদ ও ডেইজমের মধ্যে। যারা ঈশ্বরকে একেবারে ছাঁটাই করতে রাজি ছিল না, ডেইজম ছিল মধ্যপন্থা হিসেবে তাদের কাছে গ্রহণীয়। যুক্তিবাদ ও ধর্মের

মিশ্রণ। ডেইজ্‌মের পথপ্রদর্শক ছিলেন সম্ভবত ইংল্যান্ডের লর্ড বলিংব্রোক। তবে সাধারণ ভাবে এনলাইটেনমেন্টের মাটি এমন গাছের জন্ম দেবে, তা ধরেই নেওয়া যায়। ডেইজ্‌মের মূল কথা এই রকম। ঈশ্বর একজনই। খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সবাই তাঁকেই উপাসনা করে, ভিন্ন নামে।

ভোলতেয়ার সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত। তিনি পরিণত বয়সে একবার অন্যদের সামনে নতজানু হয়ে আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন: ''মহান ঈশ্বর! আমি তোমাকে পূজা করি।'' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা গলায় যোগ করলেন, ''কিন্তু ঈশ্বরপুত্র যিশু ও তাঁর মাতা মেরিকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।'' অর্থাৎ তিনি ডেইস্ট, খ্রিস্টান নন।

জার্মান এনলাইটেনমেন্টের অন্যতম প্রতিনিধি লেসিং তাঁর 'জ্ঞানী নাথান' নাটকে একটি নীতিকথা বা 'প্যারাব্‌ল' তুলে ধরেছেন। এক রাজার ছিল তিন ছেলে আর একটি যাদু আংটি। সে আংটি যার হাতে থাকবে, সেই হবে মহাশক্তিধর, পরম সৌভাগ্যবান। বলা বাহুল্য, তিন রাজপুত্রই আংটির দিকে লোভের দৃষ্টিতে চাইত। রাজা তিনটি আংটি বানালেন, ঠিক এক রকম দেখতে। প্রত্যেক ছেলেকে একটি করে আংটি দিয়ে বললেনে, ''এটাই আমার অলৌকিক আংটি। কিন্তু কারোকে বোলো না।'' তিন রাজপুত্রই সন্তুষ্ট হলো। তেমনি ভগবান খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান, তিন সম্প্রদায়কে সমান ভালোবাসেন। কিন্তু প্রত্যেককে মনে করতে দেন, তারাই তাঁর প্রিয়। এখানে তিনটি প্রধান সেমিটিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে, তবে আসলে ইঙ্গিত সব ধর্মের প্রতি।

ডেইস্টরা অলৌকিক কাণ্ড কারখানায় বিশ্বাস করত না। ঈশ্বর নিজেই যে সব প্রাকৃতিক আইন সৃষ্টি করেছেন, তা ভাঙতে পারেন না। সেটা করলে হবে স্ববিরোধিতা। একটা ফল শূন্যে ঝুলে থাকলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ব্যাহত হয়।

আলোকের যুগের এক দিক ছিল নারীবাদ না হোক, নারীর প্রতি সহমর্মিতা। অন্যতম মনীষী মঁতেস্ক ''পারসিক পত্র'' নামক রোমান্সে দেখিয়েছেন, পরলোকে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্য। যদি সুন্দরী হুরিরা বিশ্বাসী পুরুষদের সঙ্গ দেয়, তবে উল্টোটাই বা হবে না কেন? উপন্যাসে হারেমের এক নারী কারাগারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রাণ হারায়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নারীদের বেহেস্তে। সেখানে তার মনোরঞ্জন করে একাধিক পুরুষ ফেরেস্তা। সবাই অত্যন্ত সুদর্শন।

সব ধর্মই কম বেশি পিতৃতান্ত্রিক। সে দিক থেকে দেখতে গেলে আলোকের যুগ ধর্মকে আঘাত করে পিতৃতন্ত্রকে কিছুটা আঘাত করেছিল।

অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিম ধর্মহীনতায় ডুবে গিয়েছিল এমনটা বলা অত্যুক্তি হবে। যুক্তিবাদের স্বর্ণযুগেও অনেক জায়গায় ধর্মের রমরমা বজায় ছিল। জার্মানি ছিল এক ভক্তিমূলক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পীঠস্থান। ইংল্যান্ড তখন শিল্প বিপ্লব প্রথম পর্বে রঙ্গভূমি। প্রথম (বা দ্বিতীয় বা তৃতীয়) প্রজন্মের শ্রমিক কর্মীদের ক্ষেত্রে মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের আকর্ষণ ছিল। ঠাট্টা করে বলা হয়, রাজা তৃতীয় জর্জ বিশেষ জনপ্রিয় না হলেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়নি, কারণ তিনি প্রতি রবিবার গির্জায় যেতেন, আর নিজের রাণী, দেশের সব চেয়ে কুদর্শনা নারীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতেন। মেথডিজ্‌মের জন্যই ফরাসি বিপ্লব চ্যানেল পার হতে পারেনি, এমন কথা বলেছেন দু-একজন ঐতিহাসিক প্রবক্তা।

ফরাসি বিপ্লব আবার শাসক শ্রেণীকে ধর্মের দিকে ঠেলে দিল। তারা বুঝল, ধর্মের আফিম, মার্কসের ভাষায়, বাদ দিলে আম-জনতাকে বশে রাখা যাবে না। ঐতিহাসিক তোকভিলের বক্তব্য: গোড়ায় ফরাসি অভিজাত শ্রেণী পুরোপুরি অ-ধার্মিক ছিল। বিপদ বুঝতে পেরে তারা ধর্মের দিকে ঝুঁকল। তারপর বিপন্ন হলো বুর্জোয়া শ্রেণী। পেছন থেকে তাদের ঠেলা দিচ্ছে প্রলেতারিয়েত। এবার তারাও ধর্মের নামাবলী গায়ে চড়ালো।

এমনকি নবজাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাগজে কলমে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও সেখানে ধর্মের দাপট খুব কম ছিল না। একটা উদাহরণ ধরা যাক। টমাস পেন ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম তাত্ত্বিক। এছাড়া ডেইস্ট ধর্মের প্রবক্তা। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত বই 'দা এজ অফ রিজন'। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওয়াশিংটন, জেফারসন প্রমুখ অন্যতম মার্কিন নেতাদের তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি যখন আমেরিকার আশ্রয় চাইলেন, তখন জেফারসন পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করতে পর্যন্ত রাজি হলেন না। খোলাখুলি নিজের ভয়ের কথা জানালেন। পেনের সঙ্গে মেলামেশা করলে যদি তাঁর সার্ভেতাসের দশা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুলি ক্যালভ্যাঁ বি-ধর্মের অভিযোগে সার্ভেতাস নামের দার্শনিক ও শরীরবিজ্ঞানীকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। জেফারসনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে, এমন সম্ভাবনা অবশ্য খুব একটা ছিল না। তবে ''অ-ধার্মিকদের'' সঙ্গে মেলামেশার দরুণ— ডেইস্টদের গোঁড়া খ্রিস্টানরা ধর্মের বাইরেই গণ্য করত— ভোট হারানোর ভয় ছিল বইকি। আজও মার্কিন রাজনীতির ওপর ধর্মের প্রভাব নেহাত কম নয়। এখন হিলারি ক্লিন্টন বনাম ট্রাম্প যে লড়াই লড়ছেন সেখান তার চিহ্ন মেলে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য দেখা গেল, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যুদ্ধের সময় বিজ্ঞানের রুদ্র রূপ দেখেছে সারা বিশ্ব। এবার দেখল, জীবনের সব খুঁটিনাটি, আমোদ প্রমোদ থেকে প্রয়োজন, সব কিছুর সঙ্গে বিজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাহলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়— যদি না বিজ্ঞানীরা সে স্থান নির্দিষ্ট করে দেন। একজনের তির্যক মন্তব্য, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিংটন যখন ভগবানের অস্তিত্ব মেনে

নেন, তখন যেন ভগবানই ধন্য হয়ে যান। বিশ্বাসীরা দাবি করতে পারে, ঐ দেখো, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে বিবাদ নেই। অর্থাৎ ধর্মেরও সার্টিফিকেট দরকার।

তাহলে ধর্ম, অন্তত জুডেও খ্রিস্টান ধর্মকে কী ভাবে দেখতে বা ব্যাখ্যা করতে হবে? বাইবেলের অনেক অলৌকিক কাহিনী কি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া উচিত, না মিশিয়ে দেওয়া কর্তব্য রূপক ও প্রতীকের ধূম্রজালে? নবী জোনার তিমি মাছের পেটে জীবনধারণ, জশুয়ার সূর্যের গতি থামিয়ে দেওয়া, বিশ্ব প্লাবনে নবী নোয়ার নৌকা, এ সব কি আক্ষরিক সত্য রূপে গ্রহণযোগ্য? সর্বোপরি ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব কী ভাবে খাপ খাবে বাইবেলের নন্দন কানন এবং আদম ও ইনভের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার সাথে? মানুষ কি আদম ও ইভের বংশধর, নাকি বানরের বংশধর? অবশ্য মানুষের বংশধর বানর, এমন কথা ডারউইন বা অন্য কোনো বিজ্ঞানী বলেননি। তবু, প্রচলিত কথায় বিবর্তন তত্ত্ব এটাই হয়ে দাঁড়াল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যে বিশের দশকে অনুষ্ঠিত হলো তথাকথিত ''বানর মামলা''। বিষয় বা বিতর্ক, ঐ রাজ্যের স্কুলে বিবর্তন তত্ত্ব পড়ানো যাবে কি না। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি পড়ল সেখানে। সুদূর নানা দেশ থেকে সাংবাদিকরা এল। শেষ পর্যন্ত বিবর্তন বিরোধীরা জয়ী হলো, কিন্তু সেই সঙ্গে দুনিয়ার কাছে হলো হাস্যাস্পদ। বোঝা গেল, বিজ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি টক্করে গিয়ে লাভ নেই। বরং আধুনিক জগতে টিকে থাকতে গেলে ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে আপস রফা করে চলতে হবে।

মজার কথা এই যে ''মৌলবাদ'' কথাটা এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ''ফান্ডামেন্টালিস্ট'' থেকে। যারা বাইবেলের কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে। যদিও আজকের দিনে কথাটা শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক দাড়িওয়ালা সন্ত্রাসবাদীর ছবি।

তবে বিজ্ঞান যে ধর্মের কেবল ক্ষতি করেছে, তা নয়। উপকারও করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব বিস্তার— রেডিও, টিভি, ভিসিআর, আরো সম্প্রতি যাকে বলা হয় সোশ্যাল মিডিয়া— ধর্মপ্রচারের বেশ সুবিধা করে দিয়েছে। অনেক প্রচারক বা 'গড ম্যান'-এর নানা চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ আছে। ধরা যাক, ইংরেজ ধর্ম প্রচারক ম্যালকম মাগরিজের কথা। ''মিডিয়া পার্সন'' রূপেই তিনি খ্যাত হয়েছিলেন। আমাদের মাদার টেরেসার খ্যাতির পেছনেও তাঁর অবদান অনেকখানি। কলকাতার অনেক চ্যানেলে ''এ যুগের খনা'', ''এ যুগের ভৃগু''-দের দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বার্নাল বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রত্যাখ্যাত অনেক কুসংস্কার এখন ফিরে আসছে। ''এখন'' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। একবিংশ শতাব্দীতে কথাটি আরো সত্য মনে হয়।

শীতল যুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। যে মৌলবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটেন, আমেরিকা আজ পঞ্চমুখ, তার বীজ তারা নিজেরাই বপন করেছে। পঞ্চাশের দশকে ইরানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাকে সরাতে তার ব্যবহার করেছিল অস্ত্র। কারণ মোসাদেক বিদেশি তেল কোম্পানিদের জাতীয়করণ করেছিলেন। জোরসোর প্রচার চালানো হলো, মোসাদেক না কি ইসলাম বিরোধী কথা বলেছেন। তারপর সিআইএ-র সহায়তায় অভ্যুত্থান ব্য ক্যু। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীকে নাজেহাল করার জন্য কাজে লাগানো হয়েছিল সবচেয়ে চরমপন্থী ইসলামিক র‍্যাডিক্যালদের। হাঙ্গারিতে কার্ডিনাল মিদজেন্তি ছিলেন প্রতিবিপ্লবের নেতা। এই ক্যাথলিক ধর্মগুরু জনশিক্ষার পর্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন। পোপ জনসন সিআইএ-র সাথে হাত মিলিয়েছিলেন পোল্যান্ড ও পূর্ব ইউরোপে অন্যত্র কমিউনিস্ট বিরোধী জেহাদে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে ধর্মের অবস্থা বা অবস্থান কী? কতজন ধর্মে— যে কোনো ধর্মে— বিশ্বাস করে? এ কথার সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে, অন্তত পশ্চিম ইউরোপে, অর্ধেকের মতো বা তার বেশি মানুষ ধর্মকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। সবাই যে জোর গলায় নিজেদের নাস্তিকতা বা অজ্ঞেয়বাদ ঘোষণা করে তা নয়। তারা বরং উদাসীন। লাতিন আমেরিকা বোধ হয় ক্যাথলিক গির্জার শেষ বা সব চেয়ে শক্ত দুর্গ। সে জন্যই বোধ হয় একজন লাতিন আমেরিকানকে এবার পোপের পদে আসীন করা হয়েছে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত যা অকল্পনীয় ছিল। ইসলাম রক্তক্ষরণ করছে গৃহযুদ্ধে। শিয়া বনাম সুন্নি, কুর্দ বনাম আরব, ইরান বনাম তুরান, সাথে অনেক কিছু। তুর্কিতে কামাল আতাতুর্কের হাতে গড়া সেকুলারিজ্‌ম বিপন্ন। প্রায় অটোমান যুগে ফিরে যাওয়ার মুখে সে দেশ।

আমাদের দেশে এখন ক্ষমতায় এসেছে এক ধরনের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ। যা কিনা ভারতকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অথবা রূপান্তরিত করবে ''হিন্দু পাকিস্তান''-এ। অন্যদিকে যা গাঁটছড়া বেঁধেছে সব চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের সঙ্গে। ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়।

ধর্ম আকাশ থেকে পড়েনি। সামাজিক, অর্থনৈতিক শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত। আবার ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট সমাজের, এমন কি কিছু পরিমাণে অর্থনীতির ওপরও। ধর্ম বা ধর্মের বিশেষ রূপের সঙ্গে কী ভাবে লড়াই করা যায় , পুরোহিতের বা নাগরিকের ধর্মের ধর্মের জায়গায় বসানো যায় মানবধর্মকে, সেটাই প্রগতিশীল মানুষের চিন্তার বিষয়। ❐

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

ভারতীয় ঐতিহ্যে শিশু : বর্ণপরিচয়ের অন্যপাঠ

কনিষ্ক চৌধুরী

১

ফ্রান্সের শিশু মনোবিজ্ঞানী জাঁ পিয়াজ লিখেছেন, বড়োদের পৃথিবীটি শিশুর কাছে অপরিচিত ও অজ্ঞাত। তাকে ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়, শৈশবের মধুর স্বপ্ন ত্যাগ করতে হয় এবং পৃথিবী যে রূপ আছে ঠিক সেইভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হয়। (উদ্ধৃত: স্তলেতোভ সম্পাদিত, ১৯৮৬:১৭)। পরিবার এই কাজে শিশুকে সাহায্য করে। ভারতে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ঐতিহ্যে পরিবার, বিশেষ করে যৌথ পরিবার, শিশুকে এক উল্টানো পৃথিবীর সাথে আলাপ করায়, অর্থাৎ যেটা যা, সেটাকে সেভাবে দেখায় না। এই পারিবারিক শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র।

২

সাম্প্রতিককালে ভারতীয়ত্ব নির্মাণের যে ঢক্কানিনাদ শুরু হয়েছে তার বৈধতাদানে পারিবারিক সূত্রটি যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা প্রায়শই পর্যবেক্ষকের চোখ এড়িয়ে যায়। তাই সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন আছে। ভারতে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক পারিবারিক ঐতিহ্যে শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত পর্বটি বহুবিধ জটিলতা ও উত্থান-পতনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। ধর্মীয় নির্দেশ ও আচার-আচরণের পাশাপাশি জাত-জাতিগত পরিচয় ও সামাজিক শ্রেণীর মতো নানা উপাদানগুলি এখানে পরস্পরের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালায়।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে ধর্মগ্রন্থগুলির ভূমিকা ইসলামের থেকে কিছু কম নয়। এই ধর্মগ্রন্থগুলিই এই অমানবিক ও বৈষম্যসৃষ্টিকারী ব্যবস্থার বৈধতা যোগায়। পরিবারের মধ্যে এই ধর্মীয় টেক্সটগুলির এক সর্বব্যাপক প্রাধান্য থাকে— দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় অবস্থাতেই। এগুলির মধ্যে দিয়েই চলে indoctrination প্রক্রিয়াটি। অর্থাৎ শিশুকে সুনির্দিষ্ট মতের অধীনে নিয়ে আসা। শিশুকে অভ্যস্ত করে তোলা হয় কোন নির্দিষ্ট ধরনের ভাবনায়। আর এরই মধ্যে দিয়ে শিশুমন স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী মতের প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষা অর্জন করবে। সাম্প্রতিককালের ভারতীয়ত্ব নির্মাণের সাংস্কৃতিক বৈধতা সূত্রের সন্ধান মিলবে এখানেই।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র অনুমোদিত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি হলো— ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারত। ভারতীয় যৌথ পরিবারগুলিতে বেড়ে ওঠা শিশুদের উপর এই গ্রন্থগুলির প্রভাব সীমাহীন। বিশেষ করে শেষ দুটি গ্রন্থের। ঘটনা হলো, এই শেষ দুটি গ্রন্থ আদতে সাহিত্য হলেও তাদের ধর্মীয় তাৎপর্য ও প্রভাব ব্যাপক। প্রথম দুটি হলো সুসংবদ্ধভাবে সংকলিত সামাজিক- রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সূত্র। চরিত্রগত দিক থেকে এরা ভিন্ন হলেও শিশুর indoctrination প্রক্রিয়ায় এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

এই সব সাহিত্যে শৈশবের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রায় সব কটিই নির্দেশসূচক। উপমা, অলঙ্কার এবং বাস্তব উদাহরণের মধ্যে দিয়ে শৈশবের একটি মডেল উপস্থিত করা হয়। মহাভারতে ৩৫০ বার শৈশব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এগুলি হলো জন্ম সংক্রান্ত এবং দৈহিক ও মানসিক গুণপ্রকাশ বিষয়ক। কৃষ্ণর বাল্যকালের প্রসঙ্গ এসেছে বিস্তৃতভাবে। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে শিশু বলতে পুরুষ শিশুকেই বোঝানো হয়েছে, নারী-শিশুকে নয়। শিশুর যে মডেল নির্মাণ করা হয়েছে, তার মূল কারিগর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। পিরামিড-সদৃশ এই সমাজে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ব্রাহ্মণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। (লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণ নারী নয়)। সর্বনিম্নে রয়েছে শিশু। শূদ্র শিশুর স্থান শিশুদের মধ্যে সর্বনিম্ন।

৩

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ঐতিহ্যে পুরুষ শিশুই কাম্য। বাবা-মায়ের পুত্রসন্তান কামনার মনস্তত্ত্বটি স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত সমাজের পরিচয় চিহ্নই বহন করে। স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী বিবাহ সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক। বশিষ্ঠ, বৌধায়ন, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, ''কুমারী অবস্থায় কন্যা যতবার রজঃস্বলা হবে ততবার তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।'' গৌতমের মতটি হলো, ''রজঃস্বলা হবার আগেই কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই।'' (সুর, ১৪০২ বাংলা: ৪৬)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী বা সংসারত্যাগীদেরও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। জরৎকারুর বিবাহ প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ্য। যে বিশ্বাসের সাথে সংসারবন্ধনে আবার জড়িয়ে পড়ার ঘটনাটি দেখা যায়, তা হলো বংশধারা রক্ষার তাগিদ। এর সাথে আবার যুক্ত রয়েছে কর্মফল, পরজন্ম, স্বর্গ-নরক, পারলৌকিক ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে বিশ্বাস ও আচারের প্রতি গভীর আস্থা। এই বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকে স্থান পায়। কর্ম-দ্বারাই স্থির হয় পরবর্তী জন্মে সে কী হবে। মৃত্যুর পর পরলোকে পিতৃপুরুষ তখনই জল ও খাদ্য পায় যখন তা তর্পণের মাধ্যমে বংশধরেরা পূর্বপুরুষের কাছে পাঠায়। তাই বংশধর না থাকলে পরলোকস্থ পূর্বপুরুষের যন্ত্রণার একশেষ। তাই বিবাহ এখানে বাধ্যতামূলক। কারণ বিবাহ ছাড়া সন্তান উৎপাদন সম্ভব হবে না। এখানে সন্তান বলতে অবশ্যই পুত্র সন্তানের কথা বলা হচ্ছে। নারী এ প্রসঙ্গে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। শুধু একটি ক্ষেত্র ছাড়া। পুত্রসন্তান উৎপাদনের জন্যই তাকে প্রয়োজন।

পুত্রসন্তান লাভের নিদান মনুসংহিতায় আছে। মনুর নির্দেশ:

স্ত্রীলোকের ঋতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ষোলো দিন। তার মধ্যে রক্তস্রাবযুক্ত প্রথম চারদিন অতি নিন্দিত। (৩/৪৬, দত্ত, ২০০৮ :৮৩)।

প্রথম চার রাত এবং পরবর্তী এগারো ও তেরোতম রাত— এই ছয়রাত্রি স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দশ রাত স্ত্রী গমনের পক্ষে প্রশস্ত। (৩/৪৭, পূর্বোক্ত)

এই দশ রাতের মধ্যে ছয়, আট, দশ প্রভৃতি যুগ্ম দিনে স্ত্রীগমন করলে যদি গর্ভ হয় তাহলে পুত্র সন্তান জন্মায়। ...সুতরাং পুত্রকামী ব্যক্তি ঋতুকালে যুগ্ম রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করবেন।" (৩/৪৮। পূর্বোক্ত : ৪৮)

৪

বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনে নারীর কোন স্বাধীনতাই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে স্বীকৃত নয়। নারীর পছন্দ-অপছন্দের কোনো মূল্য না থাকলেও শিশুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মাকেই নিতে হয়। শিশুর জীবনে মায়ের দায়িত্ব ও ভূমিকাকে বড়ো করে দেখানো পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদের একটি চমৎকার কৌশল। শিশুকে লালন-পালন করতে গেলে যে কাজগুলি মাকে করতে হয় সেগুলি সামাজিক ক্ষেত্রে শূদ্রের কাজ। তাই এই কাজগুলির কোনোটিই পুরুষ করে না। শিশুকে খাওয়ানো, চান করানো, মলমূত্র পরিষ্কার করা সবই নারীকে করতে হয়। তাই পারিবারিক প্রেক্ষাপটে নারী ও শূদ্র সমার্থক শব্দে পরিণত হয়।

৫

শিশুর চিন্তাজগৎ নির্মাণে গোড়ার দিকে মায়ের ভূমিকা প্রধান হলেও পরবর্তী পর্যায়ে পরিবারের প্রভাবই প্রাধান্য করে। শিশুর বিকাশের এই পর্বটি যা ভবিষ্যতে পরিচয় নির্মাণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে, সেটির অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে।

ভারতে যৌথ পরিবারের পাশাপাশি দম্পতি পরিবারও দেখা যায়। গোটা সমাজটাই যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক তাই পরিবারগুলিও এর প্রভাবের বাইরে নয়। আদিবাসী সমাজে কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক উভয় ধরনের পরিবারই দেখা যায়। ভারতে মাতৃতান্ত্রিতার একটি গৌরবময় ও তাৎপর্যময় ভূমিকা অতীতে থাকলেও বর্তমানে একেবারেই তা গৌণ ও প্রান্তিক। দম্পতি পরিবারগুলির ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের থেকে অনেক বেশি মুক্ত পরিসরের সন্ধান মিললেও, সেগুলি পিতৃতান্ত্রিকতার খপ্পর থেকে মুক্ত নয়। যৌথ পরিবারের বহু বৈশিষ্ট্যই দম্পতি পরিবারে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। তাই যৌথ পরিবারে শিশুর বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে চেষ্টা করাই শ্রেয়।

যৌথ পরিবারের সদস্যরা একটি বৃহৎ গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের পরিবারে সন্তানোচিত আনুগত্য ও ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি যৌক্তিক হয়ে পড়ে, কারণ সদস্যরা পৈত্রিক (সাধারণ) বাসস্থানে বাস করে এবং একই অর্থনৈতিক সামাজিক ও আচারগত (কুলাচার) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকে। পিতামাতা, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুত্রেরা ও তাদের শিশুরা একই বাড়িতে থাকে, একটি সাধারণ রান্নাঘর ব্যবহার করে এবং তাদের সম্মিলিত উপার্জন পরিবারের কর্তার দ্বারা বণ্টিত হয়। এদের সাথে বিধবা ভগ্নী, মাসী, পিসি ও দূরসম্পর্কের পুরুষ আত্মীয় যাঁরা কাকা/জ্যাঠা নামে পরিচিত হন, তাঁরা স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। তবে অঞ্চল ভেদে এর তারতম্য দেখা যায়, এখানে যৌথ পরিবার বলতে বোঝানো হচ্ছে মূলত পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিসমূহের একত্রে বসবাস করাকে।

যৌথ পরিবার যেহেতু একটি বৃহৎ গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে তাই তাকে সদস্যদের যৌথ কল্যাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও গোষ্ঠীগত সংহতির কাজটি করতে হয়। এই গোষ্ঠী সংগঠনটি কোন্ পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করবে তা নির্ধারিত হয় সংগঠনের মধ্যেকার শ্রমবিভাজনের রূপ, পরিবারের লক্ষ্যপূরণে সদস্যদের সহযোগিতা, সম্পর্ক ও ভূমিকার উপর। অন্যান্য সংগঠনের মতোই এখানে সমস্যার সমাধান করা হয় একটি ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত কাঠামোর ভিত্তিতে। সদস্যদের ভূমিকার ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস নির্ধারিত হয় বা বৈধ হয় ঐতিহ্য ও সামাজিক অনুমোদন দ্বারা। এটা ঘটে কেবল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তাই ভারতীয়দের কাছে উর্ধ্বতন ও নিম্নতনের মধ্যেকার সম্পর্ক চিরসত্য বলে মেনে নেওয়া হয় এবং নৈতিক দিক থেকে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হয়। ভারতীয় পরিবারে এই সম্পর্কটি আপেক্ষিক। এক ব্যক্তি যেমন অন্যের তুলনায় উচ্চমর্যাদার অধিকারী, তেমনি আর এক জনের তুলনায় নিম্নমর্যাদাভুক্ত। সামাজিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের বন্ধন থেকে পারিবারিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস কখনই মুক্ত নয়। এবং উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। শৈশব থেকে শিশু এই স্তরায়িত পারিবারিক কাঠামোয় উর্ধ্বতন ও নিম্নতন সম্পর্কের সাথে পরিচিত হয়। পরিচিত হয় কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সাথে।

পরিবারের এই ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের সাথে যুক্ত থাকে বয়স ও লিঙ্গের ধারণা। এই পরিবারে বয়স্করা কমবয়স্কদের তুলনায় স্বাভাবিক আনুগত্য লাভ করে। আবার পুরুষ নারীর তুলনায় বেশি কর্তৃত্ব লাভ করে। যৌথ পরিবারে বড়ো দাদা ছোটো ভাই ও অন্যান্যদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে। বাবার পরেই বড় দাদা। ভবিষ্যতে তিনিই পরিবারের কর্তা হবেন। পরিবারের নৈতিক ও আচার-আচারণগত নেতৃত্বই কেবল তার হাতে থাকে না, পরিবারের অর্থনৈতিক কল্যাণের দায়িত্বও তার উপর থাকে। ভাইপো, ভাইঝিরা জ্যেঠার প্রতি আনুগত্য জানাতে বাধ্য থাকে। এটা তাদের সন্তানোচিত দায়িত্ব।

পরিবারে নারীর অবস্থান নির্ভর করে তার স্বামীর অবস্থানের উপর। গৃহকর্তার স্ত্রী পরিবারের গৃহ বিষয়ক কাজে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ভোগ করে। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্য, বিশেষ করে গৃহকর্তার ভাইদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সে এই ধরনের গুরুত্ব পায় না। ছোটো বোনের উপর বড়দাদার কর্তৃত্ব খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বলা যায়, পরিবারে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকে প্রধানতম পুরুষের, যিনি সকলের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পান। অন্যদিকে নারীর মর্যাদা নির্ধারিত হয় পুরুষের সাথে সম্পর্কের নিরিখে। এই কাঠামো ও সদস্যদের ভূমিকা নির্ধারণে ধর্মীয় ঐতিহ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থার সাথে এই পরিবার ব্যবস্থার একটি গভীর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক আছে। যজমানী ব্যবস্থা, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কেবল ব্যবসায়িক লেনদেন বা শিক্ষাগত দিকগুলির উপর নয়, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সরকারের সর্বোচ্চ আমলাতন্ত্রের মধ্যেও এ শিকড় চাড়িয়ে গেছে। উচ্চ-নিম্ন সম্পর্কের এই ধারণার সাথে শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটে পরিবারের মধ্যে। পরিবারগুলির মধ্যে সাম্য ও গণতন্ত্রের কোনো সম্পর্কই থাকে না। এক চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদী পরিবেশ এখানে বজায় থাকে। ফলে পরিবারের সদস্যরা হয় আদেশ-নির্দেশের মধ্যে দিয়ে অন্য সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করে অথবা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে প্রশ্নহীন আনুগত্য দাবি করা হয়। সন্তান-সন্ততিরা বাধ্য থাকে বয়স্ক পুরুষ কর্তাকে মেনে চলতে, নিঃশর্ত আনুগত্য দিতে। স্বাধীনতা শব্দটি এখানে এক অজানা দ্বীপের মতো। আর এরই পরিণতিতে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ প্রতিহত হয়। থেকে যায় অপ্রাপ্তবয়স্কতার স্তরে, যেখানে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে কোনো স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয় না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই অনুশীলন একটি সামগ্রিক সামাজিক আবদ্ধতার জন্ম দেয়।

ভারতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণে এই ধরনের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের নীতিটি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এবং এটা আবার আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থবিরতার অন্যতম উৎস। আধুনিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যেহেতু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, তাই তার প্রয়োজন অনেক বেশি নমনীয় ও সাম্যমূলক কাঠামো। এই কাঠামোয় সম্পর্ক নির্ধারিত হবে উদ্যোগের সামর্থ্য দ্বারা এবং বয়সজনিত বৈধতার থেকে দক্ষতা কর্তৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। পাশাপাশি সংগঠনটিকে হতে হবে অ-বলপ্রয়োগমূলক ও বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক ভিত্তিক। তাহলেই অল্পবয়স্করা সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে। এরই বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় যৌথ পরিবার, এখানে অল্পবয়স্কদের কথা ধৈর্য্য ধরে সব সময় শোনা হয় না। কখনো-সখনো শোনা হলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে তাদের মতামত কোনো গুরুত্বই পায় না। অল্পবয়স্করা এইভাবে মেনে চলতে অভ্যস্ত হওয়ায় বয়সজনিত কোনো সংঘাত সচরাচর এখানে দেখা যায় না। শৈশব থেকেই তরুণ পেশাদার আমলারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে স্তরায়িত সামাজিক ঐতিহ্যের সাথে। ফলে তাদের মধ্যে এই সংক্রান্ত ক্ষোভ বা ক্রোধের আবির্ভাব প্রায় ঘটে না বললেই চলে। বরং তারা অপেক্ষা করে সেই দিনগুলির জন্যে, যখন তারা বয়স্ক হবে এবং অল্পবয়স্কদের নিঃশর্ত আনুগত্য ভোগ করতে পারবে।

৬

শিশুর পরিচয় নির্মাণের সাথে আরও একটি জরুরি দিক হলো বর্ণ-জাত-জাতিগত দিক। অর্থাৎ পরিবারটির জাতি (কাস্ট) পরিচয়। শিশুর জন্মগত পরিচয়ই এখানে মুখ্য। আর একটু অন্যভাবে বললে, জাতিভিত্তিক স্তরায়িত সমাজে অর্জিত মর্যাদা নয়, আরোপিত মর্যাদাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা যে, জাতিগতভাবে বিশেষ পেশাই শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হলে গ্রহণ করবে। তার ব্যতিক্রমকে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না। বিবাহের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম। শিশু পরিবারের মধ্যে বড় হওয়ার সুবাদে জেনে যায় ও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, সবর্ণ বিবাহই সঠিক। উচ্চবর্ণ তো বটেই, নিম্নবর্ণভুক্ত মানুষেরাও এই ভাবেই ভাবেন।

বিভিন্ন জাতির শিশুদের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ও ভঙ্গুর। কোথাও কোথাও শ্রেণী-ঐক্যও পর্যুদস্ত হয়ে যায় জাতিগত সম্পর্কের তাড়নায়। এক গুচ্ছ অলিখিত নিয়ম তাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে, যা তাদের মধ্যে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দূরত্ব তৈরি করে দেয়। এই মেলামেশার সম্পর্কগুলি মূলত ও প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয় যৌথ পরিবারের দ্বারা। শুধু উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রেই নয়, নিম্নবর্ণের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা শিশু মনে প্রবেশ করে পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই। এর সাথে যুক্ত হয় স্পর্শ, দৃষ্টি ইত্যাদি দূষণ সংক্রান্ত ধারণা। শিশু পরিবারের বড়োদের থেকে শেখে কোন্ জিনিস কখন পবিত্র থাকে, কখন থাকে না। কোন্গুলি স্থায়ীভাবে অপবিত্র, কোন্টি শুদ্ধ, কোন্ জিনিসকে কখনও স্পর্শ করা যায়, কখনও যায় না ইত্যাদি। পরিবারের বড়োরা যে কেবল এগুলি অনুশীলন করে তাই নয়, শিশুদেরও বাধ্য করে সেগুলি করতে। যেমন খাওয়ার পর হাত মুখ ধোয়ার অভ্যাস। এখানে স্বাস্থ্যবিধির থেকে হাত ধোয়াটির বিষয়টি ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ভাবনায় আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক। যেমন এঁটো মুখে/হাতে উপাসনার কাজ করা যাবে না। 'এঁটো' এখানে অপবিত্রতার প্রতিনিধিত্ব করে। নারীর ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ আরও কঠোর। ঋতুকালীন সময়কে অপবিত্রতার সময় বলে চিহ্নিত করা হয়। নারীরা এই সময় কোনো মঙ্গলজনক বা পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বিধবাদের তো স্থায়ীভাবে দূষণকারী বলে মনে করা হয়। শৈশব থেকেই শিশু এই সব দেখে। আর তাদের মনোজগতে এই আচারগুলি পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেয়। অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে এই কু-আচারগুলি এক ধরনের বৈধতা পেয়ে যায়। ফলে এই ধরনের ভাবনাপ্রবাহ একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয়।

৭

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজে ব্রাহ্মণ সহ উচ্চবর্ণগুলি প্রাধান্যের আসনে থাকে। আর তাই তাদের অনুসরণ করাই হলো সমাজের

(তথাকথিত) নিম্নবর্ণের দায়িত্ব। মনুর নির্দেশ হলো :

> অন্যান্য কর্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করাই হলো শূদ্রের প্রকৃষ্ট কর্ম। (১০/১২২-২৩, দত্ত, ২০০৮:২৫৭)।
>
> আশ্রিত শূদ্রকে ভক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অন্ন দেবেন, পরিধানের জন্য জীর্ণ বস্ত্র দেবেন, শয়নের জন্য পুরনো শয্যা দেবেন এবং ধানের পুলাক অর্থাৎ আগ্না ক্ষুদ, কুঁড়ো প্রভৃতি দান করবেন। (১০/১২৪-২৫। পূর্বোক্ত)।

মনুর আরও নির্দেশ হলো:

> শূদ্রকে কখনই অর্থ সঞ্চয় করতে দেওয়া যাবে না। কারণ তারা ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করবে। (১০/১২৯। পূর্বোক্ত)।

মনুসংহিতা ক'জন আর পড়েছে? তবুও মনুর নির্দেশগুলিকেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুশীলিত হতে দেখা যায় যৌথ পরিবারগুলিতে। সামাজিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের মধ্যে, সম্পত্তি-সম্পর্ক ও ভূ-সম্পর্কের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই ভাবনার, এই মনোভাবের উৎসস্থল। আর তা অনুশীলিত হয়ে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। প্রায়শই মনে হয়, এ-মনোভাব যেন অপরির্তনীয়। ফলে এই মনোভাবের বস্তুগত শর্তগুলি অপসারিত হলেও তা বড়জোর দুর্বল হয়, অপসারিত হয় না। শুধু টিকেই থাকে না, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়ে তা পুনরুজ্জীবিত হয়, হয়ে ওঠে আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী।

ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির বাইরে শূদ্ররাও এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক মডেলকে অনুসরণ করে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এটিকে বলেছেন 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাম্রাজ্যবাদী ধারা'।

তিনি লিখেছেন :

> ভারতে ব্রাহ্মণ্য আচার ও অনুষ্ঠানসমূহ অনুকরণ করা একটা পুরাতন রীতি। যে যত বেশি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের চালচলন নকল করিবে, সে তত বেশি ভালো 'হিন্দু' বলিয়া সম্মান পাইবে; ইহাই হইতেছে হিন্দু-সমাজতত্ত্বের একটি তথ্য! এই উপায়েই আদিম জাতীয় কৌমধর্মীয় (tribal religion) লোকেরা ক্রমশ ভালো এবং জলচল হিন্দুরূপে পরিগণিত হইতেছে এবং অবস্থানুসারে ''সূর্য্যবংশী'' ও ''চন্দ্রবংশী'' রূপে বিবর্তিত হইতেছে। ...কায়স্থ ও বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ্যবাদের সকল আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন। (দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, ২০০৭: ১০০)।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এম এন শ্রীনিবাসের গবেষণায় ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়। শ্রী নিবাস ও চট্টোপাধ্যায় এই প্রক্রিয়াটি সংস্কৃতায়ন নামে চিহ্নিত করেছিলেন। শ্রীনিবাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী, নিম্নবর্ণ বা উপজাতি গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতায়ন নামক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্ণ বা দ্বিজদের আচার, প্রথা, মতাদর্শ ও জীবনধারার অনুসরণ করে নিজেদের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটায় এই লক্ষ্যে যে, যাতে করে তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমবর্ণ-জাতিভুক্ত মানবগোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর মর্যাদালাভের দাবি করতে সক্ষম হয়। (শ্রীনিবাস, ২০০১:৬)

শিশু যে পরিবারে বেড়ে ওঠে, তা ব্রাহ্মণ পরিবার না হলেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের হাত থেকে তার মুক্তি নেই। কারণ সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটি চলে গোটা গোষ্ঠী জুড়ে বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের একটি অংশ জুড়ে। পরিবারগুলি এই গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। অন্যথায় তারা একাকী ও দুর্বল হয়ে পড়বে। দক্ষিণ ভারতের 'কুর্গ'দের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কুর্গদের মধ্যে মূল গোষ্ঠী বলতে 'ওক্কা'কে বোঝায়। ওক্কার বাইরে কোনো কুর্গ ব্যক্তির কথা কল্পনাই করা যায় না। 'ওক্কা' ছাড়া ব্যক্তির সামাজিক অস্তিত্বই থাকে না। বিবাহ বন্ধনের ফলে জাত শিশু যাতে তার বাবা কিংবা মায়ের 'ওক্কা'র অন্তর্ভুক্ত হয় তার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠরা সব সময়ই চাপ তৈরি করে। (শ্রীনিবাস, ১৯৫২)

৮

জনগণনার প্রতিবেদনের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যৌথ পবিবারগুলি অর্থনৈতিক কারণ ও নানাবিধ চাপের মুখে ভেঙে পড়ছে। ফলে ভারতীয় যৌথ পরিবারগুলি আর যৌথ পরিবার হিসেবে থাকতে পারছে না। আবির্ভাব ঘটছে বহু সংখ্যক দম্পতি পরিবারের। এটা সত্য। কিন্তু এও সত্য যে যৌথপরিবারের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বহু ক্ষেত্রেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারছে— এমন কি দম্পতি পরিবারের মধ্যেও। এখানেও শিশু যে সব আচার-আচরণ ও মনোভাবের সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, সেগুলি যৌথ পরিবারের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়— ১. পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব; ২. জাতি-বর্ণগত পরিচয়; ৩. ধর্মগত পরিচয়; ৪. সন্তানের কাছে পিতা-মাতার শর্তহীন আনুগত্যের দাবি; ৫. পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা; ৬. গুরুবাদী ভাবনা; ৭. ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মতাদর্শ, এবং এই রকম আরও বহু কিছু। অর্থাৎ যৌথ পরিবারে শিশুর যে ব্যক্তিত্বহীন, প্রশ্নহীন বিশ্বাসে অভ্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলে, বর্তমানে বিকশিত পরিবারগুলিতেও তার অন্যথা হয় না।

৯

পরিবারের এই ভয়ঙ্কর প্রভাব ভারতে বহু বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও বিপ্লবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত পরিবারগুলি শ্রেণীভিত্তিক সমাজের অন্যতম সেফ্‌টি ভালব হিসেবে কাজ করে। শুরুতেই শিশুর মনের মধ্যে চিন্তার জগতে এমন পঙ্গুত্ব এনে দেয় যা সারাজীবন ধরে তাকে বহন করতে হয়। শুরু থেকেই একটি খর্বিত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। তৈরি হয় না স্বাধীন চিন্তা, প্রশ্ন করার সাহস। অভ্যস্ত হয় সব কিছু মেনে নিতে। আত্মসমর্পণের মধ্যে পায় একাকীত্ব থেকে মুক্তির পথ। তার মধ্যে জন্ম নেয় এক ধরনের fear of freedom, যার থেকে সারাজীবন সে মুক্ত হতে পারে না। ❐

এর পর ৯৯ পৃষ্ঠায়

ভারত-ইতিহাস চর্চা

ইতিহাসের পাঠ্যবই ও সঙ্ঘ পরিবার

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৪ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার আসীন হবার পর থেকেই বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক ও মনন জগতে যে ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এসেছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তার প্রকাশ রাতারাতি ঘটেনি। এর সূত্রপাত সেই ১৯৭৭ সাল থেকে যখন কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের পরাজয়ের পর অন্যান্য কিছু দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে গঠিত হয় জনতা দলের সরকার। সেই জনতা দলের অন্যতম শরিক ছিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ দলটি— যেটি পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৭ সালেই ইতিহাসের নিম্নলিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলির উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেমে এসেছিল—

১. প্রাচীন ভারত : ড. রামশরণ শর্মা।

২. মধ্যযুগের ভারত : ড. রমিলা থাপার।

৩. ভারতে আধুনিক যুগ : ড. বিপন চন্দ্র।

৪. আমাদের মুক্তিসংগ্রাম : ড. বিপন চন্দ্র, ড. অমলেশ ত্রিপাঠী ও ড. বরুণ দে।

৫. ভারত-ইতিহাস রচনায় সাম্প্রদায়িকতাবোধ : ড. রমিলা থাপার, ড. হরবন্স মুখিয়া ও ড. বিপন চন্দ্র।

প্রথম তিনটি গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন এনসিইআরটি অর্থাৎ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং। চতুর্থটি প্রকাশ করে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। শেষ বইটি প্রকাশক ছিলেন পিপল্স পাবলিশিং হাউস। অধ্যাপক সুশোভন সরকার সে সময় লিখেছিলেন, বইগুলির বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি তোলা হয়েছিল তার মধ্যে কিছু অভিযোগ ভিত্তিহীন। যেমন, গুরু গোবিন্দ সিং, মারাঠা শক্তি, সর্দার প্যাটেল ইত্যাদিকে দু-চার লাইনে (মারাঠাদের বেলা দু-চার পাতায়) বিদায় দেওয়া হয়েছে— কথাগুলি ঠিক নয়। তাছাড়াও ''পৃথ্বীরাজ, রাণা প্রতাপ, শিবাজী নিশ্চয়ই বীর যোদ্ধা, কিন্তু তাঁদের ন্যাশনাল হিরো বলে তুলে ধরা কি ঐতিহাসিকদের কাজ? আঞ্চলিক স্বাধীনতা রক্ষা কি জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই? মধ্যযুগে ফিউডাল আমলে কি ভারতীয় 'নেশন' বাস্তব সংজ্ঞা ছিল? কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শিথিল হওয়া মাত্র স্থানীয় মুসলিম শাসকেরাও তো দিল্লীর আধিপত্য ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করত।''

আর এস শর্মা লিখেছিলেন, প্রাচীন হিন্দু সমাজে গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না। এটা শুধু যে ঐতিহাসিকভাবে সত্য শুধু তাই নয়, বহু মনীষী ও ঐতিহাসিক-পুরাতত্ত্ববিদ অনেক দিন আগে থেকেই এ কথা বলে আসছেন। শর্মা আরও বলেছিলেন যে প্রাচীন ভারত শ্রেণী-বৈষম্য বর্জিত সমাজ ছিল না। এগুলিই ছিল তাঁর অপরাধ। আধুনিক ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে জাতীয় কংগ্রেসের এক্সট্রিমিস্ট নেতারা ঐক্যসাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দু ধর্মীয় প্রতীকের অযথা ব্যবহার করে তাঁরা মুসলমান জনসমাজকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যাদির নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর মতে এই বক্তব্য পেশ করা ছিল অপরাধের সমতুল্য।

অন্য যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল সেটি হলো ভারতে মুসলিম শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে। খুঁটিনাটি বিষয়ে না গিয়েও বলা যায় যে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মুসলিম শাসনকে শুধুমাত্র হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অতি-সরলীকৃত বর্ণনা দেওয়াটাকে মনে করেছিলেন অনৈতিহাসিক কাজ। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের মূল কারণ হিন্দুদের উপর অত্যাচার— আধুনিক গবেষণা (আলিগড় স্কুল) এর বেশ কিছু আগেই একে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছিল।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব যে মোটেই বৈদেশিক শাসন ছিল না, সেটাও ঐতিহাসিকেরা তুলে ধরেছিলেন। তারা বলেছিলেন যে মুসলমান বিজেতারা যদি বহিরাগতই হন, তাহলে বৈদিক আর্যরাই বা কী ছিলেন। মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছিল, হিন্দু বিজয়ীরা কি অনার্যদের ওপর, বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করেনি? সর্বোপরি মুসলমানরা দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিদেশে চালান দিত না, যা ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই বইগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ১৯৮০ সালে, সরকার বদলের পর।

ইতিহাস চর্চার ওপর সংঘ পরিবারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ নেমে আসে ১৯৯৮ সাল থেকে যখন সরাসরিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত এনডিএ সরকার কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতা দখল করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দশ বছরের (১৯৩৭-৪৭) ইতিহাসের সরকারি ও বেসরকারি যাবতীয় দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংকলন করে দশটি খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ (আইসিএইচআর)। প্রকাশনাটির শিরোনাম ছিল 'টুওয়ার্ডস ফ্রিডম'। এই প্রকল্পের দুটি খণ্ড সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন দুই ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক কে এন পানিক্কার ও অধ্যাপক

সুমিত সরকার।

১৯৯৮ সালে আইসিএইচআর-এর সভাপতি ঐ খণ্ড দুটি প্রকাশ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব-প্রকাশিত প্রয়াত অধ্যাপক পার্থসারথি গুপ্ত সম্পাদিত খণ্ডটি সম্বন্ধে চরম অশালীন ও অবমাননাকর মন্তব্য করেন তিনি। ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা এ প্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন, ''এর আসল কারণ হচ্ছে এই দুটি খণ্ডে এবং প্রয়াত অধ্যাপক পার্থসারথি গুপ্ত সম্পাদিত খণ্ডেও অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল পর্বে হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। তার ফলে তাদের আর কোন মতেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে গণ্য করা যায় না। তাদের সংগঠনই হত্যা করেছিল মহাত্মা গান্ধীকে।'' অধ্যাপক সুমিত সরকারও এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে এই বিষয়টির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

যাই হোক, আইসিএইচআর-এর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমগ্র দেশজুড়ে বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সমাজ, ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা মুখর হয়ে ওঠেন। এই প্রকল্পটি নিয়ে তৎকালীন সভাপতি বি আর গ্রোভার যে মিথ্যাচার ও কুৎসার আশ্রয় নেন তার বিপক্ষে 'টুওয়ার্ডস ফ্রিডম' প্রকল্পের সাধারণ সম্পাদক এস গোপাল প্রকাশ্য বিবৃতি দেন ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ। সেই বছরই ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সম্পাদক শিরীন মুসভির বিবৃতি প্রকাশিত হয়। কলকাতার সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের বিবৃতি প্রচারিত হয় ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০০-এ বহু স্বাক্ষর-সম্বলিত হয়ে। প্রায় একই সময় দিল্লীর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। আলাদা করে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য্যের বিবৃতি। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা প্রয়াত ঐতিহাসিক পার্থসারথি গুপ্তের স্ত্রী নারায়ণী গুপ্ত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ এক দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র পাঠান। দিল্লীর অনেক সংবাদপত্রে তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়। স্টেটসম্যানে প্রকাশিত ২৪ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে অধ্যাপিকা নারায়ণী গুপ্ত এক দুই করে পার্থসারথি গুপ্তর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি এবং ৭ মার্চ ২০০০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হল ও শতবার্ষিকী সভাঘরে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ– যৌথ উদ্যোগে। এমন কি Citizens in Defence of Democracy ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ মান্ডি হাউস থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত এক দীর্ঘ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেছিলেন।

২০০৪ সালের নির্বাচনে এনডিএ সরকার পরাজিত হবার পর কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করে মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এই মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিতর্কমূলক বিষয়গুলি নিয়ে কোনো স্পষ্ট বা স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং কয়েক জন ইতিহাসবিদকে অনুরোধ করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিকল্প ইতিহাস পাঠ নির্বাচন ও নির্ধারণ করতে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, ''বিগত জমানার প্রবর্তিত (গৈরিক ইতিহাসের) বিষক্রিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঝেড়ে ফেলতে হবে।'' এই সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে সুমিত সরকার বলেন, ''অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সরল প্রত্যাবর্তনের বৃত্তে সীমিত রাখা সঙ্গত হবে না। আজ যদি আমরা জোশীর অনুগত লেখকদের হটিয়ে এক লহমায় অতীতের সেই বইগুলিকেই আবার বেছে নিই, অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠবে। ...এই বইগুলি যে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে লেখা হয়েছিল শুধু তাই নয়। Pedagogy বা শিক্ষাতত্ত্বের প্রশ্নটি আজকের বিকল্প সন্ধানের সঙ্গে যুক্ত। বইগুলিকে ঘিরে কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বড় বেশি তথ্যের সমাবেশ বইগুলিকে অযথা দুর্ভার করে তুলেছে। রচনাশৈলীও মাঝে মধ্যে একঘেয়ে।'' বিকল্প নির্মাণ পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে কী হতে পারে - এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক সুমিত সরকার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেন, ''যেমন মধ্যপ্রদেশের বেসরকারি উদ্যোগ একলব্য প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে তথ্য বিশ্লেষণ এবং শৈলীর সুবিন্যাস ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করবে।... সম্প্রতি দিল্লী সরকারের উদোগে অধ্যাপক কৃষ্ণবাহাদুরের নেতৃত্বে যে পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তার মানও সত্যি প্রশংসনীয়। যেমন ধরা যাক, কুমকুম রায় আর নারায়ণী গুপ্ত-র লেখা বই দুটি। কুমকুম রায়ের বিষয় প্রাচীন ভারত আর নারায়ণী গুপ্তের বিষয় আধুনিক ভারতের ইতিহাস। এই বই দুটির অভিনবত্ব ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসচর্চার প্রতি মনোযোগী করে তুলবে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করে, পাঠকদের জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন সাজিয়ে তাঁরা নতুন প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। নারায়ণী গুপ্ত ১৭২০ থেকে ২০০০ এই দীর্ঘ পর্বটির ইতিহাস লিখেছেন, যে পর্বের মূল লক্ষণই ব্যাপক পরিবর্তন।'' সুমিত সরকারের মতে ''জোশী বা সুদর্শন শুধুমাত্র মার্কসবাদ প্রভাবিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আদৌ ঠিক হবে না। সত্যি বলতে, গত পঞ্চাশ বছরে ইতিহাসের তত্ত্ব, গবেষণা, পাঠ, মূল্যায়ন এই বিরাট বৃত্তে যে চমকপ্রদ বিস্তার ও অগ্রগতি ঘটেছে, সঙ্ঘ পরিবার পুরোপুরি তার বিরুদ্ধে।''

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা মোকাবিলা করার ব্যাপারে ইতিহাসবিদ অশীন দাশগুপ্ত শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছিলেন, ''শিক্ষা কারা দেবে, সেকথাটাও ভাবতে হয়। যে সমস্ত লোকেরা শিক্ষা দেবে, তারা যদি নিজেরাই

সাম্প্রদায়িক হয়, তাহলে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতা কাটে না। শিক্ষিত লোক হলেই যে সমস্যার উর্ধ্বে থাকবেন, তার কোনও মানে নেই। ভেবে দেখুন, যাঁরা হিন্দু মুসলমান এইভাবে ভাবেন তাঁদের মধ্যে তো প্রচুর শিক্ষিত লোক আছেন। ...উকিল, ডাক্তার, মোক্তার কোনদিকেই কম নেই। পাঠ্যপুস্তক পালটে শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টানো যায় না। শিক্ষক যদি ইচ্ছা করেন তা হলে 'সত্য' কী বলে দেবেন। পাঠ্যপুস্তক দিয়ে এ ধরনের ক্ষেত্রে কোনও লাভ হয় না। কাজেই, শিক্ষা দিয়ে যে আপনি মানুষ তৈরি করবেন, এ আশা বৃথা। অনেক লোককে সাক্ষর করা যায় এবং করাই উচিত। কিন্তু সেই শিক্ষা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, যে শিক্ষায় মনের প্রসার হবে।''

২০১৪-১৫ সালে যে ধর্মীয় মৌলবাদের সামগ্রিক আগ্রাসন শুরু হয়েছে, তা শুধুমাত্র ইতিহাস চর্চার জগতে সীমাবদ্ধ নেই, সমগ্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলকে তা কলুষিত করছে, সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা, সংখ্যালঘু উৎপীড়ন, গো-রক্ষা আন্দোলন ইত্যাদি অনেক কিছুই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তবে সুমিত সরকারের মতে, ''এইবারে যেন একটা সুস্পষ্ট মতাদর্শ এবং পদ্ধতিগতভাবে অনেকটা সংহতভাবে ইতিহাসবিদ এবং তাদের গবেষণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর পরের পর আক্রমণ হচ্ছে।'' অতীতের কথা তো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। কিন্তু বর্তমানে যতটা নগ্নভাবে এবং নিয়মিতভাবে ইতিহাস গবেষণার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক আক্রমণ শুরু হয়েছে সেটা খুব উদ্বেগের বিষয়। কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন ইতিহাসবিদ রজতকান্ত রায়। তাঁর মতে, ''ইতিহাসের জগতে বৌদ্ধিক স্তরে বিজেপি বা আরএসএস-এর কোনো বিশেষ প্রতিপত্তি নেই ...ভারতের ইতিহাস চর্চার জগতটা বিরাট। এবং মোটামুটিভাবে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।''

বর্তমানে শাসক দল একদিকে বল্লভভাই প্যাটেল, নাথুরাম গড্‌সে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করছে, জন্মশতবার্ষিকী, ১২৫ বছর ইত্যাদি মহাসমারোহে পালন করছে, অথচ মূর্তি প্রতিষ্ঠা দূরে থাক বিস্মৃতির অতলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আনসারী, শরৎচন্দ্র বোস প্রভৃতিদের। অন্যদিকে তারা কো-অপ্ট করতে চাইছে আম্বেদকর, সুভাষচন্দ্র বোস, এমন কি ভগৎ সিংকেও। আর চাইছে মহাকাব্যে, পুরাণ আর উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে ভারত ইতিহাস রচনা করতে। নতুন করে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে 'জাতীয়তাবাদ', 'দেশপ্রেম', 'ভারতমাতা', 'বন্দেমাতরম' ইত্যাদি ধারণা (কনসেপ্ট) ও বর্গগুলিকে (ক্যাটাগরি) ঘিরে। এই ধারণা ও বর্গগুলিকে নিয়ে তৃণমূলস্তরে সহজ ভঙ্গি ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট আলোচনা চক্র, বিতর্কসভা, মাঝে মধ্যে কোন বিশেষজ্ঞকে এনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলাপ আলোচনা ব্যবস্থা করাটা আজকে আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গুজরাটের বিদ্যালয়গুলিতে এনসিইআরটি-র টেক্সট বহাল রেখেও পাশাপাশি চালু রেখেছে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' নামক এক শিক্ষাক্রম। বহু বছর ব্যাপী চিন্তাধারণা এবং পরিশ্রমের ফসল এই হিন্দু শিক্ষাক্রম। এমন কী আরএসএস যখন নিষিদ্ধ ছিল তখনও শিক্ষাদানের বিষয়টি অটুট ছিল। তাই আবারও সুমিত সরকার ও তনিকা সরকার জানাচ্ছেন, ''আমাদের দেশে হিন্দুত্ব শিক্ষাক্রমের ইতিহাসের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াস ও পরিকল্পনা যুক্ত। আরএসএস ও তার শাখা সংগঠনগুলি যে বীজ বপন করেছিল আজ তা মহারণ্যে পরিণত। পরিতাপের বিষয় হল, অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী এতটা গভীর ও সুসংহতভাবে শিক্ষা প্রচারে নিয়োজিত হয়নি। এমনকি কমিউনিস্টরাও নয়। অন্যভাবে বললে বিজেপি যেমন 'ভিক্টরি বাই ডিফল্ট' অর্জন করেছে, ঠিক তেমনই শিক্ষা ক্ষেত্রে সঙ্ঘ পরিবার ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে। পার্থক্যটিকে একটি বাক্যের সাহায্যেই বর্ণনা করা যায়— বামপন্থীরা শুধু সেমিনার করেছে, কিন্তু অন্যদিকে আরএসএস গড়ে তুলেছে একটি পর একটি শিক্ষাকেন্দ্র।'' কীভাবে আমরা এই সমস্যার মোকাবিলা করব, কীভাবেই বা গড়ে তোলা যাবে এর বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক ও মনন জগতের প্রতিরোধ— এই বিষয়গুলিই উদারনৈতিক মানবতাবাদী প্রগতিশীল- গণতান্ত্রিক-বামপন্থী শিবিরকে ভাবিয়ে তুলছে। ❐

তথ্যসূত্র

১. 'প্রগতিশীল ইতিহাস-চর্চার উপর ''হিন্দুত্বের'' আক্রমণ', সুশোভন সরকার (*পরিচয়*, ডিসেম্বর ১৯৭৭)। এই লেখাটির ইংরেজি ভাষ্য Crusade Against Modern Historians প্রকাশিত হয়েছিল Amrita Bazar Patrika, 23 November 1977, Calcutta Edition-এ।
একই বছরে *বীক্ষণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল গৌতম ভদ্র-র প্রবন্ধ, 'পড়ার বই, কম্যুনিস্টরা ও জনতা সরকার— একটি বিতর্ক'

২. *'টুওয়ার্ডস ফ্রিডম— বিকৃতি ও কুৎসা বনাম তথ্য ও সত্য'*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ৭ মার্চ ২০০০

৩. 'পুরনো ইতিহাস বই ফিরিয়ে আনা নয়, চাই নতুন ভাবনা', সাক্ষাৎকার, ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার, *আনন্দবাজার পত্রিকা*,- ৬ জুলাই ২০০৪

৪. 'সম্প্রদায়ের দায়', অশীন দাশগুপ্ত (*প্রবন্ধ সংগ্রহ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১

৫. আলাপচারী : সুমিত সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, *এই সময়*, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫

৬. আলাপচারী : রজতকান্ত রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার *এই সময়*, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

৭. 'বামপন্থীরা শুধু সেমিনারই করেছে, আরএসএস গড়ে তুলেছে একটির পর একটি শিক্ষাকেন্দ্র', সাক্ষাৎকার, সুমিত ও তনিকা সরকার, *এই সময়*, ১ জানুয়ারি ২০১৫

৮. 'ধর্মীয় মৌলবাদের উৎস সন্ধানে : সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস', অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, *নবান্ন*, বইমেলা সংখ্যা ১৪২২

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

‘ট্রাইব’ এর কথকতা

শুচিব্রত সেন

উৎপত্তির সময় থেকে দীর্ঘকালব্যাপী ‘ট্রাইব’ (Tribe) শব্দটির দ্যোতনা পরিবর্তিত হয়েছে বার বার এবং ঔপনিবেশিক যুগের সূচনাকাল থেকেএকে নিয়ে বির্তকের শেষ নেই। অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে ‘ট্রাইব’ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ এসেছে গ্রীক phylac এবং লাটিন শব্দ ‘ট্রাইবাস’ থেকে। প্রাচীন রোমের তিনরকম বিভাজনকে বলা হতো ট্রাইব। গ্রীসে ট্রাইবরা বিভক্ত ছিল তাদের স্থানিক, ভাষাগত এবং ঐতিহ্য অনুসারে। যেমন আইওনিয়ান, ডোরিয়ান ইত্যাদি। রোমের নাগরিকরা প্রথমে তিন, পরে চার এবং আরো পরে পঁয়ত্রিশ রকমের ট্রাইবে বিভক্ত ছিল। বাইবেলেও ‘ট্রিব’ বা ‘ট্রাইব’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যার অর্থ একটি দল, যা প্রধান এবং তার পারিষদদের দ্বারা পরিচালিত হয়। নিউ টেস্টামেন্টে ‘‘all the tribes of earth’’ বলতে বোঝানো হয়েছে ইস্রায়েল ও মিশরের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে। দেখা যাচ্ছে যে ‘ট্রাইব’ শব্দটির সঙ্গে বিভাজন বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, কিন্তু ঘৃণা বা অবজ্ঞার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ‘ট্রাইব’ সংজ্ঞাটির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আফ্রিকা বা এশিয়াবাসীর জীবনযাপন, ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ইউরোপীয় মানুষ ছিল প্রায় একেবারে অজ্ঞ। এর মূলে ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য ও সভ্যতা সম্পর্কে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, পণ্ডিতদের মধ্যেও এক অহেতুক ঔদ্ধত্য। ঐতিহাসিক ক্যামেরুনের মতে— রেনেসাঁর সময় থেকেই ‘‘Europe throught that she was destined to rule the world’’ (*Early Modern West*, 1970)

ইউরোপীয় রেনেসাঁস নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে এর মধ্যেই আছে সাম্রাজ্যবাদের অভীপ্সা, ইতিহাসের ভাষায় যার নাম ভৌগোলিক আবিষ্কার। সন্দেহ নেই, তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যতার ও প্রযুক্তির উন্নত স্তরে এশিয়া বা আফ্রিকা তখনও পশ্চাৎপদ। এই পশ্চাৎপদতা আরো বেশি করে দৃঢ় হলো উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর। কেননা তার স্বাভাবিক বিকাশ হল অবরুদ্ধ। আফ্রিকা ও এশিয়ার আদিবাসীদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা এদের ‘অসভ্য’ ‘বর্বর’ এবং ‘ট্রাইব’ নামে চিহ্নিত করলেন। অসভ্যতা ও বর্বরতা ‘ট্রাইবে’র সমার্থক শব্দে পরিণত হোল। তাই যখন সুসান ডেভালে বলেন যে ‘‘Tribe is a colonial construction’’ (Susana Devalle : *Discourses of Ethnicity : Cuture and Protest is Jharkhand*, Sage Publications, New Delhi, 1992), তখন নিঃসন্দেহে তা আংশিক সত্যের প্রকাশ ঘটায়। আংশিক বলছি এই কারণে যে এই বক্তব্য আফ্রিকার জনজাতির ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য, ভারতীয় জনজাতির ক্ষেত্রে ততটা নয়। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যে বর্ণপ্রথার কারণে জনজাতিরা ছিল প্রথম থেকেই প্রান্তিক অবস্থানে। ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর লক্ষ্য করলেন যে এই জনজাতিরা বর্ণহিন্দু সমাজের কাছে অপাংক্তেয়, আবার জন-জাতিদের নিজস্ব সামাজিক গঠন বা মূল্যবোধের সঙ্গে হিন্দু সমাজের কোন যোগ নেই। কম-বেশি হলেও জনজাতি সমাজ ছিল সমতাপন্থী এবং জড় বা প্রকৃতি-উপাসক, যা হিন্দু সমাজে আদৌ উপস্থিত ছিল না। উল্লেখযোগ্য যে ঋক্‌বেদের ঋষিরাও ছিলেন প্রকৃতি-উপাসক। মূর্তি পূজার প্রচলন এসেছে অনেক পরে। গ্রামেগঞ্জে আজও পাথর পূজা বিরল নয়, এবং স্বয়ং নারায়ণ শিলাও প্রস্তরখণ্ড। এগুলি জনজাতিদের নিকট থেকে হিন্দু সমাজের গ্রহণ কিনা এ নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। নীহার রঞ্জন রায় ও ক্ষিতিমোহন সেন উভয়েই মনে করেন যে জনজাতিদের অনেক আচার, আচরণ ও প্রথা হিন্দু সমাজ আত্মসাৎ করেছেন কিন্তু সংস্কৃতায়ন নিয়ে যে ধরনের আলোচনা হয়, জনজাতিকরণ বা tribalisation-এর পিঠে আলো পড়ে কম।

এ কথা ঠিক যে এই জনজাতিদের ‘ট্রাইব’ নামকরণ ব্রিটিশরাই করেছিল, কিন্তু জনজাতিদের পূর্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান যে দরকার সে কথা বলা বাহুল্য। ফুকোর power-knowledge তত্ত্বের অনেক আগেই ব্রিটিশরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দেই ওয়ারেন হেস্টিংস বলেছিলেন, ‘‘Every accumulation of knowledge is useful to the state ...it attracts and conciliates distant affection; it lessens the weight of chain by which the natives are held in subjection, and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence .’’ (উদ্ধৃত : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *ফ্রম পলাশি টু পার্টিশান*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৪, পৃ. ৬৮১) সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সার জ্ঞানান্বেষণের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা ও ধর্মান্তকরণ। উভয়ে মিলে আমাদের কাছে ‘ট্রাইবে’র এক বিশেষ সত্তা ফুটে ওঠে। দিকু-জনজাতি সম্পর্কের দ্বৈততা এই গঠনকে আরো শক্তিশালী করে। বলা বাহুল্য যে বিভিন্ন আদিবাসী বিদ্রোহই ব্রিটিশ আমলাদের তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি করেছিল, এবং এ কথাও স্বীকার্য যে তাদেরই আহৃত জ্ঞানভান্ডার আদিবাসী ইতিহাস চর্চাকে অনেক সাহায্য ও সমৃদ্ধ করেছে। পি ও বোডিং-এর মতন মিশনারি এবং হান্টারের মত আমলাদের রচনা ব্যতীত সাঁওতাল ইতিহাসই আমাদের অজ্ঞাত থেকে যেত।

অর্থনৈতিক দিক থেকে আদিবাসী সমাজ মূল হিন্দু সমাজ থেকে কখনই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল না। কামার, কুমোর, ছোট ব্যবসায়ী, ছুতোর প্রভৃতির প্রয়োজন তাদের ছিল। সে কারণেই তাদের স্বয়ম্ভর, বিচ্ছিন্ন ও পরিবর্তন-বিমুখ জনগোষ্ঠী হিসাবে

আখ্যায়িত করা যায় না। একই সাথে বলা চলে যে এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক সংহতিতে চিড় ধরাতে পারে নি। শ্রীনিবাসনের সংস্কৃতায়ন তত্ত্ব বা নির্মল কুমার বসুর 'হিন্দু সমাজের গড়ন'-এ দেখানো হয়েছে যে আদিবাসী সংস্কৃতি ক্রমশই হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। দু একটি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হলেও সমগ্র আদিবাসীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। আদিবাসী কোন সমসত্ত্ব জাতীয় একক নয়। এদের মধ্যেও বহু পার্থক্য বিদ্যমান। পাহাড়িয়া, শবর, ওঙ্গী বা জাড়োয়াদের তুলনায় মুন্ডা, ভীল, মিজো, সাঁওতাল, হো এবং ওড়াঁও-রা অনেক অগ্রবর্তী। এই ধারণাগুলি অবশ্য অনেকটাই আপেক্ষিক। তবুও যদি সংস্কৃতি কোন মানদণ্ড হয় তবে জীবনযাপনের পদ্ধতি এই পার্থক্য নিরূপণ করে থাকে। খাদ্য সংগ্রাহক বা শিকার জীবন থেকে কৃষিজীবনে উত্তরণ আদিবাসীদের অন্তঃস্থ পার্থক্য সূচিত করে। সুসানা ডেভালের 'আদিবাসী- ঔপনিবেশিক নির্মাণ' এই বক্তব্যের সমালোচনা করে বিনয় চৌধুরী বলছেন যে বিদেশিরা ট্রাইবের কোন পূর্ব ধারণা নিয়ে ভারতবর্ষে আসেনি, এবং এর পিছনে কোন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাও ছিল না। প্রথমোক্ত বিষয়টি বিতর্কিত হলেও, দ্বিতীয় মতটি সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। বিভিন্ন সেনসাসে জাত, ধর্ম ও জনজাতি বিভক্তিকরণ প্রচেষ্টার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে না পাওয়াটা কিন্তু আশ্চর্য।

অন্যদিকে বিভিন্ন আদিবাসী বিদ্রোহের মধ্য থেকে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা এদের চিহ্নিত করেছেন নিম্নবর্গ হিসেবেই, শুধু তাতে আরোপিত করেছেন, গ্রামশির তত্ত্ব অনুসারে, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা, তাও আবার বর্ণহিন্দু সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন প্রতিবাদী ধরনকে উল্টোভাবে ব্যবহার করে। আপত্তিটা এখানেই। বিভিন্ন আদিবাসী, বিশেষত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর, সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক বোধের ভিতরেই যে প্রতিবাদের উৎসগুলি লুকিয়ে ছিল, অস্বীকার করা হয়েছে এ কথা। সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী এবং সাবঅলটার্ন তত্ত্ববাদী প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরা অন্তত একটি বিষয়ে একমত, আর তা হলো এরা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ। প্রশ্ন হলো, কোন্ সমাজ? আদিবাসীরা কখনোই চতুর্বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বর্ণহিন্দু সমাজ তাদের শূদ্র বলে আখ্যায়িত করলেও সাঁওতালরা তা স্বীকার করেন নি। এমনকি সাঁওতাল বা মুন্ডা নামগুলিও আরোপিত। আত্ম-পরিচয়ে তাঁদের বক্তব্য হলো, আবো দো হড় জাতি অর্থাৎ আমরা মানব জাতির প্রকৃত সন্তান। আদিবাসী তথা সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক কাঠামো, সাহিত্য, ভাষা, সংগীত, পরিবেশ জ্ঞান ও ভেষজ বিদ্যা সহ অপর একটি সভ্য জাতি বলে গণ্য হতেই পারে। আর যে প্রশ্ন একদিন গায়ত্রী চৌধুরী স্পিভাক তুলেছিলেন অর্থাৎ Can the subaltern speak? তার উত্তরে বলা যায় যে হ্যাঁ, তাঁরা তাঁদের নিজের কথা বলতে পারেন। সাঁওতালি লোকগাথা ও সংগীতগুলি বিশ্লেষণ করলে বলাই যায় যে ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহের কারণ, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব ধারণা যথেষ্টই ছিল, তার জন্য উচ্চবর্গের পদ্ধতি আত্মীকরণের কোনো দরকার ছিল না।

বস্তুতপক্ষে সমস্ত উপনিবেশিককালে এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসীদের দুটি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল, এবং আজও হচ্ছে। একদিকে রাষ্ট্র ও অন্যদিকে জোতদার, জমিদার ও মহাজন। জোতদার, জমিদারদের পশ্চাতে ইংরেজ শাসকের পরোক্ষ মদত সাঁওতাল চেতনায় সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছিল। তাই তাঁদের গানে ফুটে ওঠে এই কথা—

সাহেব শাসন কষ্টদায়ক / আমরা যাবো কি থাকবো?

অথচ সাধারণ বর্ণহিন্দু কৃষক চেতনায় প্রত্যক্ষ শোষক ছিল জমিদার, মহাজন। তাই এদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাট সাহেবের কাছে দরবার করার কথাও তাদের মনে হয়েছিল। আজকের উন্নয়নে বহুজাতিক কোম্পানির মদতদাতা রাষ্ট্র। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড সর্বত্রই আদিবাসী বাসস্থান, খনি ও বনাঞ্চল দখলে বেদান্ত ইত্যাদি গোষ্ঠী অতি তৎপর। কিছু ব্যতিক্রমী বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি ব্যতীত কোনো প্রতিবাদ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলগুলি— ডান, বাম— উভয়েই নীরব। সবচেয়ে দুঃখের কথা বেশ কিছু আদিবাসী নেতাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আদিবাসী শোষণে তৎপর।

কিন্তু এই জ্ঞানতত্ত্বে আদিবাসীদের কী লাভ? তাঁদের 'ট্রাইব' বা 'আদিবাসী' যাই বলা হোক তাদের প্রান্তিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন নেই। আসলে এই তথাকথিত পণ্ডিতেরা আদিবাসীদের কষ্টটা বুঝতে পারলেও, সেই কষ্টের শরিক হতে অপারগ। একটি আলোচনায় অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র বলেছিলেন, ''But it is impossible for us to get out of our elite skins and pretend to see the world with the eyes of subaltern people.'' (প্রিফেস, তারাশংকর ব্যানার্জী সম্পাদিত, *চেঞ্জিং ল্যান্ড সিস্টেম্স এ্যান্ড ট্রাইবাল্স ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড*; সুবর্ণরেখা, ১৯৮৯)।

বস্তুতপক্ষে একবারই এবং একবারই গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে কলকাতার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা গ্রামে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে থেকে তাঁদের খাবার খেয়ে জমিতে তাঁদের সঙ্গে পরিশ্রম করে তাঁদের দুঃখের শরিক হওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং তখনই আদিবাসীদের কাছে এই দিকুদের বিশ্বাসযোগ্যতা গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

দিন বদলায়। আসে বিশ্বায়ন। আজকের আদিবাসী অনেকটাই বিস্মৃত তাঁর নিজেরই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে। প্রয়োজন আদিবাসীদের নিজেদেরই ভিতর থেকে উঠে আসা নেতৃত্বের সমাজ সংস্কার, যা একধরনের রেনেসাঁস। একদা যে দ্বিধা হ্যামলেটে উচ্চারিত তা কি আজও এঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

Whether its nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to tak arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?

এর উত্তর দেবে আগামী সময়। ❐

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

লোকসংস্কৃতিতে আগ্রাসনের কয়েকটি দিক

অরিজিৎ

পুঁজিবাদী সংস্কৃতির অভিঘাত সবচেয়ে জোরেসোরে আছড়ে পড়েছে লোকসংস্কৃতির আঙিনায়। মঞ্চ নাটক, আধুনিক গান, সিনেমা ইত্যাদির মতো শিষ্ট সংস্কৃতির ধারাগুলো সবই সমাজ বিবর্তনের ধারায় পুঁজিবাদের হাত ধরে বিকাশ লাভ করেছে। দীর্ঘদিন অবধি এগুলোও তাদের স্থানীয় চরিত্র ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছিল; কিন্তু বর্তমানের উদগ্র পণ্যসংস্কৃতি, ঔপনিবেশিক মানসিকতার ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়া ইংরেজি ভাষার দাপট আর অন্য দিকে হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্থানের অভিঘাতে প্রাদেশিক শিল্প-সংস্কৃতিগুলোই নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। লোকসংস্কৃতি তো বটেই। সেটা তো দলিত জনের সংস্কৃতি। আর এদেশে হিন্দুত্ব নিজগুণে দলিত বিরোধী। দলিতকে সে আগে মারতে চায় তার সংস্কৃতিকে নিকেশ করে, সংস্কৃতি থেকে ছিন্ন করে। তার পুঁজি যেমন তার উৎপাদনকে কেন্দ্রীভূত করে তেমনই সংস্কৃতির ব্যাপারেও সে একতন্ত্রী। সে কারণেই সংস্কৃতির প্রতি পুঁজিবাদের এই আগ্রাসন। যদিও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যর কারণে লোকসংস্কৃতির ভেতরেই এই আগ্রাসনের মুখেও টিকে থাকা কিংবা তার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি অনেক বেশি।

লোকসংস্কৃতির শ্রেণীগত ভিত্তি

শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে শাসকের সংস্কৃতি, দর্শন আর চর্চিত ইতিহাস সবসময়ই শোষিতের সংস্কৃতি থেকে আলাদা। শোষিতের ইতিহাস উপবাসে থেকে শোষকের ভাণ্ডার ভর্তি করার দুঃখ কষ্ট আর মাঝে মাঝে বিদ্রোহের ইতিহাস। আর শোষকের ইতিহাস আনন্দের, পরের শ্রমে উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করে রামমন্দির কিংবা বাবরি মসজিদ বানানোর আর বিদ্রোহ দমনের ইতিহাস। লোকসংস্কৃতি হল প্রাক শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজের সংস্কৃতি এবং শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে শোষিতের সংস্কৃতি। এর মধ্যেই সমাজের শিকড় প্রোথিত আছে। 'ভদ্রলোকেরা' লোকসংস্কৃতিকে অনুধাবন করে 'ছোটলোকের সংস্কৃতি' হিসেবে। বলা ভালো, উল্টোটা। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা অনুযায়ী 'ছোটলোক' কারা সেটা আগে থেকেই ঠিক করা আছে, ভদ্রলোকদের চেতনার মধ্যেও আছে। 'লোকসংস্কৃতি'-কে তারা দেখে সেই সব 'ছোটলোকদের' সংস্কৃতি হিসেবেই। যদিও লোকসমাজের অভ্যন্তরে লোকসংস্কৃতির উৎপাদন, পরিবেশন, পরিমার্জন, পরিবর্তনের চরিত্রটা শাসকের সংস্কৃতির মত কিংবা শিষ্ট সমাজের সংস্কৃতির মত অগণতান্ত্রিক নয়, কর্তা-কবলিতও নয়, বরং ভীষণভাবেই গণতান্ত্রিক। সেখানে শ্রোতা/দর্শকই শিল্পী আবার শিল্পীই শ্রোতা /দর্শক; শিল্পের পৃষ্ঠপোষক গোটা সমাজ। সবচেয়ে বড়ো কথা, শিল্পীর বেঁচে থাকাটা শিল্পটার ওপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ শিল্পটা শিল্পীর পেশা নয়। শিল্পী আর দর্শকের মধ্যে কোনো বাজার নেই। হয় শিল্পী লোকের উঠোনে উঠোনে পরিবেশন করে ঘুরে বেড়ায় নতুবা বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিনে একই স্থানে মিলিত হয় (মেলা বা উৎসব) শিল্পের সম্ভার নিয়ে। যে হাতে লাঙল ধরে চাষ করে সে-ই একতারা বাজিয়ে গান গায়, ছৌ নাচ করে। যে নৌকার হাল ধরে সে-ই ভাটিয়ালি গায় কিংবা 'দুখের পালা'য় অভিনয় করে। আর এটাই পুঁজিবাদের চলার ধরন কিংবা মানসিকতার ঠিক উল্টো মেরুতে অবস্থিত। অথচ 'ভদ্রলোকের' সংস্কৃতির জন্ম কিংবা টিকে থাকাটা নির্ভর করে শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায়। শাসকের বদল হলে কিংবা শোষণের চরিত্রের বদল হলেই ভদ্রলোকের সংস্কৃতি আমূল পাল্টে যায়। যদিও ভদ্রলোকের সংস্কৃতিও তৈরি হয়েছে শ্রেণীহীন সমাজের এবং পরবর্তী গ্রামীণ সমাজের লোকসংস্কৃতি থেকেই। মন্দির গাত্রের কারুকার্য কিংবা ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সকলেরই শিকড় লোকসংস্কৃতিতেই প্রোথিত, কিন্তু লোকজীবনের সাথে সম্পর্ক তার ছিন্ন হয়ে গেছে। তাকে তাই শাসকের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, তার বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু লোকসংস্কৃতি যতই পুঁজিবাদের সাথে খাপ খাইয়ে চলার কানাগলিতে ঢুকবে ততই তার মৃত্যু অনিবার্য। বরং লোকসংস্কৃতি যত পুঁজিবাদের মানসিকতা কিংবা হস্তক্ষেপকে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে ততই শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সংস্কৃতি নয় গোটা পুঁজিবাদটার ধ্বংসের মোক্ষম হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

দার্শনিক ভিত্তি

মৈত্রেয় উপনিষদে ছোট জাত-কে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের আচরিত সংস্কৃতির উল্লেখ ক'রে। তার মধ্যে যেমন বেদ-বিরোধী অবিশ্বাসীরা আছে, তেমনই আছে নিত্য প্রমোদিত, নিত্য পরিব্রাজক, শিল্প উপজীবী, রঙ্গাভিনয় কুশল, কিংবা বাংলার আউল-বাউল জাতীয় মানুষেরা। শঙ্করাচার্য মাধবাচার্যরাও এঁদের ছোট করে দেখেছে। কারণ এরা আত্মাকে নস্যাৎ করে দেহবাদকে গ্রহণ করে।

লোকসংস্কৃতির দার্শনিক ভিত্তিটি 'লোকায়ত' দর্শনেই আমরা খুঁজতে পারি। সেখানেই আছে সাধারণ মানুষের মনের কথাটি। বস্তুগত প্রাপ্তি, পরলোকের কোনো স্থান নেই সেখানে। এখানে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগোচরই সত্য। স্বর্গ-নরক, আত্মা, পরকাল এসব কল্পনাবিলাসিতা মাত্র। কিংবা নিছক বিলাসিতা নয়। এ এসবের মাধ্যমে ধর্মের ধূর্তেরা সাধারণ মানুষের মনে একদিকে পাপের ভয় আর অন্যদিকে স্বর্গপ্রাপ্তির অন্ধ মোহের সঞ্চার করে। উল্টোদিকে লোকায়ত দর্শনের প্রত্যক্ষপরায়ণতা নিশ্চিতভাবে

ধর্মপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে মতাদর্শের ভিত্তি আর লোকসংস্কৃতি সেই সংগ্রামের হাতিয়ার।

ঐতিহাসিক ভিত্তি

সমাজ বিবর্তনের ধারায় মানুষ কৃষি-পশুপালন আয়ত্ত করার আগে সমাজে নানাবিধ আধিপত্যের সম্পর্ক থাকলেও অসাম্য ছিল না। নেহাতই বস্তুগত চাহিদা মেটানোর জন্য কিছু জাদু, আঁকি-বুঁকি কাটা, আর প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র গাছকে, ঝড়-বৃষ্টি, পাহাড়কে, নদীকে দেবতা ভাবার মাধ্যমেই মানুষের কিছু রিচ্যুয়াল পালনের সূত্রপাত। শ্রেণীহীন সমাজের সে সব উপাদান আজও প্রবহমান লোকসংস্কৃতির ধারায়। অভিজ্ঞ গবেষক সেসব চিনে নিতে পারে।

কৃষি-উদ্বৃত্ত তৈরি হওয়ার পর সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হল। দৃশ্যমান পাহাড়, নদীরা আর দেবতা রইল না; নদীদের দেবতা হলো পাহাড়ের দেবতা হলো। দেবতার বিমূর্তায়ন হল। তার হাত ধরে এল পাপ-পূণ্যের ধারণা। স্বাভাবিকভাবেই তা এসেছিল শাসকদের মাথাতেই, প্রয়োগও করেছিল তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষকে ভয় দেখিয়ে, স্বর্গপ্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে কিংবা জন্মান্তরের গল্প শুনিয়ে ইহজীবনের জন্য পূর্বনির্ধারিত কর্মফলের দোহাই দিয়ে পদানত করে রাখার জন্য, নিজেরা না খেটে তাদের শ্রমের ফল ভোগ করবে বলে।

এর ওপর দাঁড়িয়ে শোষক আর শোষিতের জীবনবোধ গেল বদলে, তার ছাপ পড়ল তাদের সংস্কৃতিতে, আচারে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হলো শাসকের হাতিয়ার আর পুরনো ধারা প্রবাহিত হতে থাকল শোষিতের সংস্কৃতিতে। কখনো শ্রমের কষ্ট লাঘব, কখনো দুঃখের আকুতির প্রকাশ, আবার কখনো সমষ্টিজীবনের উচ্ছ্বাস প্রকাশের আধার হয়ে উঠল লোকসংস্কৃতি। জীবনের প্রতিমুহূর্তের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জীবন্ত হয়ে রইল বস্তুবাদী ধারাটি। আর ধর্মের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হয়ে উঠল নিস্পৃহ সত্যের উৎখননের বদলে মায়া, মোক্ষ, মুক্তি, ভক্তি, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি কল্পনাপ্রসূত জটিল ধারণায়। আর বাস্তবে তারা 'কাজ করে যাও ফলের আশা কোরো না' গোছের স্তোকবাক্য আওড়ে উৎপাদনের উপকরণ ও ফলের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম রাখল।

যে সমস্ত কৃষিজীবী জনগণ পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা তাদের সংস্কৃতি, তাদের জ্ঞান, আচার নিয়েই উপস্থিত হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যে ঢুকেও প্রভাবটা তার সমাজের অভ্যন্তরীণ কারণের জন্য নয় বরং বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ফলেই। যাই হোক, এই সংমিশ্রণের প্রভাবে বহুজায়গায়, বহু ধরনের (টাইপ) লোকসংস্কৃতির মধ্যে দেবতারা ঢুকে পড়েছে, সমষ্টির উৎসবের খোলা মাঠ প্রতিস্থাপিত হয়েছে দেবালয় সংলগ্ন আঙিনা দিয়ে, কিন্তু তাতেও লোকসংস্কৃতির স্বকীয়তা, তার বস্তুবাদিতাকে পুরোদস্তুর নস্যাৎ করে দেওয়া যায়নি। দেবতার কাছে তার আকুতিটা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চেনানো 'মোক্ষ' বা 'ব্রহ্মলাভ' নয়, বরং সাধারণ মানুষের একান্ত আপনার জিনিস, চেনা জিনিস। আরো শস্য দাও, আরো অর্থ দাও, পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও, ভালো বর দাও বা সুন্দরী বউ দাও ইত্যাদি। একই নামের দেবতাদের ধারণা বা সংস্কৃতিতে দেবতাদের উপস্থিতির ধরণগুলোও আলাদা। গম্ভীরা কিংবা কিংবা গাজনের শিবের যে চটুলতা বা স্থূলতা তা মোটেও মহেশ্বরের গাম্ভীর্যের সাথে খাপ খায় না। আর যারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের খপ্পরে পড়েনি তারা দিব্যি টিকিয়ে রেখেছে আবহমানকাল ধরে চলে আসা লোকজীবনের উপাদানগুলো, তাদের সংস্কৃতির মধ্যে।

ফলে দেখা যাচ্ছে লোকসংস্কৃতিও কোনো একমাত্রিক ব্যাপার নয়। বরং এই জটিলতার মধ্যে রেখেই লোকসংস্কৃতিকে বিবেচনা করতে হবে। ক্রমাগত সরলীকরণ করতে গেলেই বস্তু থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। তাও আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য লোকসংস্কৃতিকে প্রাক-শ্রেণী সংস্কৃতির বর্তমান রূপ আর শ্রেণী-বিভাজিত সমাজের গ্রামীণ শিল্পগুলোকে ধরে নিয়ে এগোবো।

লিখিত ইতিহাস শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত, শাসকেরই ইতিহাস। শাসকের শিল্প (মন্দির, মন্দির গাত্রের কারুকার্য, দারুশিল্প, পাথরের মূর্তি) দামী উপকরণে বানানো, তাই টেঁকসই। আর জনতার ইতিহাস লোককথায়, লোকগানে, লোকজ্ঞানে। সাধারণের শিল্প ক্ষণস্থায়ী, একদিনের পার্বণের জন্য তার প্রস্তুতি। তাই সে টিকে থাকে লোকজ্ঞানে এবং পুনরুৎপাদনে। তাই লোকসংস্কৃতি শাসকের ইতিহসের বদলে 'মানুষের ইতিহাস' রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পুঁজিবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অস্বীকার করতে চায়, ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায়, কেবল শাসকের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাসই পড়াতে চায়। তাই লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটিকে ছলেবলে ধ্বংস করতে তার উৎসাহের শেষ নেই।

ইতিহাসের নানান বাঁকে লোকসংস্কৃতির হস্তক্ষেপ

আজকে আমাদের দেশে লোকজীবনের যেসব সংস্কৃতি আমরা দেখতে পাই তার ওপর হাজার হাজার বছরের নানা কিছুর প্রভাব, নানা কিছুর হস্তক্ষেপ আমাদের সংক্ষেপে হলেও বুঝে নিতে লাগবে। না হলে 'লোকসংস্কৃতি'-র ওপর পুঁজিবাদের 'আগ্রাসন' বা কেন বলব সেটা বুঝতে পারব না, বরং ভুল করে মনে হবে যেন ধনতন্ত্র দু-হাত প্রসারিত করে দিয়েছে 'লোকসংস্কৃতি'কে প্রাণপণে রক্ষা করতে, তাকে উন্নত করতে। আবার বুঝে নিতেও লাগবে অতীতের ধর্মীয় হস্তক্ষেপগুলোরও একাংশ বস্তুগত হলেও নেহাতই চাপিয়ে দেওয়া, অগণতান্ত্রিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত— যাতে করে লোকসংস্কৃতির সেকুলার চরিত্রটি, বস্তুবাদী চরিত্রটি নষ্ট হয়। সেগুলোও না বুঝলে অতীতের সমস্ত রকম হস্তক্ষেপকে আমরা প্রশ্নাতীতভাবেই উর্ধ্বে তুলে ধরব,

তাতে মস্ত ভুল হয়ে যাবে; আমরা আসলে যাচাই করে নিতে চাইব লোকসংস্কৃতির দায়িত্বশীল ধারাগুলো। কেননা ধর্মের ধ্বজাধারীরাও অন্য এক ধরণের হস্তক্ষেপ চালিয়েছে, আজও চালাচ্ছে জনজীবনে এবং তাদের সংস্কৃতিতে। এককথায় লোকসংস্কৃতি একটা সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়েছে। একদিকে 'ধনতন্ত্র' আর অন্যদিকে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম'।

লোকসংস্কৃতির ওপর ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে অর্থনীতি। কারণ অর্থনীতিই সমাজের ভিত্তি, আর সেই ভিত্তির ওপর তৈরী হয় তার উপরিকাঠামো— গোটা সমাজের মনন, জ্ঞানচর্চা, ভালো-খারাপ বিচার, তার সংস্কৃতি। ফলে অর্থনীতির ব্যাপক রদবদলে সাংস্কৃতিক ভাঙন-পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটি নিয়ত ক্রিয়াশীল। ভারতে পুঁজিবাদের এক বিপুল কিন্তু বিকৃত বিকাশ হওয়ার ফলে অর্থনীতিতে না হলেও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব বেশ প্রকটভাবে বিদ্যমান। লোকসংস্কৃতিতে তো বটেই। ফলে এ ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে— পুঁজিবাদী আগ্রাসনকে বিচার করতে গিয়ে আমরা যেন সামন্ততন্ত্রে 'সুন্দর দিন কাটানো'র অন্ধগলিতে না গিয়ে পড়ি।

আমরা কয়েকটি টুকরো টুকরো চিত্রকল্প দিয়ে গোটা ব্যাপারটাকে বিশেষ রূপে বোঝার চেষ্টা করব, তারপর তার সাধারণীকরণ করব। প্রথমে ধরা যাক কোনো এক আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা। এরা কোনো পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী নয়। এরা শ্রেণীসমাজ বিকাশের সাথে সাথে সমান্তরালভাবে টিকে থেকেছে নিজেদের শিল্পচর্চা নিয়ে। তা হতে পারে কাঠের, পাথরের বা ধাতুর মূর্তি নির্মাণ, হতে পারে সঙ্গীত, হতে পারে মাটির ওপর, দেওয়াল বা কাপড়ের ওপর চিত্র অঙ্কণ, হতে পারে কাহিনী বা যাত্রাপালা। এদেরই একাংশ প্রতিবেশী হিন্দুদের নির্দেশনা বা বরাত অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করল। এখন নিশ্চিতভাবেই তাদের শিল্প অ-আদিবাসী হিন্দু প্রতিবেশীদের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করবে। এমনকি প্রতিবেশী গ্রামীণ শিল্পীদের শিল্পরীতির প্রভাবও পড়বে। মূর্তি বা কারুশিল্পতে হিন্দু মন্দিরশিল্পের ছাপ পড়বে। সেকুলার সঙ্গীতে ঢুকে পড়বে হিন্দু দেবতারা, যাত্রাপালা বা কাহিনীতেও নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করবে তারা। যদি সেগুলোর কেবলমাত্র বহিরঙ্গ না দেখে সামগ্রিকভাবে বিচার করি তবেই বোঝা যাবে তাদের শিল্পরীতিটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি। লোকশিল্পের এই দুটি ধারা— আদিবাসী শিল্প কিংবা প্রাক-শ্রেণীভিত্তিক সমাজের লোকশিল্প— নানাভাবে পরবর্তী গ্রামীণ লোকশিল্প এমনকি হিন্দু ধ্রুপদী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এমনকি আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো হিন্দু বর্ণ সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের শিল্পগুলিও হিন্দু শিল্পধারায় ঢুকে পড়েছে এবং তাদের শিল্পেরও খোল নলচে বদলে হিন্দু ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছে। ছৌ-নাচে হিন্দু প্রভাব অনেক পরের ; পুত্রকন্যা সহ দুর্গার প্রবেশ এভাবেই। ইসলাম-ধর্মেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। জারিগান, মুর্শিদি গান, ফকিরি গান পীরদের কেন্দ্র করে নানাবিধ সংস্কৃতিউদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ শক্তপোক্ত হওয়ার পর থেকেই রাজারাজড়ারা যা কিছু তাদের আওতার বাইরে আছে সে সবকিছু যেমন দখল এবং আত্মসাৎ করতে নেমেছিল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। প্রাক-আর্য সংস্কৃতির ওপর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব এরই উদাহরণ। লোকসংস্কৃতির কোনো কোনো ধারাকে তুলে নিয়ে নিজেদের মতো পরিবর্তন করে তাকে হজম করে নিয়েছে অর্থবানরা। ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত যে লোকসঙ্গীত থেকেই এসেছে তার প্রমাণ মিলছে। আবার দেখতে পাচ্ছি বাউল গান যা দেহতত্ত্ব বন্দনার গান সেটাও পরিবেশিত হচ্ছে 'হিন্দু'দের পুজোমন্ডপে। দেহতত্ত্বের সূক্ষ্ম, জটিল হেঁয়ালির মধ্যে বেমানান ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেবতাদের, এবং তা খুবই স্থূলভাবে।

আমরা আরো একটা উদাহরণে চোখ ফেরাই। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব। উৎসবটি মোটেও শিবকে কেন্দ্র করে ছিল না। বরং ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় উৎসব। তখন মানুষের শিল্প আর উৎসবের উৎস ছিল শস্য ফলানো আর সংরক্ষণের জন্য জাদুবিশ্বাসের প্রয়োগ। জাদুর আদিম রূপটা ছিল সমতল ক্ষেত্রে আঁকিবুঁকি টানা, চিত্র অঙ্কন, অর্থবহ কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা। শিকারের জন্য এরকম জাদুবিদ্যা প্রয়োগের আদিমতম রূপ এদেশে পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা ও অন্য কয়েকটি অঞ্চলের গুহাচিত্রে। আলপনার মাধ্যমে আজও তা হিন্দু পরিবারগুলিতে টিকে আছে, এবং সেটা সর্বাধিক আছে লক্ষ্মীপুজোয়। কৃষি উৎপাদনের সাথে লক্ষ্মীর ধারণাটি যুক্ত। জমির উর্বরতা আর মানবগোষ্ঠীর উর্বরতা সমগোত্রীয় ভেবে নিয়ে পৃথিবীকে নারী হিসেবে ভাবা হয়েছে। সে ভাবনা মূর্ততায় ফুটে উঠেছে উর্বরতাদায়িনী মাতৃমূর্তিতে। যৌন সক্ষমতার প্রতীক হিসেবে সেই মাতৃদেবীর ধারণা সেভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বেমালুম আত্মসাৎ করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে গাজন উৎসবে শিবকে যুক্ত করে সেটাকে কৃষিজমি থেকে টেনে আনা হয়েছে দেবালয়ে। উর্বরতা কামনায় পূজিত লিঙ্গকে শিবের লিঙ্গ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল মানুষের মন দখলের জন্য শিবের ধারণাকে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছে খুব চটুল, স্থূলভাবে। শিল্পের প্রতি, জীবনবোধের প্রতি দায়বদ্ধতার বদলে সস্তা চমকের মাধ্যমে সেইসব বাইরের জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়াস। ফলত চেষ্টাটা যতটা না ভেতরের তার থেকেও বেশী ওপর থেকে। গ্রামীণ শ্রোতা / দর্শকদের ব্যাপারে সমাজকর্তাদের ছিল বিপুল অবজ্ঞা। সেজন্যই স্থূলতা, সস্তা চাকচিক্যের এত আয়োজন।

আরো একটা উদাহরণ দিই। হোলি উৎসব। এটিও

প্রাথমিকভাবে জমির উর্বরতা সম্পর্কিত লোক-উৎসব। তারপর সংস্কৃতকরণের প্রক্রিয়ায় (বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুনরুত্থানের যুগে হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের কাহিনী জুড়ে বিষ্ণুগাথা প্রচার করা হয়েছে। আরো পরে পদাবলী সাহিত্যের যুগে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী হয়ে উঠেছে উৎসবটির প্রাণকেন্দ্র। বিগত শতকে রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসবের মাধ্যমে উৎসবটির একটি ধর্মনিরপেক্ষ আঙ্গিক দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিগত শতকে রবীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, আশুতোষ মুখার্জীর মত ব্যক্তিরাও লোকসংস্কৃতিতে কিছু কার্যকরী হস্তক্ষেপ করেছিলেন। প্রামাণিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গুরুসদয় দত্তও কিছু হস্তক্ষেপ করেছেন ব্রতচারী দলের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের হাত ধরে গণনাট্য সংঘও কিছু হস্তক্ষেপ করে। ফলে লোকসংস্কৃতির ওপর হস্তক্ষেপ বা আগ্রাসনের সাথে সাথে আসলে লোকসংস্কৃতির কোন্ রূপটার অস্তিত্ব নিয়ে আমরা বিশেষ চিন্তিত, কোন্ রূপটা রক্ষা করতে চাই সেটা বুঝে নেওয়াও জরুরি।

পুঁজিবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন

সাধারণভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত বা লুপ্তপ্রায় কিংবা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেসব লোকসংস্কৃতি সেগুলো আসলে সবই নানা সময়ে নানা হস্তক্ষেপ, নানান পরিবর্তনের মাধ্যমে সামন্তযুগের (পুঁজিবাদের বিকাশের পূর্বযুগের) মতো করে মানানসই একটা বিকশিত রূপ, যা এমনকি ভারতীয় ব্যবস্থায় (মানে আধা-সামন্ততন্ত্র আদি-পুঁজিবাদী যুগ বলতে চাইছি) টিকিয়ে রেখে পুঁজিবাদের বিকাশের যুগেও অব্যাহত ছিল। লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকগুলো প্রায় সবই যৌথ কৃষির সাথে সম্পর্কিত। আজ পুঁজিবাদের যুগে লোকসংস্কৃতির ওপর পুঁজিবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনের রূপটা এক বিশেষ সঙ্কট তৈরি করেছে। প্রাক-পুঁজিবাদী অবস্থায় কৃষিই ছিল উৎপাদনের মূল ক্ষেত্র। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমদান বাদ দিয়েও এক বিপুল সময় থাকত শ্রমজীবী মানুষের হাতে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সেই অলস সময়ই জন্ম দিয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্পের, যার মূল্য আছে কিন্তু দাম আছে কি নেই সে প্রশ্ন সেই সমাজব্যবস্থায় অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু যখন শ্রম আরো বিমূর্ত হল, মানুষের শ্রমসত্তা উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, শ্রমজীবী মানুষের শ্রমশক্তি ঘণ্টার হিসেবে বিক্রি হতে লাগল তখন থেকেই অবস্থাটা বদলাতে শুরু করলো। লোকসংস্কৃতির মূল সঙ্কটটা আমাদের এখানেই অনুসন্ধান করতে হবে। গ্রামীণ সমাজের লোকশিল্পের মূল্যের ভিত্তির ওপর তার দাম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল। গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি শ্রমজীবী মানুষের ভাবালুতা আর তার বিনোদন মূল্যের জন্য সেটা হয়ে উঠল শ্রমিকের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের বস্তু আর পুঁজিপতির কাছে পণ্য। লোকসমাজে যেমন প্রতিটি মানুষই শিল্পী ছিল, শিল্পীই ছিল শ্রোতা, শ্রোতাই শিল্পী— পুঁজিবাদে তাও গেল পাল্টে। দক্ষতার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণতই বুর্জোয়া যুগেরই বৈশিষ্ট্য। লোকশিল্প পণ্যে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে শিল্পীর দক্ষতার প্রশ্নটিও এসে পড়ল। গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্পচর্চার বদলে ব্যক্তি লোকশিল্পী বেশি গ্রহণীয় হয়ে উঠল বাজারের কাছে। তার তৈরি পট বিক্রি হবে, তার গানের ক্যাসেট বেচা যাবে, প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রি হবে। অথচ লোকসংস্কৃতি বেঁচে থাকে অনেক মানুষের মধ্যে, গোষ্ঠীর মধ্যে পুনরুৎপাদনে। ব্যক্তিবাদ গ্রাস করল লোকসংস্কৃতির পরিসর।

পুরানো সমাজে শ্রমের সাথে শ্রমজীবীর একাত্মতা বোধের জন্যই শ্রমের তালে তালে কিংবা শ্রমের সমাপ্তিতে জন্ম নিত লোকগান; কিন্তু এখন মানুষ শ্রম প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন, আজ নির্মাণ শ্রমিক তো কাল গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কিংবা পরশু ধান কাটতে চলল অন্য জেলায়। কৃষিতে পুঁজিবাদের বিপুল বিকাশের ফলে কৃষি সহ অন্যান্য গ্রামীণ পেশা থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ আজ শুধু প্রবাসী নয় পরিযায়ী শ্রমিক; নিজ ভূমে পরবাসী কিংবা নিজ দেশে উদ্বাস্তু। তার নিজের জায়গা নেই, ফলে শিকড়ও নেই। যার সাথে তার মনের সম্পর্ক নেই তাকে কেন্দ্র করে গান বাঁধবেই বা কী করে? লোকশিল্পীর তো নিজের শিল্প বিক্রী করে বেঁচে থাকার কথা নয়, সে বেঁচে থাকত অন্য জীবিকায়। সেটাও খেয়ে নিয়েছে পুঁজিবাদ। আর শিল্পের জন্য শিল্পীকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায়। শিল্পীও বাধ্য হচ্ছে কেবলমাত্র সেই শিল্প বানাতে যার বিক্রয়মূল্য আছে। আর বিশ্বায়নের যুগে বিক্রয়ের বাজারটিও যখন দু-একজনের অঙ্গুলি হেলনে চলে তখন শিল্পী হয়ে উঠছে পরাধীন। অন্যের বরাত অনুযায়ী নিজের শিল্পদক্ষতাকে ঘণ্টার হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে লোকশিল্পী। লোকশিল্পের উৎপাদনের পেছনেও তাই আজ কাজ করছে মালিকের চটজলদি মুনাফার বাসনা। ফলে শিল্পও হচ্ছে মোটা মাপের গ্রন্থনা, চটুল ভাষা, কৃত্রিম একটা শহুরে প্রমোদের ঢং, বিজাতীয় সুরের ব্যবহার বা কান ফাটানো ডিজিটাল যন্ত্রানুসঙ্গ, রং বেরঙের আলোর ঝিকিমিকি— মানে সম্মোহনের কারবার। আর সেই শিল্পের ভোক্তা নিজভূমে বা দূর প্রবাসে সস্তা চায়না মোবাইল সেটে পয়সা দিয়ে সেই গান ডাউনলোড করে শুনছে। অথচ সে নিজেই হয়তো আগের প্রজন্মে সেই শিল্পকর্মটি প্রস্তুতির সময় অবদান রাখত, নয়তো শ্রোতা হিসেবে মতামত রাখত। ফলে লোকসংস্কৃতির গণতান্ত্রিক চরিত্রটি ধ্বংস করার বৃত্তটিও সম্পূর্ণ হচ্ছে। সম্পূর্ণ হচ্ছে লোকসংস্কৃতির পণ্যে পরিণত হওয়ার বৃত্তটিও।

বাজার আর গণমাধ্যমের ভূমিকা

পণ্য এবং সংস্কৃতির ব্যাপারে একতন্ত্রী এই উৎপাদনব্যবস্থা গণমাধ্যমের প্রসার এবং পণ্য বিক্রির বাজার তৈরির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের (রাস্তা এবং সেলফোন) নিরিখে

গ্রাম আর শহরের পার্থক্য কমিয়ে ফেলেছে। পুষ্টিকর খাদ্য পাক আর না পাক, অন্যের মুনাফার জন্য উৎপাদন বাদ দিয়ে নিজের জন্য বেঁচে থাকার মতো সময় থাকুক বা না থাকুক, সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার পরিসর থাকুক বা না থাকুক, ঘরে টিভি আর হাতে মোবাইল ফোন এখন মানুষের মাপকাঠি। এটা দিয়েই বিচার করা হয় মানুষ আর গরিব নেই, গ্রামীণ মানুষেরও অবস্থার একটা উন্নতি হয়েছে। এর পেছনে আছে একটাই জিনিস। বাজার। এটাই নিয়ন্ত্রণ করে পণ্যকে। আর লোকসংস্কৃতিও তো এখন পণ্য। সংস্কৃতি পরিবেশনার প্রতিটি মাধ্যম আজ কব্জাগত। মঞ্চ-নাটক, বেতার, দূরদর্শন, সিনেমা, কম্পিউটার, লাউডস্পিকার কিংবা মোবাইল ফোন। এগুলো সবই গোষ্ঠী থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে একা বানায় আর তার একক চেতনার কাছে সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেয়। আস্বাদন করতে শেখায় একা একা। এখানে তার ভূমিকা কর্মহীন ভোগের। এর নির্মাণে তার অংশগ্রহণ অসম্ভব। এই মাধ্যমগুলো অগণিত প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে, একই সঙ্গে গোটা দেশে সম্প্রসারিত হতে পারে। গোটা দেশে নিজের ইচ্ছামত বাতাবরণ তৈরি করে নিতে পারে ধনবানরা। কারণ এই পুঁজি নির্ভর জটিল প্রযুক্তি তারই নিয়ন্ত্রণে; যা সাধারণ মানুষকে কেবল মোহগ্রস্তই করে তুলতে পারে। বিকল্প কিছু করা যায় এটাই ভেবে উঠতে পারা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গণমাধ্যম দিয়ে মানুষের চেতনার ওপর চলে সন্ত্রাস। টিভি সিরিয়াল, মূলধারার ঝকমকে সিনেমা, বাচ্চাদের জন্য তৈরি কার্টুন কিংবা বিকৃত লোকসংস্কৃতি— এ সবই হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বোফর্স। যন্ত্রানুসঙ্গের গগনভেদী চিৎকারের মাধ্যম চৈতন্যভেদী বশীকরণ। এ শুধু মনের স্বাধীনতাকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু।

বুর্জোয়া গণমাধ্যমগুলো কি লোকসংস্কৃতির কোনো উপকারে আসতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে; বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিগুলো রেকর্ড করে রাখতে পারে সংরক্ষণের জন্য। সেই সাহায্যটাই করতে পারে বুর্জোয়া মাধ্যম, যে সমস্যাটা সে নিজেই তৈরি করেছে, বুর্জোয়া মাধ্যমের জন্ম না হলে লোকসংস্কৃতি এভাবে বিলুপ্তির পথে হাঁটত না। বাজার কেবল সেটুকুই অনুমোদন করে যা চটজলদি মুনাফা দেয়, যার বিক্রি আছে। বাউলগান কিংবা মধুবনী এ যাত্রায় বেঁচে যাবে কিন্তু টুসু, রায়বেঁশে, চাঙ্ক নৃত্য বা বনবিবির পালা লোপাট হয়ে যাবে। যেগুলো ক্যাসেট, সিডি বা বড়লোকের ঘর সাজাবার জিনিস নয় বা হাল ফাশনের 'এথনিক বিউটি' নয় সেগুলো বিলুপ্ত করে দেবে বাজার। যে অনুষ্ঠানগুলো দীর্ঘসময় জুড়ে হয় তাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে ব্যস্ততার যুগে, তার রেকর্ডও বানানো হবে না। করম পুজো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে যতটা আনন্দদায়ক তা ভিডিও রেকর্ডিং-এ মোটেই আনন্দদায়ক নয়, বরং একঘেয়ে।

আবার রেকর্ডিং-এর সময় শিল্পীর সাথে ক্যামেরা-পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলে উৎসবটির অন্তর্নিহিত অর্থটাই বদলে দিতে পারে রেকর্ডিংটি। বাজারের প্রয়োজনে এভাবেই বিকৃত করা হয় বহু সময়।

বাজারীকরণের ধাক্কা থেকে বহুদূরে থেকে গিয়েছিল লোকসংস্কৃতির একটি ধারা। সেগুলো গ্রামীণ দক্ষ বা পেশাদার শিল্পীদের নয়, বরং গ্রামীণ শিল্পীসমাজের মূলস্রোতেরও 'বহিরাগত' সেইসব শিল্পীরা, যদিও জনসংখ্যার বিচারে তারা সেই জনগোষ্ঠীরই অর্ধেক অংশ। গ্রামীণ অপেশাদার মহিলা শিল্পী, যাঁরা তাদের পারিবারিক ও সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য কিংবা গার্হস্থ্য উৎসবের জন্য শিল্প সৃষ্টি করেন। তা হতে পারে চালের পুতুল, হতে পারে আলপনা, নকসি কাঁথা, নানাবিধ সেলাই, গয়নাবড়ি, নানাবিধ লোকখাদ্য। অধুনা এই অপেশাদার শিল্পচর্চারও বাজারীকরণ শুরু হয়েছে। আলপনার স্টিকার পাওয়া যাচ্ছে। ইন্টারনেটে ঘুঁটে কেনা যাচ্ছে। নারীর বর্হিগমন, স্বাধীনতা কিংবা পুরোনো সামন্ত্রতান্ত্রিক পরিবার প্রথার ভাঙনের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে এই লোকশিল্পগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবাটাও প্রয়োজন।

লোকশিল্পের অভ্যন্তরেই বহু জায়গায় বহু যুগ ধরে স্থূলরুচি আর আদিরসের পরিবেশন হয়, তাতে তো লোকসংস্কৃতি অশুচি হয়ে পড়ে না? কিংবা আধুনিক যন্ত্রানুসঙ্গ ব্যবহার করলেই লোকশিল্পের কৌলিন্য চলে যায় নাকি? একটা শিল্পের সাথে অন্য ধারার মিশ্রণেই বা সমস্যা কোথায়? এধরনের নানান তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু অনুপ্রবেশ, আত্তীকরণ বা মিশ্রণ যতদিন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয় ততদিন বিবর্তনের নিয়মে তাতে সমস্যা থাকে না। কিন্তু বর্তমানের প্রতিটি হস্তক্ষেপ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। আজ 'পরিবর্তনের তত্ত্ব অনুসন্ধানের চেয়ে আত্মরক্ষাটাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে'।

লোকসংস্কৃতি বাঁচবে কীসে

> উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির যেমন একটা সর্বভারতীয় কেন্দ্রমুখী রূপ আছে তেমনই লৌকিক ঐতিহ্যের রূপটা কেন্দ্রাতিগ আঞ্চলিকতামুখী বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিকশিত হচ্ছে। আমাদের দেশের অগণিত জনসাধারণ যেদিন সত্যি সত্যি নিজেদের ভাগ্যবিধাতা হবে সেদিন তার সংস্কৃতির বহুবিচিত্র সহস্রদল বিকাশ দেখে একতন্ত্রীরা প্রতিবাদ করতে পারেন কিন্তু ভারতের সত্যিকারের সেটাই ভবিষ্যৎ রূপ। বহু উপজাতি ও খণ্ডজাতি নিজেদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ফিরে পাবে। বহু হারানো লৌকিক ঐতিহ্যের দিকে চোখ ফিরবে।...আজ চারিদিকে বিভিন্ন ভাষার দাবি দেখে যারা ভারতের বিভক্তির ভয় পাচ্ছেন তাঁরা জাতি বিকাশের এই স্বাভাবিক ধারাটিকে স্বীকার করেন না। (হেমাঙ্গ বিশ্বাস)

শিল্পী সঠিকই চিহ্নিত করছেন। লোকসংস্কৃতিকে বাঁচানোর সত্যিই কোনো চটজলদি সমাধান নেই। 'লোক'-ই যখন সঙ্কটে তার সংস্কৃতিও সঙ্কটে থাকবে এ আর নতুন কি? মানুষের শোষণ

এর পর ৯৭ পৃষ্ঠায়

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বাঙালি মুসলমানের জীবনযাপন: নতুন করে দেখা

সৌমিত্র দস্তিদার

কথামুখ

আমার নিজের কেমন মনে হচ্ছে আমি এক অচেনা অজানা জগতের দিকে যাত্রা করেছি। এ এক দীর্ঘ যাত্রা। যত যাচ্ছি ততই নতুন নতুন বিষয় শিখছি। আমাদের দিন যাপনের যে সমান্তরাল ধারাটি আমাদের পাশেই ছিল, যাকে কোনদিন চিনতে চাইনি, যে প্রতিবেশীর দুঃখ-যন্ত্রণা-আনন্দ-বিষাদ-অভিমান কখনো বোঝার চেষ্টা করিনি, তাদের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণই কেমন যেন বাধ্য করছে, ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে অজানা এক পথে।

যেতে যেতে কত ঘটনা, কত কাহিনী, কত সাধারণ অসাধারণের বন্ধু হয়ে ওঠা, কত অখ্যাত ছোট জনপদ। গাদী, লালগোলা, ডোমকল, জলঙ্গি, মীনাখাঁ, নাকাশিপাড়া, তাহেরপুর, রহমতপুর— মাইলের পর মাইল শুধুই চলেছি। কত শত হাত আমার দিকে বাড়ানো। রফিক, সুজাউদ্দিন, শাহনওয়াজ, নাজিব, নাফিস, নাসমিন, মশিয়ুর, জীশান, নীহারুল, হাবিবা, হালিমা, মাতিন। বাঙালি মুসলমানের বারোমাস্যায় এরাই আমার গাইড, পথপ্রদর্শক, শিক্ষক।

সূচনাপর্ব

কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎই মনে হয়েছিল বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করা যেতে পারে। তখন সবে সাচার রিপোর্ট বেরিয়েছে। নানা জায়গায় এ নিয়ে চর্চা চলছে। দিল্লীর এক সেমিনারে দেখা হয়ে গেল রাজেন্দ্র সাচারের সঙ্গে। অনেকক্ষণ কথা বললেন। তিনিও বললেন, পারলে ছবিটা করুন। টাকা জোগাড় করতে আরও কয়েক বছর গেল। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদল— তার পেছনেও সাচার রিপোর্টের ভূমিকা ছিল। ক্ষুব্ধ মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ চিরকালের বন্ধু বামদের থেকে সরে তৃণমূলের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ছবি যখন করব করব করছি ততদিনে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে গেছে। মমতা ব্যানার্জী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ৩৪ বছরের বাম জমানা সংখ্যালঘুদের জন্য প্রায় কিছুই করেনি, তিনি করবেন।

ছবি করতে গিয়ে বুঝলাম, মুসলমান বিষয়টি কঠিন শুধু নয়, জটিল ও বহুমাত্রিক। নানা প্রশ্ন, নানা বিতর্ক উঠবে। এমনিতেই একটা প্রচার আছে যে মুসলমানরা এত অসহনশীল যে কিছু একটা ভুল বললেই রে রে করে উঠবে। কঠিন বললাম এ জন্য যে বাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে, তাদের যাপন, তাদের সংস্কৃতি, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে ভালো কোন বইপত্তর নেই। দু-একজন বিশিষ্টজনের কাছে গেলাম। তারা দু-চারটে বই রিপোর্ট দিলেন, কিন্তু আমার সমস্যার সুরাহা হলো না। সেই সময় পরিচয় হলো মালদার গৌতম চৌধুরির সঙ্গে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আইরিন শবনম অনেক পরামর্শ দিলেন। ছবিটা করতে করতে ঠিক করে নিলাম এ ছবিতে কোন রাজনীতিকের সাক্ষাৎকার নেব না। মুসলিম সমাজের চেনা বিশিষ্টদের কথাও রাখব না। চেষ্টা করব সাধারণদের কথা শুনতে। বিড়ি শ্রমিক, জরি শ্রমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষক, সাধারণ কৃষক, গ্রামের সমাজকর্মী, সাথে মুসলিম সমাজের পরিচিত অধ্যাপক, গবেষক, উকিল, ইমাম— এদের সঙ্গে কথা বলে সমাজটাকে বোঝার চেষ্টা করব। সঙ্গে একজনের ইন্টারভিউ রেখেছি— প্রাক্তন আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলামের।

ছবিও একদিন শেষ হলো। নাম দিলাম— 'মুসলমানের কথা'। এবার ছবি দেখাতে হবে। মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক ও মুসলিম সমাজ নিয়ে গবেষণা করে এমন একটি সংস্থা *স্যাপ* এগিয়ে এল ছবি প্রদর্শনের জন্য, প্রেস ক্লাবে।

এত বছর ধরে ছবি করছি ওইরকম ভিড় কোনদিন দেখিনি। নানা জায়গা থেকে এমন সব সাধারণ মুসলমানরা ছবি দেখতে এসেছে যাদের শহরে সিনেমার প্রিমিয়ারে একেবারেই দেখা যায় না। বস্তুত এই ছবিটি আমার কাছে এক ধরনের টার্নিং পয়েন্ট। দেখার চোখ পাল্টাল, সংখ্যালঘু সমাজকে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। ছবিটা শেষ হতেই আমার বন্ধু নামী এক অভিনেতা ছি ছি করতে করতে বাইরে এলেন— এ কী করেছ, এইটা ছবি? এ তো সাম্প্রদায়িক উস্কানি! অভিনেতাটি বামপন্থী। আমি থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম। পরবর্তী সময়েও দেখেছি চেনা বাম শিবিরে ছবিটির সমালোচনা। আরএসপি-র এক নেতা জানিয়ে দিলেন, ছবিটি ভালো লাগেনি। এক নকশালপন্থী অনুযোগ করলেন, মুসলমানদের নিয়ে ছবি করলেন অথচ আপনি সুফি গান, কাওয়ালি কিছুই ব্যবহার করলেন না! প্রগতি শিবিরের অনেক বিজ্ঞজন রায় দিলেন— কাজটা ভালো হয়নি।

এ পর্যন্ত কাহিনীটা ঠিকই আছে। একটা ছবি কারো কারো ভালো না লাগতেই পারে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম, প্রথম শোয়ের পর অতি সাধারণ যে মুসলিম তরুণরা প্রেস ক্লাব থেকে বের হচ্ছেন তাদের চোখে মুখে নীরব শ্রদ্ধা। অনেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে ধরলেন। মুসলিম সমাজের অনেক উজ্জ্বল মুখের সঙ্গে তখন থেকে যোগাযোগের সূচনা। তারা কেউ ডাক্তার, কেউ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, গবেষক। আমিরুল, নাজিব, সাবির, মুমতাজ, নাসরিন...। আরও পরে জেএনইউ-এর গবেষক আব্দুল মতিন।

সেদিন যে গোয়েন্দা পুলিশটির ওপর ছবিটি দেখে রিপোর্ট

করার দায়িত্ব ছিল সেও এগিয়ে এসে বলে গেল— স্যার, আমি মালদা-র ছেলে, মুসলমান। আপনি ভীষণ ভালো একটা কাজ করলেন। যা বলেছেন, যা দেখিয়েছেন তা একশোভাগ সত্যি।

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। একই ছবি মুসলমানদের কাছে দারুণ আর অন্য অংশের মতে— কিস্যু হয়নি। মানেটা কী? সেই সময় থেকে এই মানে খুঁজছি। এই অনুসন্ধান, এই যাত্রা।

একটা সত্যি বুঝেছিলাম। ছবির ভালোমন্দ নয়, মুসলিম সমাজের অধিকাংশই ছবিটির সঙ্গে নিজেদের রিলেট করতে পেরেছে। বাকিরা পারেনি, কারণ তারা তাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না।

ওই দিন থেকে এটাও বুঝতে পারলাম যে প্রগতি শিবিরেও মুসলিমদের সম্পর্কে অজ্ঞতা, কিছু বিদ্বেষ, কিছু উপহাস এত বেশি যে তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে গ্রাম বাংলার মুসলমানদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরেজির অধ্যাপক হাসতে হাসতে বলেছিলেন— বামদলে যে যে মুসলিম নেতা আছে, তারা স্রেফ নামে মুসলমান, তাদের সঙ্গে কমিউনিটির সামান্য যোগটুকুও আর নেই।

আর এক পর্ব

ছবির প্রথম শো-র পর দ্বিতীয় শো-র উদ্যোক্তা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা। তারা যত্ন করে ছবিটি দেখিয়েছিলেন। শুনলাম অনেকের তা ভালোও লেগেছিল। তৃতীয় শো-টি হওয়ার কথা নন্দনে। উদ্যোক্তা ফিল্‌মস ডিভিশন ও সিনে সেন্ট্রাল। ভালো। এক ফেস্টিভ্যালের সমাপ্তি ছবি— 'মুসলমানের কথা'। যেদিন হবে তার ঠিক তিনদিন আগে শুনলাম, পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে ছবির প্রদর্শন। তারা যুক্তি দিয়েছেন, ছবির সেন্সর সার্টিফিকেট নেই। নন্দন দুই-এ ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখানোর সময় সেন্সরের বাড়াবাড়ি কোনদিন ছিল না। তাছাড়া ফিল্‌মস ডিভিশন নিজে যখন এর উদ্যোক্তা। তাদের উৎসবে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না। তারা স্লট পেয়ে তা মিডিয়াকে জানিয়েও দিয়েছিল।

যেদিন ছবিটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত শুনলাম, সেদিনই রাতে বাড়িতে পুলিশ এল আমার ডিভিডি বাজেয়াপ্ত করতে। আমি কিছুটা বিস্মিত হয়ে পুরো বিষয়টা জানালাম আমার সাংবাদিক বন্ধু সুমিত সেনকে। ও তখন টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল এডিটর। আজ সে নেই। কিন্তু সেদিন প্রগতি নেতারা নন, সে-ই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছিল আমার সমর্থনে, ছবি বন্ধ করার প্রতিবাদে।

পরের দিন টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ছাপার ফলে অন্যান্য সর্বভারতীয় মিডিয়াও তৎপর হয়েছিল বিষয়টি নিয়ে। মানবাধিকার সংগঠন, লিবারেশন, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানান। আনন্দ পট্টবর্ধন, অরুন্ধতী রায়, জয়তী ঘোষ, প্রভাত পট্টনায়ক, জয়ন্ত কাক সহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ছবি বন্ধের নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন। নীরব শুধু বাংলার দৈনিক সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেলগুলো। এমনকি সিপিএম-এর দৈনিকেও এ নিয়ে কোন কথা নেই। আমার বন্ধু নাজিব আনোয়ারের পরিবার পুরনো বামপন্থী। ওর মা গণশক্তির নিউজরুমে ফোন করলেন। আমিও কিছু নাম-করা বন্ধুর রেফারেন্সে দু-একটা বাংলা চ্যানেলে ফোন করলাম। ফোন করলাম পুরনো চেনা চ্যানেল আকাশ-কেও। তারা সবাই বিষয়টি এড়িয়ে গেল।

ফেসবুকে উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, পক্ষে ও বিপক্ষে।

এত বিপুল আলোচনার মধ্যে পাড়ার এক অতি সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটির সাফাই কর্মী, সিপিএম-এর পার্টি সদস্য, ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দিল— এই 'ভদ্দরলোক' কাগজ চ্যানেল কেউ আপনার পাশে থাকবে না। আপনি যে আমাদের কথা বলেছেন! রেজিমেন্টেড বামের কেউ কেউ কেন বিজেপি হয়ে যাচ্ছে তা সেদিন থেকে বুঝতে পারছি!

এর পর পরই অবশ্য নানা মানবাধিকার সংগঠন, সিপিআইএমএল (লিবারেশন) ও আরও কিছু নকশালপন্থী গোষ্ঠী উদ্যোগ নিল 'বে-আইনি' ছবিটি দেখানোর— মুসলিম ইনস্টিটিউটে। সেদিন প্রবল ঝড় জলে লোক বেশি হয়নি। তবু যারা ছিলেন তাদের মুখ চোখের ভাবে বুঝতে পারলাম যে তাদের ভালো লাগেনি। সামান্য বিষণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ভাবলাম, হয়ত ছবিটি সত্যিই কিছু হয়নি। আমি আসলে সম্পূর্ণ অন্য একটা ফর্ম নিয়েছিলাম ছবির নির্মাণে, যা হয়ত লোকের পছন্দ হয়নি।

রাতে দুটি ফোন পেলাম। দুজনেই অচেনা। একজন সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকের চিফ রিপোর্টার, অন্যজন জেএনইউ-এ বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে রিসার্চ করছে। সে নাকি এর মধ্যেই ওই প্রেস ক্লাবের প্রথম শোয়ের পর থেকে তখন অবধি আট বার ছবিটা দেখে ফেলেছে। ওর মনে হয়েছে এ এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ছেলেটি— আবদুল মতিন— আরও খবর দিল যে সে খোঁজ নিয়ে দেখেছে দেশভাগের পর এপারের মুসলমানদের নিয়ে আর কোন ছবি নেই। সাংবাদিকটিও জানাল, ছবিটা তার খুব ভালো লেগেছে। সুফি গান, কাওয়ালি নিয়ে অনুযোগের কথা জানাতেই সে হেসে উঠল। বলল, এটাই তো সমস্যা। এরা বাঙালি মুসলমান সম্বন্ধে কিছু জানে না। মুসলমানের কিছু ইমেজ আছে, টুপি দাড়ি বিরিয়ানি গরু তিনটে বিয়ে তালাক দরবেশ, ব্যস, এই হচ্ছে মুসলমান সমাজ। বাঙালি মুসলমান অনেকেই যে বিরিয়ানির চেয়ে ঢের পছন্দ করে কলাই ডাল আর পোস্ত, তা এরা জানে না। এও তো এক নির্মাণ যা সযত্নে নির্মাণ করেছে সংখ্যাগুরু মিডিয়া, পাঠ্য বই, লেখালিখি,

সিনেমা, নাটক, নানা মাধ্যম। যাক, আমার ছবিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আমি বড়ো করে লিখছি।

কয়েকদিন পর ছেলেটি জানিয়ে দিল— সে লিখেছিল, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তা ছাপা হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, সে নিজে কিন্তু কাগজটির চিফ রিপোর্টার। আমার অবশ্য ততদিনে কারণটা আর অজ্ঞাত লাগছে না।

আমি বুঝে গেছি, আমরা স্বীকার করি বা না করি, আমাদের 'প্রগতিশীল' বাংলা পুরোপুরি ওরা-আমরায় ভাগ হয়ে গেছে। একটি ছবির নির্মাণ আমার জীবনের বহু বছরের নানা বিশ্বাস পাল্টে দিল। অনেক মুখোশকে খুলে পড়তে দেখলাম। মুসলমানের কথা বলেছি বলে আমিও প্রান্তিক হয়ে যেতে লাগলাম। বলা ভালো, আমিও পাল্টে যেতে লাগলাম। এখন কোন কথাই আর বিস্মিত করে না। এই তো সেদিন এক ডাক্তার বন্ধুর চেম্বারে গেছি। সেখানে অনেক গুণীজনের ভিড়। কবি, গায়ক, অধ্যাপক, প্রকাশক। আমার বন্ধুটি জানতে চাইলেন, আমার সঙ্গীর নাম কী। সঙ্গীটি জানালেন, তার নাম নাজীব। ডাক্তার সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন— ও রাজীব। তিনবারের চেষ্টায় ভুলটা ঠিক করা গেল।

আর একজন নিরীহ মুখে নাজীবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বাংলাদেশের কোথায় থাকেন? ও হেসে বলল, আমি হাওড়ার ছেলে। বাংলাদেশে কোনদিন যাইনি। বাম আমলের এক নেতাও আমার এক বন্ধুকে এই প্রশ্নটাই করেছিলেন— কবে এলেন বাংলাদেশ থেকে। তিনি এখন প্রাক্তন, বিশিষ্টজন, প্রগতিবাদী বোঝাতে টিভি চ্যানেলের সামনে গরু খেতে খেতে পোজও দেন। সেদিন আমার সেই বন্ধু জানিয়েছিলেন, তার দাদা বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনিও কবিতা লেখেন, বাংলা অ্যাকাডেমি সম্মানও পেয়েছেন। 'আমরা মুর্শিদাবাদের লোক। ওপারের নই।'। তবু নেতা দমবার পাত্র নন। কবিতা লেখেন শুনেই বলে বসলেন, ও শায়েরি লেখেন!

এই অজ্ঞতা, ওপরচালাকি যে একটা কমিউনিটির লোককে কতটা আহত করে তা এরা বোঝেও না, বুঝতে চায়ও না। আড়ালে বলে, 'মুসলমানরা বেইমান, ওদের জন্য এত করলাম আর ওরা কিনা আমাদের ভোট দিল না।'

এও আর এক ভুল। মুসলমানদের একই ছাঁচের এক কৌম সমাজ ভেবে নেওয়া। কে হানাফি, কে আলোহাদীস, কে ফারাজি, এসব চুলচেরা বিশ্লেষণে যাবার দরকার নেই। তবু মুসলমান হলেই ভেবে নিতে হবে ঔরঙ্গজেবের বংশধর! আইপিএস নজরুল ইসলাম একবার বলেছিলেন, 'আমি গ্রামের ছেলে। ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম তখন মাস্টারমশাইরা ক্লাসে এমনভাবে ঔরঙ্গজেবের 'শয়তানি' পড়াতেন, অন্য ছেলেরা আমার দিকে তার ফলে যেভাবে তাকাতো, মনে হতো যেন আমি ঔরঙ্গজেবের কেউ হই।'

একবার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে গেছি। পার্ক সার্কাসে। চারতলা। লিফ্‌ট আছে। ওপরে উঠে ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি সাজানো গোছানো চমৎকার ফ্ল্যাটটি। হাসতে হাসতে বললাম, মজা করেই, পেট্রো ডলার ভালোই আসছে মনে হয়? ও হাসল— এই তো ভাই আমাদের সমস্যা। হয় তোমরা বলবে, এই নেড়েরা খুব নোংরা। মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার দিয়ে হাঁটা যায় না। না হলে হয় বাদশা, নবাব, অথবা পেট্রো ডলার। কোন্‌দিকে যাব বলো তো!

আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর স্ত্রী হিন্দু পরিবারের। বিয়ের আগে মেয়েটির মামা বলেছিলেন, ছেলেটিকে তো ভালো বলেই জানতাম, কিন্তু ও মুসলমান! আমি একবার একটা কাগজের জন্য সংখ্যাগুরুদের মধ্যে একটা সমীক্ষা চালিয়েছিলাম। একটাই প্রশ্ন— মুসলমানরা কি সন্ত্রাসবাদী? নব্বই শতাংশ জানিয়েছিলেন যে সব মুসলমান নিশ্চয় সন্ত্রাসবাদী নন, কিন্তু সব সন্ত্রাসবাদীই মুসলমান। এই সমীক্ষা যাদের ওপর করা হয়েছিল তাদের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

সল্ট লেক, নিউটাউন, লেকটাউন বিভিন্ন এলাকায় বহুত ফ্ল্যাট হচ্ছে। আছেও প্রচুর। কিন্তু কজন মুসলিম আছেন সেখানে খুঁজে দেখুন। দু-একজনের বেশি পাবেন না। বাঙালি মধ্যবিত্ত এলাকায় মুসলমানরা ফ্ল্যাট কিনতে পাবেন না। ভাড়া পাবেন না। অথচ একদিন এসব এলাকার অনেক জমি ছিল মুসলমানদের।

এই আধিপত্যবাদ এ রাজ্যের বাঙালি মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করছে। এ রাজ্যের জনসংখ্যার পঁচিশ শতাংশ মুসলিম। কিন্তু সরকারি চাকরিতে তারা মাত্র দুই শতাংশ। কলেজ, স্কুল, গবেষণাগার, কোথাও তারা সেভাবে নেই। রাজনৈতিক দলগুলির নীতি নির্ধারণে তারা নেই। সংবাদমাধ্যমে তারা প্রায় নেই। কয়েক বছর আগেও বাঙালি মুসলমান সাংবাদিক ছিলেন মাত্র দশ-পনের জন। এখনও অবস্থাটা প্রায় একই আছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা-ওরার বিভাজন বড়ো চোখে পড়ছে। নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সেমিনারে যাই, সব জায়গায় আধিপত্য আমাদের মতো এলিট জনগোষ্ঠীর। আমরা বলে যাব আর ওরা শুনে যাবে— এটাই দস্তুর। এটাই চিরকাল হয়ে এসেছে। এ এক অসহ্য সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ যেখানে মাঝে মধ্যে ইদানিং আমারই দম বন্ধ হয়ে আসে, বেচারা মুসলমানদের যে আরো হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এক এক জন মুসলিম নামের বক্তা সেমিনারে থাকেন। উদ্যোক্তারা বোঝাতে চান যে তাদের উদার মানসিকতা, তারা মহান। আমরা সব করে দেব। আমরা মৌলবাদ বিরোধী সিনেমা দেখাব। আমরা নজরুলের গান শোনাব। আমরা বাবরি ভাঙার প্রতিবাদ করব। আমরা ভালো অমুক রহমান কি তমুক মহম্মদকে বক্তা করব— তোমাদের আবার মত কী? তোমাদের পরামর্শ নিতে যাব কেন। এও আধিপত্যবাদ। যে বক্তারা থাকেন তাদের

সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের কোন যোগ নেই। তারা প্রায় সবাই ‘সেক্যুলার’রা যা যা শুনতে চান তাই প্রায় প্রতিটি সভায় একই ভঙ্গিতে পাখি পড়ানোর মতো আউড়ে যান।

আমি অবাক হয়ে ভাবি যাদের জন্য সভা সমাবেশ সেমিনার, তারা কেন থাকেন না এসব জায়গায়। তখন বুঝি কোন্‌টা ভান আর কোন্‌টা সংখ্যালঘু প্রেম তা সংখ্যালঘুরা বুঝতে পারেন। ‘মুসলমানের কথা’য় এক প্রধান অধ্যাপক হাসতে হাসতে বলেছিলেন, অন্যেরা কে কতটা আমাদের কাছে টানে বা দূরে রাখে তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি।

তখন মমতা ব্যানার্জীর সরকার আমার ছবি দেখাতে দিচ্ছে না। রাস্তায় এক প্রগতিশীল বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে আমাকে দেখে প্রবল উত্তেজিত— এসব কী হচ্ছে, মগের মুল্লুক, সেন্সরশিপ নেই বলে ছবি দেখাতে পারবে না? মানে কী? তারপর সে আস্তে বলল, একটা ডিভিডি দিও তো, আগে আমি দেখি, যদি বুঝি সব ঠিকঠাক আছে তাহলে আমি বিভিন্ন জায়গায় তা দেখাব। সেই মুহূর্তে ওই বন্ধুটিকেও আমার কেমন সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনে হচ্ছিল।

আধিপত্যবাদী এই প্রবণতা যে কী জিনিস তা মুসলমানরা হাড়ে হাড়ে বোঝে, কোথাও তারা নেই, আগেও লিখেছি মিডিয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা, লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে নাটকে সিনেমায় লেখক তালিকায় এ বঙ্গের মুসলমানদের সংখ্যা হাতে গোণা।

আপনি প্রশ্ন তুলবেন, তাদের যোগ্যতা না থাকলে কী করা যাবে? আসলে এই কাঠামোটাই এমন যে সংখ্যালঘুদের শীর্ষে উঠে আসাই মুসকিল।

মালদা, মুর্শিদাবাদ— আরও যেসব জায়গায় মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক সেখানেও দেখুন রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি তাদের হাতে নেই। সবক্ষেত্রে দু-চারটে নাম আসবে। সিপিএম-এর মহম্মদ সেলিম, কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান, তৃণমূলে কিছু বেশি, সেখানে আবার দাপট জাভেদ খান, ববি হাকিমদের— যারা একজনও বাঙালি মুসলমান নন। নাটকে মনে পড়ছে না। ফুটবলে রহিম বারী ও মেহতাব হোসেন। সিনেমায় এক-আধ জন, লেখক আবুল বাশার, শাহজাদা ফিরদৌস, আফসার আহমেদ, নীহারুল ইসলাম, হাসির মল্লিক, জাহিরুল হক, মুর্শেদ এম এন ইত্যাদি হাতে গোনা কয়েকজন।

সেমিনারে বক্তাও তাই। ওই টিভি-তে মুখ দেখানোর সুবাদে সেখানে এক আধজন ডাক পান। কিন্তু ওই যে বললাম, তাদেরও অনেকের সঙ্গে সমাজের সামান্য যোগও নেই। স্রেফ উদারতা প্রমাণের তাগিদে সংখ্যাগুরু বাবু ভদ্দরলোকেরা তাদের জায়গা দিচ্ছে। এ আবার এক ধরনের আত্মসন্তুষ্টি— বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে প্রতিবাদ সভায় অমুককে আমরা ডেকেছিলাম।

মাঝে মধ্যে ওই পুজোটুজো এলে শুনবেন কেউ কেউ বলছেন, আমরা কিছু টাকা বাঁচিয়ে পাড়ার গরিব বাচ্চাদের একদিন নামী রেস্টুরেন্টে খাওয়াব। তাদের ফটোটটোও উঠবে। এই অনুকম্পা যে আত্মশ্লাঘা তা বলে দিতে হয় না। যিনি তা করছেন তিনিও বোঝেন, যাকে করলেন তিনিও বোঝেন। সে যদি বেঁকে বসে, অনুকম্পা না নেয়, তখনই গেল গেল রব উঠবে। সংখ্যালঘুরা এখনও এই অনুকম্পার রাজনীতি-সমাজনীতির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হচ্ছে না।

আমি ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যা নিয়ে ডকুমেন্টারি করেছিলাম, তখন বাম মহলে সে কী যত্নআত্তি। তাদের ভোটে জিততে ছবিটি দরকার ছিল। তাই বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স— সংগঠিত হোয়াইট কলার চাকরিজীবীদের বাম ইউনিয়ন প্রায় রোজ আমাকে ডেকে নিত— ছবি দেখাতে ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভাষণ দিতে।

এখন বুঝি, গোটাটাই ছিল এক ইস্যু মাত্র। বার্ষিক অনুষ্ঠানের অংশ। প্রতিবার স্বাগতালক্ষ্মী, শ্রীকান্ত আচার্য, লোপামুদ্রা বা নচিকেতার গান হয়, এবার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছবি। স্বাদ বদলও হবে, আবার ধর্মনিরপেক্ষ সাজাও যাবে। সেদিনে সেই দর্শক মুসলমানের কথা শুনতে চায় না। গুজরাটের তো একটা গ্ল্যামার ছিল, এখন সময় নষ্ট করে মালদার রমু হাসান বা মুর্শিদাবাদের রহিমা বিবি-র বারমাস্যা শোনার ধৈর্য কারই বা আছে! অথচ আমাদের চেনা সংস্কৃতির বৃত্তের বাইরে যে অচেনা অপর সমান্তরাল এক জগৎ আছে, তারা কিন্তু দু হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাল এই ছবি ও পরিচালককে। মুসলমানের কথা আক্ষরিক অর্থেই ‘তাদের’ কথা হয়ে উঠল। নদিয়ার রহমতপুরে এক প্রাচীন মসজিদ দেখতে গেছি, দু-চারজন কথা বলেছন, নাম জানতে চাইলেন। এ পাড়া আগে ছিল মুসলমান অধ্যুষিত, দেশভাগের পর ছবিটা বদলে গেছে। এখন গ্রামে দুটি মাত্র পরিবার মুসলমান। একজন প্রবীণ মানুষ লাঠি হাতে এগিয়ে এলেন। তিনি মুসলিম, বললেন— আপনি এসেছেন শুনে এলাম। আপনাকে দেখিনি, নামটা শোনা।

বিস্মিত, আনন্দিত আমি বুঝলাম আধিপত্যপাদী মিডিয়ার প্রচারকে তোয়াক্কা না করে একধরনের নীরব বিকল্প প্রচার ওই গ্রামের বৃদ্ধের কাছেও পৌঁছে দিয়েছে ‘মুসলমানের কথা’।

মুসলমানদের যদি বাঁচতে হয় তাহলে সর্বক্ষেত্রে এই বিকল্পের কথা ভাবতে হবে। কত ঝকঝকে ছেলেমেয়ের মুখ চোখের সামনে ভাসছে— মাসুদা, মতিন, হালিমা, রহিমা, আমিরুল, নাফিসা, মুমতাজ, নাসরিন, হাবিব, সফুরা, নাদিরা, রোহন কুদ্দুস— কেউ লেখক, কেউ ডাক্তার, মাস্টারমশাই, অ্যাক্টিভিস্ট। মাথা উঁচু করে ওরা এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রচারের আলো ওদের দিকে নেই বলে আমাদের ‘উদার’ সমাজের বৃহৎ অংশ কখনও ওদের দিকে বন্ধুর হাত বাড়ায় না।

প্রতিবাদী সভায়, মঞ্চে বলার জন্য ডাকা হয় না এদের। এ যেন স্বাধীনতা-দেশভাগের আগের বাংলা। ক্ষমতার ভাগ দিতে অস্বীকার করছে হিন্দুদের বড়ো অংশ। অনুকম্পা করে যাচ্ছে। অমুক জমিদারের প্রজারা সব মুসলিম— কী দিন ছিল, পুকুর থেকে মাছ ধরে কেমন নরম গলায় বলত মা-ঠাকরুন মাছ এনেছি। মা-ঠাকরুন বলতেন, আহা বাছা মাছটা ওই দাওয়ায় রাখ, আমাকে ছুঁয়ে দিসনা যেন। টাকি, গোবরডাঙা, ওপারের নাটোর— যেখানেই বিশাল বিশাল জমিদার বাড়ি চোখে পড়বে, সব জমিদার ছিলেন হিন্দু, প্রজারা মুসলমান। জোয়া চ্যাটার্জী *বেঙ্গল ডিভাডেড* বইয়ে পরিষ্কার জানিয়েছেন— ১৯০৫ সাল থেকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমে ধীরে ধীরে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে চলে গেল। তার পরিণাম দেশভাগ। ওপারে যে মুসলমানরা গেল তারা অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম সমাজের এলিট অংশ; এপারে থেকে গেলেন গরিবস্য গরিব কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, দিনমজুর, ছোট দোকানদার, জরি, বিড়ি শিল্পী, জেলে, আরও সব অসংগঠিত ক্ষেত্রের লোকজন।

এতদিন বাদে সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুসলমানদের কেউ কেউ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। পড়াশোনা করে নিজের নিজের ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা আর করুণার পাত্র হয়ে বাঁচতে চান না, সমাজের সব ক্ষেত্রে যা তাদের প্রাপ্য তা এবার তারা বুঝে নিতে চাইছেন। যা হতে পারত পারস্পরিক ভালোবাসা শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এক সংহত মানবগোষ্ঠী, তা আজ নানা কারণে পরস্পরের মুখোমুখী হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এর জন্য মূল দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের।

যেভাবে একদিন তাদের বাংলা ভাগের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, আজ আবার সেই একই কৌশলে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। নানা ছুতোয় তাদের প্রান্তিক করে রাখার চেষ্টা চলছে।

আমার ছবিতে গ্রামের এক সাধারণ মহিলা বলছেন, স্কুল সার্ভিস পরীক্ষায় ছ নম্বরে তার নাম ছিল। আগের পরের সবার চাকরি হয়ে গেল। তার হলো না। জানতে চাইলাম— কেন? ঘুষ চেয়েছিল? উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন— তা তো চেয়েইছিল, কিন্তু তা নয়। আবার চুপ। আমার প্রশ্ন— তাহলে? এবার কিছুটা রেগে তিনি জানালেন— মুসলমান বলে চাকরি দিল না।

বসিরহাট হিঙ্গলগঞ্জের প্রাণবন্ত মেয়ে হালিমা। রবীন্দ্রভারতীর এমএ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুসলমান মেয়েদের সংগঠিত করছে কয়েক বছর ধরে। ওকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম— মুসলমান বলে কি অসুবিধা হয়? একটু চুপ করে থেকে বলেছিল— তা হয় দাদা, বিডিও অফিসেও হালিমা টালিমা শুনলে যেন কেমন করে তাকায়। যেন আমরা অন্য গ্রহের লোক বা সন্ত্রাসবাদী।

কালিয়াচকের ওই মহিলা বা হালিমা যা বলছে তা ভুল হতে পারে। ওদের বোঝার ভুল। কিন্তু কেউ মিথ্যা বলছেন না। এই ক্ষোভ অভিমানটা না বুঝলে অন্য সম্প্রদায় কোন দিনই আর এক সম্প্রদায়ের বন্ধু হতে পারবে না।

এর পাশাপাশি এখন আর এক বিপদ সন্ত্রাসবাদ। মুসলিম হলেই লোকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকায়। আমি একবার কিছু মুসলিম তরুণকে বলেছিলাম— তোমরা কেন নিজেরা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করো না। সেখানে তো গুজরাট, কাশ্মীর নিয়ে ছবি দেখাতে পারো। ওরা মাথা নেড়ে বলেছিল— না স্যার, আমরা পারি না। আমরা ওসব ছবি দেখালে দেশদ্রোহী বলে ধরে নিয়ে যাবে।

সারা দেশ দৌড়ে বেড়াই, কত কত মুসলিম তরুণকে যে পুলিশ স্রেফ সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করেছে তার সংখ্যা কেউ জানে না। অনেকেই পাঁচ-সাত বছর জেলে কাটিয়ে শেষে নির্দোষ প্রমাণ হওয়ায় ছাড়া পাচ্ছেন। কিন্তু এই যে এত বছর জেলে কাটানো— আর কি সে সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে পারবে?

এ রাজ্যেও এরকম ঘটনা ঘটছে। রোজ সংবাদমাধ্যমে জানা যাচ্ছে, কোন না কোন 'সন্ত্রাসবাদী' কোথাও বা কোথাও ধরা পড়ছেন। কজনের শাস্তি হচ্ছে, কজন দোষী প্রমাণিত হচ্ছে তা আমরা জানতেও চাই না।

দেশভাগের কথা বলেছি। এক নদীয়াতেই কিছু না হোক অন্তত আড়াই লাখ মুসলমান ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে ওপারে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই রিফিউজিদের যন্ত্রণার কথা কিন্তু আমাদের সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্রে একবারও উঠে আসেনি। আসে না।

নিরাপদ দূরত্বে বসে আমরা সেমিনার করি, ভাষণ দি, হালফিল কোন ঘটনা ঘটলে মোমবাতি জ্বালাই। ভালবাসি না, কাছে ডাকি না। এভাবেই 'প্রগতিশীল' হৃদয়েও বাসা বাঁধে হিন্দুত্ব। সল্ট লেকে, লেক টাউনে, পাটুলি, নাকতলায় নাম ভাঁড়িয়ে লোকের বাড়িতে ঠিকে ঝি-র কাজ করে মুসলিম কিশোরী। নিজের নাম বললে কাজ পাবে না— এ আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। অন্য ঘরে সে যখন ভয়ে ভয়ে কাজ করে বাড়ির কর্তা তখন ব্যস্ত রবীন্দ্রপাঠে। হয়ত কলেজে পড়ান। ক্লাসে আজ বলতে হবে সাম্প্রদায়িক মন ও রবীন্দ্রভাবনা নিয়ে। এভাবেই দিন যায় রাত নামে। 'আমরা' হাঁটি চলি বলি উজ্জ্বল আলোয়। 'ওরা' অধিকাংশই থেকে যায় নিকষ অন্ধকারে।

হেজিমনি, আধিপত্যবাদের ধাক্কায় ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে সংখ্যালঘু জীবনের বারোমাস্যা। বিবর্ণ হয় তাদের যাপনচিত্র। ❐

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পণ্য-সর্বস্ব পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও পরিবেশ

সবুজ কর

আধুনিক পরিবেশবিদ্যা গত কয়েক দশকে জ্ঞানচর্চায় এবং রাজনীতির মহলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও সমাজ বিকাশের প্রায় প্রতিটি স্তরেই পরিবেশকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা মানুষ চালিয়ে নিয়ে গেছে সেই সময়ের মতো করে। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে শেষ দশকগুলোতেই; আর অভাবনীয়ভাবেই শেষ দশকগুলোতেই আমরা দেখছি পরিবেশ বিষয়ক নৈতিকতা সবচেয়ে অসহনীয় জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে— কী চেতনায়, কী অভ্যাসে। পরিবেশ সংস্কৃতির আলোচনায় তাই নৈতিক অবস্থানের সাথে অভ্যাস এবং বিকল্প অভ্যাসের আলোচনা যুগপৎ চলতে থাকবে। পরিবেশ-প্রকৃতিকে দেখার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জুড়ে আলোচনা করতে লাগবে জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদির মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো পৃথকভাবেই বিশদে চর্চার দাবি রাখে। আবার প্রকৃতিকে ধ্বংস করার মূল উৎসগুলো খুঁজতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম, অর্থনীতি এবং প্রকৃতির নিয়মাবলীর (বিজ্ঞান) আলোচনায় আমাদের প্রবন্ধটি পিচ্ছিলভাবে প্রবেশ করবে; তবুও আমরা সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করব পরিবেশ-নৈতিকতা ও পরিবেশ-সংস্কৃতির বিষয়েই।

সাধারণ অবস্থানসমূহ

আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রকৃতিকে দেখার দার্শনিক অবস্থানটি খানিকটা হলেও স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সবগুলিই মনে করে, 'ঈশ্বর এই দুনিয়া (প্রকৃতি অর্থে) তৈরি করেছে মানুষের জন্য। সমস্ত উপাদান সাজিয়ে তারপর মানুষকে তৈরি করেছে। কোনো সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়া এমন সুসজ্জিত জিনিস হতে পারে না; যেমন এমনটা হতে পারে না যে হিমালয়ে ধ্বস নেমে পাদদেশে একটি সুসজ্জিত শহর তৈরি হয়ে গেল।' এসবের অর্থ হল প্রকৃতির সমস্ত উপাদান শুধুমাত্র মানুষেরই জন্য। মানুষের 'সম্পত্তি', 'আমার ছাগল, আমি ল্যাজে কাটব না মুড়োয় কাটব আমার ব্যাপার'। এই গোটা ধারণাটাই প্রকৃতির সাথে সমঝোতা ক'রে, খাপ খাইয়ে চলার বিরোধী। আধুনিক যান্ত্রিক বস্তুবাদী বিজ্ঞান বিশ্ব সৃষ্টিতে ও চলার পথে কোনও 'সচেতন উদ্যোগ'কে নস্যাৎ করলেও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে সেও 'মানবকেন্দ্রিক'। ফলশ্রুতিতে প্রকৃতির উপাদানগুলোর প্রতি সে 'অমানবিক' বা নৃশংস। অথচ দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া প্রয়োজন ছিল 'প্রকৃতিকেন্দ্রিক' এবং 'মানবিক'। বিজ্ঞান মানুষকে অন্য প্রাণীর তুলনায় আলাদা করে দেখে— 'একমাত্র মানুষই তার আশপাশের পরিবেশটা নিজের প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে ফেলতে পারে'— ধারণাটাই আত্মঘাতী। এই ধারণাটাই বিজ্ঞানকে ক্রমাগত প্রলুব্ধ করেছে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বদলে ক্রমাগত নিজের 'প্রয়োজন' মতো পরিবেশের বগ্গাহীন পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটাতে। সর্বোপরি প্রকৃতিকে জয় করার একটা ধারণা বহুদিনই ছিল। মানুষ নিজেই প্রকৃতির অঙ্গ, তাই প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার ধারণাটা শুধুমাত্র আত্মঘাতী নয়, সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক। বাস্তবিক অর্থে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, যেখানে যেখানে সে জিতে যায় সেই সেই ক্ষেত্রগুলো থেকে প্রায় ঘাড় ধরে আদায় করে তার প্রয়োজনটুকুই নয়, তার চেয়ে অতিরিক্ত অনেক কিছু।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মগুলো বুঝে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকাটাই প্রয়োজন। এটাই আমাদের প্রাথমিক দার্শনিক বক্তব্য। ফলে অন্যান্য যা যা কিছু আমরা স্বাভাবিক, অপরিবর্তনীয় বা অপরিহার্য বলে ধরে নিই সেগুলোর সাথে এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার ধারণাটার সংঘাত হলে সেগুলোকে প্রশ্নাতীত ছাড়পত্র দেওয়া যাবে না। তার মানে অবশ্য সব কিছু ছেড়ে জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার কথা বলছি না। কোনও কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থার কথাও বলছি না। এমনকি কোনও সুবর্ণ অতীতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের কথাও বলছি না— যা কিনা কোনোকালেই ছিল না।

প্রকৃতির ব্যাপারে জ্ঞান আহরণ, জ্ঞানতত্ত্ব এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক, অন্যকথায় পরিবেশ নৈতিকতা, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই সমাজ বিকাশের ধারায় পরিবেশ-সংস্কৃতি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে সেটা আগে সংক্ষেপে বুঝে নিতে হবে।

সমাজ বিবর্তনের ধারায় পরিবেশ-নৈতিকতা

বনবাসী, শিকারি মানুষের সমাজ (অথবা না-সমাজ), যখন কোনো বিভাজন ছিল না, আমাদের আলোচনার শুরু সেখান থেকেই। অসাম্য তো নেই-ই (যাকে বলা হয় আদিম সাম্যাবস্থা) আধিপত্যও নেই। আধিপত্য করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি মোটেও নয়, বরং বহুবার দেখা গেছে (না-) উৎপাদনের (শিকার বা সংগ্রহ) এই প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বা অবাঞ্ছিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তোলার প্রচেষ্টাগুলো জন্ম দিয়েছে মানব সমাজের মধ্যে আধিপত্যের এবং একই সঙ্গে প্রকৃতির উপাদানগুলোর মধ্যেও আধিপত্যের ধারণার। একই প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়েছে দেবতার ধারণার। অসাম্য তৈরি হয়েছে অনেক পরে। উদ্বৃত্ত তৈরি হওয়ার পর তবে এসেছে অসাম্য; সেটা কৃষিকাজ শেখার পর।

বন্যাবস্থার নিম্নতর স্তরে যূথবদ্ধ অবস্থায় থাকলেও গোষ্ঠীর ধারণা তখনও আসেনি, ভাষার সবে উদ্ভব হতে শুরু করেছে,

এমতাবস্থায় গাছ, পশু-পাখি, নদ-নদী, পাহাড় এবং অন্যান্য মানুষরা সকলেই একজন মানুষের কাছে একক এবং সহ-নাগরিক। পাহাড়, পশু-পাখি, গাছ, সূর্য, ঝড় ইত্যাদি সকলেই সহ-নাগরিক, কোনোরকম দেবত্বের ধারণা ছাড়াই। ভাষার উদ্ভব এই সময়পর্বের সূচক। ফলমূল খাওয়ার দশা পেরিয়ে যখন মাছ— আগুনে ঝলসানো মাছ, তার পর শিকার করে মাংস খাওয়ার স্তর অতিক্রম করে বন্যাবস্থার মধ্যস্তরে পৌঁছালো তখন এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত হল। খাদ্য তালিকায় মাছ সংযোজিত হওয়ার কারণে সমুদ্র উপকূল বা নদীর তীর বরাবর ছড়িয়ে পড়তে লাগল যূথবদ্ধ মানবকুল; গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার বাস্তব অবস্থা তৈরি হলো। বৃদ্ধরা খাদ্য আহরণে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও তাদের অভিজ্ঞতা নবীনদের কাজে আসতে শুরু করল। তারা জ্ঞানী, কিন্তু গোষ্ঠীর প্রধান নয়; গোষ্ঠীর প্রধান শারীরিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিটি। শিকারে যাওয়ার আগে বৃদ্ধদের যেমন অনুমতি নেওয়া হতো, তেমনই অনুমতি নেওয়া হতো পাহাড়, জঙ্গল, সূর্য ইত্যাদির; তারাও বৃদ্ধ। এক একটা একক গাছ বা পাহাড়, সূর্য, ঝড়, গোটা জঙ্গলটা এখন সহ-নাগরিক থেকে দেবতা হয়ে উঠল।

আধিপত্যের ধারণা শুরু হল এর পরের স্তরে। জ্ঞানবৃদ্ধরা আস্তে আস্তে প্রধান হয়ে উঠল। সাথে সাথে পাহাড়, গাছ, নদী, প্রাণী, সূর্য-চাঁদ-ঝড়-বৃষ্টি, এসবের আলাদা আলাদা দেবতা থেকে পাহাড়ের দেবতা, নদীর দেবতা, মহিষের দেবতা ইত্যাদি তৈরি হল। দেবতার ধারণা আর একটু বিমূর্ত হলো। পরিবেশ, দেবতা এবং সমাজ হাত ধরাধরি করে বিবর্তিত হতে লাগল।

বন্যাবস্থার উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দেখা গেল মানুষের সমাজে আধিপত্যের একটা মোটাদাগের ক্রম তৈরি হয়েছে; একইভাবে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যেও ক্রম তৈরি করছে মানুষ, দেবতাদের মধ্যেও ছোটো-বড়ো বিচার হচ্ছে। মানুষের তুলনায় গাছপালা, পাহাড়, নদী, সূর্য, ঝড় ইত্যাদি এবং দেবতারা আধিপত্যের বিচারে উঁচু জায়গায় আছে ধরে নিয়ে মানুষের সমাজে আধিপত্যের ক্রম মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে। এখনো সমাজে বস্তুগত অসাম্য নেই। আছে আধিপত্যের ক্রম। এই সময়টা নব্য প্রস্তর যুগ। কাঠের বাসন ও আদিম নৌকা এ সময়ের সূচক।

কৃষি-পশুপালনের যুগে প্রবেশ

ফলমূল সংগ্রহ আর শিকারের স্তর থেকে পশুপালনের স্তরে উত্তরণের পরেই সমাজে অসাম্য এসেছে। মানুষের শ্রমশক্তি থেকে তার ভরণপোষণের পর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত তৈরি হতে শুরু করার পর। এর আগে অবধি পরাজিত গোষ্ঠীর সদস্যরা বিজয়ী গোষ্ঠীতে ভাই হিসেবে আত্তীকৃত হত। কিন্তু প্রতিপালনের পশুযূথগুলো গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর যখন পশুর বৃদ্ধি গোষ্ঠীর বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেড়ে যায় তখন থেকেই যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে কাজে লাগানো হলো পশুপালনে— অসাম্য তৈরি হল। বিজয়ী আর বিজিত গোষ্ঠীর বাস্তব পার্থক্য তৈরি হলো— একই সাথে প্রকৃতির আর মানুষের দ্বন্দ্ব, প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে জেতার, প্রভুত্ব করার ধারণা ভ্রূণাকারে তৈরি হল।

দেবতারা তখন প্রকৃতি থেকে খানিক বিচ্ছিন্ন হয়ে আরো উঁচুতে অবস্থান করছে, অর্থাৎ তাদের ক্ষমতা বেড়েছে। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো দেবতাদের হাতিয়ার মাত্র। দেবতাদের খেপিয়ে দিলে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিয়ে প্রতিশোধ নেয়। পাপ-পুণ্যের বোধ তৈরি হচ্ছে। সমাজে আধিপত্য আরও জটিল, আরও নিরবচ্ছিন্ন হতে থাকল। কারণ একমাত্র তা দিয়েই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ভোগদখল সুনিশ্চিত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই 'অপরাধ' এবং 'নৈতিকতা' প্রায় একই সাথে তৈরি হলো। কৃষিকাজ আবিষ্কারের সাথে এই প্রক্রিয়াটা আরো ত্বরান্বিত হলো।

জটিলতা এলো অন্য জায়গায়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে। তখনো অবধি সন্তানের পরিচিতি মায়ের পরিচয়ে; মাতৃতান্ত্রিক না হলেও মাতৃঅধিকার ভিত্তিক সমাজ। সন্তানের অধিকার মায়ের সম্পত্তিতে। পশুর দল বা দাসদের মালিক হতো পুরুষরা, গৃহস্থালির জিনিস এবং কৃষির উপকরণ, কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের মালিক মেয়েরা। মায়ের কৃষি-সম্পর্কিত সম্পত্তি সন্তান পেলেও পুরুষের সম্পত্তি তার সন্তান পেত না, বরং তার ভাইবোন বা বোনের সন্তানরা পেত। যারা স্থায়ী বসতি গড়ে কৃষিতে বেশি জোর দিল, তাদের পুরুষরা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকল। নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্য তারা সচেষ্ট হয়ে উঠল। পুরোনো আধিপত্য আর নৈতিকতার ওপর দাঁড়িয়ে পুরুষরা শক্তিশালী সমাজ ও তার নিয়মকানুন ইত্যাদি বানাতে লাগল।

জন্ম হলো রাজনীতির। রাষ্ট্রের তখনও জন্ম হয়নি। রাজনীতির জোরে পুরুষের উত্তরাধিকার সন্তানে বর্তানোর কাজটি করা হলো। এটা স্ত্রীজাতির ঐতিহাসিক পরাজয়। শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয় নয়, তারপর স্ত্রীজাতি হলো পুরুষের পদানত, শৃঙ্খলিত, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। পরাজিত জাতি, স্ত্রীজাতি আর প্রকৃতির নানান উপাদান আধিপত্যের পিরামিডের তলায় দিকে এসে মিলিত হলো একই প্রক্রিয়ায়। যারা কৃষিকাজকে গ্রহণ করে স্থায়ী হলো না, তারা যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে চাষবাস এবং/অথবা শস্য লুঠ ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। তাদের গোষ্ঠীতে বরং মেয়েদের এমন করুণ পরিণতি ঘটল না।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ভব, পরিবেশ-নৈতিকতার রূপান্তর

এখনো অবধি দেবতা এবং রিচুয়াল্‌স তৈরি হলেও তা সম্পূর্ণতই পেগান। কৃষিভিত্তিক সমাজেও। লোহা আবিষ্কারের আগে তারা বসবাস করত সাধারণভাবে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাওয়া নদীর পাশে। নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু নদের তীরে পুরানো

যেসব নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে সবকটিই এই চরিত্রের। লোহা আবিষ্কার জঙ্গল কেটে উর্বর জায়গায় বসতি স্থাপনকে প্রভাবিত করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোরও উদ্ভবের প্রবেশবিন্দু এটাই। ন্যূনতম হাতিয়ার নিয়ে গায়ে গতরে জমি চাষ করে যে পরিমাণ উৎপাদন করা যায় তাতে প্রচুর লোকের ভরণপোষণ সম্ভব নয়। সাধারণ নিয়মেই জন্ম/জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিতভাবে স্বল্পহারে বেড়েছে, শ্রমবিভাজন তীব্র হয়নি, বিমূর্ত-শ্রমের উদ্ভব হয় নি। শক্তপোক্ত রাষ্ট্র, লোহা আবিষ্কার, জমিতে পশুশক্তির ব্যবহার আর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সবকটিরই একসাথে উদ্ভব হয়েছে। নিজের গোষ্ঠীর বৃদ্ধির জন্য ধর্ম দাওয়াই দিয়েছে অত্যধিক সন্তান ধারণের। কৃষিক্ষেত্রের প্রকৌশলও আরো বেশি মানুষকে কীভাবে খাওয়ানো যায় সেই বাসনাতেই বদলাতে বদলাতে গেছে।

যে প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীগুলো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম গ্রহণ করেনি এখনো দেখা যায় তারা তাদের রীতি অনুসারেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মের আগ্রাসী দাপটে গোটা বিশ্বজুড়েই তারা কোণঠাসা। তারা বেঁচে আছে প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে। অন্যদিকে ধর্ম আর রাষ্ট্রের আঁতাত মানুষকে নিয়মের দাস বানিয়ে শত শত বছরের স্থবিরতা তৈরি করেছে। জমি তখনও ব্যক্তিগত হয়নি। রাজা রাজস্ব নেয়, কিন্তু রাজা মালিক নয়, রক্ষাকর্তা। দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্য এসময়ের বৈশিষ্ট্য। বহুমূল্য রত্ন, খনিজদ্রব্য, মূল্যবান পোশাক, ঘোড়া, মশলা ইত্যাদির বাণিজ্য হলেও সাধারণ মানুষ অভ্যস্থ ছিল স্থানীয় রসদগুলোর ওপর। উদ্বৃত্ত কৃষির ওপর ভিত্তি করে শ্রমবিভাজন তৈরি হয়েছে। হস্তশিল্প উৎকর্ষের এক সীমায় পৌঁছায় এ সময়ে।

এ সময়পর্ব অবধি পরিবেশকে বদলে ফেলার কর্মকাণ্ড ছিল স্বল্পমাত্রায়, প্রক্রিয়াটা ছিল মন্থর। আর বেশিরভাগটাই চলতে হত পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। ফলে প্রকৃতি-মানুষে ভারসাম্যে যেটুকু সমস্যা হত তা ছিল নিয়ত পূরণীয়। এরপরে এল সেই যুগ— প্রকৃতির ওপর আধিপত্য কায়েম করার যুগ, আশপাশের পরিবেশটা দ্রুত পাল্টে ফেলার যুগ। আগেকার ছোটো মাত্রায় প্রযুক্ত কর্মকাণ্ডগুলো ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হতে থাকল, উৎস থেকে সমগ্র অর্থনীতিতে, এমন কি বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। পরিবেশ সমস্যার চরিত্রটাই বদলে গেল।

পুঁজিবাদে প্রবেশ

এই যুগটির ভিত্তি রচিত হয় জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বজনীন সম্পত্তি থেকে ব্যক্তি-মালিকানার আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে। শক্তপোক্ত রাষ্ট্র তৈরি করে হিংসা, জুলুম বলপ্রয়োগ আর আইনি বাধ্যতার মধ্য দিয়েই এই রূপান্তর সম্ভব হয়। যৌথ সমাজজীবন থেকে 'মুক্ত' হয়ে অধিকাংশ মানুষ কেবলমাত্র নিজের শ্রমশক্তির ওপর ব্যক্তি মালিকানার অধিকারী হলো। আদিম সঞ্চয়নের মাধ্যমে জন্ম নেয় পুঁজি; একই সাথে জন্ম হয় নতুন দুটি পণ্যের— শ্রমশক্তি আর প্রাকৃতিক সম্পদ (জমি, কাঁচামাল)। প্রকৃতি আর শ্রমশক্তির হাজার হাজার বছরের বন্ধন ছিন্ন হয়। শ্রমের বিমূর্তকরণের মাধ্যমে শ্রমিকের স্ব-বিচ্ছিন্নতা চরম হয়, আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যত আশপাশের পরিবেশটা বদলে দিতে পেরেছে জ্ঞান তত হয়ে উঠেছে পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন— যা বিশ্ব বিচ্ছিন্নতারই প্রকাশ। 'প্রকৃতিকে জয় করা' আসলে 'মানুষকে জয় করা'য় পরিণত হলো। নীডহ্যামের ভাষায়, ''প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রযুক্তিগত উপকরণগুলো সামাজিক আধিপত্যের প্রক্রিয়ায় এক গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এলো।'' শ্রমশক্তিকে পণ্যায়িত করার মাধ্যমে পুঁজি স্বয়ং-পোষিত হলো বটে কিন্তু কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতি থেকে লুঠ হতে থাকে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রকৃতিতে যতটা প্রত্যর্পণ করতে পারে, এই প্রক্রিয়া তার থেকে অনেক বেশি গ্রহণ করে প্রকৃতি থেকে। এই ব্যবস্থা আসলে প্রকৃতি থেকে একটি 'লুণ্ঠন ব্যবস্থা'।

পূর্বের ব্যবস্থাগুলোতে এ সমস্যা দেখা যায় নি। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চালিকাশক্তিই হল আরো বেশি পুঁজি সঞ্চয়; তার জন্য প্রযুক্তির উন্নতি, বাজার বাড়ানো, উৎপাদন বাড়ানো, উৎপাদনের আরো কেন্দ্রীকরণ। না হলে দৌড় থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। উপরোক্ত প্রতিটি পদক্ষেপই প্রকৃতি থেকে লুণ্ঠনের গতিটা আরো আরো বাড়িয়ে তোলে। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আরো আরো মানুষের অধিকার হরণ করে পুঁজির সঞ্চয়নের ('অ্যাকুমুলেশন বাই ডিসপজেশন') কাজ চলতে থাকে। খনিজ সম্পদের জন্য, বড়ো নদী বাঁধ বানানোর জন্য মূলনিবাসী মানুষ জীবন-জীবিকা থেকে, জল-জঙ্গল-জমির অধিকার থেকে উচ্ছেদ হয়। এই লুণ্ঠন একদিক থেকে যেমন প্রকৃতিকে রিক্ত করে দেয় তেমনই প্রতিটি জিনিসই তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে প্রত্যার্পিত না হওয়ার ফলে অন্য কোথাও, যেখানে তার যাওয়ার কথা ছিল না, সেখানে গিয়ে যদি ভিড় জমায় তবে তার পুনর্ব্যবহার করার যায় না। তখন জন্ম হয় দূষণের। চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে তার পথচলাটা হয়ে যায় সরলরৈখিক। পুনর্ব্যবহারের বদলে যেহেতু সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে তুলে আনাটা কম খরচের; তাই প্রযুক্তির গবেষণাও হয় সে পথেই। পুনর্ব্যবহার নিয়ে গবেষণা নেই। আর এই ব্যবস্থার স্বয়ং-পোষিত উন্নয়নের বদলে পাখির চোখ হল মুনাফা। তাই কম খরচটাই মাপকাঠি, তার জন্য ভবিষ্যতে 'চরম মূল্য' দিতে হলেও। পুঁজিবাদ টিকতে চায়, বাঁচতে শেখায় কেবলমাত্র বর্তমানে। তার জন্য সে বাজি রাখে ভবিষ্যৎকে। পরিবেশের সমস্যাটা পুঁজিবাদে তাই আর নেহাতই পরিকাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়; বরং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। একে পাল্টাতে গেলে পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদ থাকে না। কীভাবে পুঁজিবাদ আমাদের প্রকৃতিটাকে বিষময় করে তুলেছে সে আলোচনায় আসা যাক এবার।

পুঁজিবাদী সংস্কৃতির গ্রাসে আমাদের পরিবেশ

পুঁজিবাদ তার নিজস্ব নীতির জায়গা থেকে তৈরি করা সংস্কৃতি দিয়ে জারিত করছে আমাদের মনন; সফলভাবে গড়েও নিচ্ছে। পুঁজিবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনে আমাদের চেতনা, আমাদের যুক্তিবোধ আর অভ্যাস কীভাবে দিন দিন পরিবেশ-বিরোধী হয়ে যাচ্ছে সেটাই আমরা দেখব এবার।

ভোগবাদ ও পণ্য-মানসিকতা, নেপথ্যে অতি-উৎপাদন

আগেই আলোচনা করেছি পুঁজিবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদিকা শক্তির ক্রমাগত বৈপ্লবিক বিকাশ, পুঁজির সঞ্চয়ন। অতি উৎপাদনের মহামারী থেকে মুক্তি পেতে তাকে ক্রমাগত 'নতুন বাজার দখল করতে হয়' নতুবা 'পুরোনো বাজারকে আরো পরিপূর্ণভাবে শোষণ করতে হয়'। এজন্যই আরো আরো বেশি করে 'ভোগ' এবং 'বাজার'-এর সংস্কৃতিকে হাজির করে সে। প্রয়োজন (নেসেসিটি ভ্যালু) নেই কিন্তু কিছু ব্যবহারমূল্য (ইউটিলিটি ভ্যালু) আছে এমন নানান উদ্ভট জিনিসকে বাজারে নিয়ে এসে বিজ্ঞাপনী প্রচারের জোয়ার তুলে মানুষকে সেই পণ্যের ক্রেতা করে তোলে সে।

আলোচনাটা আমরা মোবাইল দিয়ে করতে পারি। মাত্র দেড় দশক আগেও উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের বাড়ি বহুলাংশে ল্যান্ডফোন থাকলেও মোবাইল ছিল হাতে গোনা লোকের হাতে। সে যুগে মোবাইল থাকলে সুবিধা হতো, কিন্তু না থাকলেও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদ তার নিজের প্রয়োজনে হাতে হাতে মোবাইল পৌঁছে দিয়েছে। এখন মোবাইল না থাকলে খুবই অসুবিধা। কারণ সমাজ তার সবকিছু সাজিয়ে নিয়েছে সবার হাতে মোবাইল আছে ধরে নিয়ে। প্রথম যুগের মোবাইলগুলো ছিল শক্তপোক্ত, টেকসই। কিন্তু নতুন করে ধরার মতো বাজার ফুরিয়ে এলে পুরোনো বাজারকেই শোষণ করতে হয় আরও পরিপূর্ণভাবে। ফলে তারপরে মোবাইলে যোগ হতে থাকল কথা বলা, মেসেজ করা ছাড়াও নিত্য নতুন নানান ফিচার। এগুলোরও ইউটিলিটি ভ্যালু আছে, কিন্তু নেসেসিটি ভ্যালু নেই। তার সাথে এই মোবাইলগুলো আগের মতো টেকসই নয়। ফলে প্রতিবছরই আপনাকে মোবাইল বদলাতে হয়। অথচ দেড় দশক আগের ল্যান্ডফোনটি যারা এখনও রেখে দিয়েছেন, সেই যন্ত্রটি বহাল তবিয়তেই টিকে আছে। নিয়মিত আরও আপডেটেড জিনিসের পেছনে দৌড় করানো হচ্ছে সকলকে। কম্পিউটার-ল্যাপটপের ক্ষেত্রেও ঘটনাটা একই।

নিয়মিত ব্যবহার্য নানান জিনিস (যেমন পেন) তৈরি হচ্ছে শুধু একবার ব্যবহারের মতো করে (ইউজ এ্যান্ড থ্রো)। কলমের রিলিফ বদলানোর সুযোগ থাকলেও দোকানে পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও রিলিফের দাম আর কলমের দামের ফারাকটা বেশি নয়। জামাকাপড়, জুতো ইত্যাদিও আগের তুলনায় অনেক কম টেকসই এবং সস্তা। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়, রং চটে যায়। আবার নতুন নতুন রং-এর, নতুন ফ্যাশনের জামাকাপড় বিক্রি হয়। একটা প্রজন্মের তফাতেই যদি হিসেব করা হয় একটা জামা কতদিন ব্যবহার করা যায়/হয় এবং একটা মানুষের একসাথে কতগুলো জামা আছে, তাহলেই এ পার্থক্যটা বোঝা যাবে। আটের দশকের আগে যাদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না আজ তাদের পাখা ছাড়া তো চলেই না, এমনকি মধ্যবিত্তের বাড়িতেও বহুলাংশে ইনভার্টার, এসি অপরিহার্য হয়ে গেছে।

যৌথ পরিবারে যে জিনিসগুলো একটা করে বেচা যেত নিউক্লিয়ার পরিবারে তার বিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। পরিবহনের জন্য সবচেয়ে কম খরচের, শক্তি সাশ্রয়ী ব্যবস্থা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট— বড়ো গাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি। অথচ ছোট গাড়ির বিক্রি বাড়ছে। মানুষকে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে নিজস্ব ছোটগাড়ি কিনতে; দাম কমানো হচ্ছে, কিস্তি বা ইএমআই সহজে দেওয়া হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী নানান সরকারি প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণের নামে পুরনো বড় বড় সেগুন কাঠের আসবাবগুলো বেচে দিয়ে সৌখিন অপোক্ত প্লাইউডের আসবার বানানো হচ্ছে।

শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে একটি জিনিস আমাদের খেয়ালে থাকে না, সম্ভবত বৃহত্তম ক্ষেত্র সেটি, তা মানব সভ্যতায় সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয়, বলা ভালো ক্ষতিকর— তা হলো যুদ্ধের সামগ্রী। যুদ্ধের বাতাবরণকে ক্রমাগত প্রসারিত করেই যুদ্ধ সামগ্রীর বাজার চাঙ্গা হয়। জাতি-রাষ্ট্রগুলোর সরকার জনগণের টাকা দিয়ে সমর সামগ্রী কেনে কর্পোরেটদের থেকে। যে দেশের মজুত অস্ত্র, সামরিক ব্যয় বেশি তার আধিপত্যও বেশি, পুঁজির ওপর দখলদারিও তার বেশি। যুদ্ধসামগ্রীর বাজারে দখল রাখে অল্প কিছু

সারণি-১

বিভিন্ন দেশের সামরিক বাজেট (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

দেশ	*সামরিক খাতে বার্ষিক ব্যয় (২০১৪)*
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৮১
চীন	১২৯
সৌদি আরব	৮১
রাশিয়া	৭০
ব্রিটেন	৬২
ফ্রান্স	৫৩
জাপান	৪৮
ভারত	৪৫
জার্মানি	৪৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৩৪
ব্রাজিল	৩২
ইতালি	২৪
ইজরায়েল	২৩
অস্ট্রেলিয়া	২২
ইরাক	১৯

দেশ। বিশ্বের ২৩৪টি দেশের মধ্যে প্রথম পনেরটি দেশের সামরিক খাতে ব্যয় বাকি বিশ্বের সামরিক ব্যয়ের প্রায় চারগুণ।

সারণি-২
বার্ষিক সামরিক বাজেট (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে) ২০১৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৮১
পরবর্তী ১৪টি দেশ	৬৯০
বাকি বিশ্ব	৩৪০

প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী আর অপ্রয়োজনীয় জিনিস সস্তা হচ্ছে, আরো আরো বেশি মানুষের নাগালের মধ্যে আনা হচ্ছে কম গুণমানের, স্বল্পস্থায়ী উপকরণ। আরো আরো স্বাচ্ছন্দ্যের (কমফোর্ট) পেছনে দৌড় করানো হচ্ছে। অথচ আমরা ভাবছি না এর সীমা কোথায়। যেন এ প্রশ্নটাই অবান্তর। অতি উৎপাদন সবচেয়ে বেশি চাপ তৈরি করে পরিবেশে, কারণ আরো দ্রুত হারে কাঁচামাল লুঠ হয় প্রকৃতি থেকে।

বিদ্যুৎ শক্তি

গোটা দুনিয়াতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদাও। আরো বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুক্তি হিসেবে খাড়া করা হয় গ্রামে গ্রামে আরো মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় আনার কথা। অথচ অন্তত আমাদের দেশে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ২০ শতাংশ লাগে গৃহস্থালিতে, শিল্পে লাগে ৪৫ শতাংশ, কৃষিতে ১৮ শতাংশ, পরিষেবা ও বাণিজ্যে ৯ শতাংশ। অর্থাৎ গৃহস্থালিকে উপবাসে রেখে শিল্প ও বাণিজ্যকে পুষ্ট করা হয়। প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের পেছনে ব্যয় হয় বিদ্যুৎ। অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন, অতি-উৎপাদন, একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার সস্তা জিনিস আর বিপুল সমর সম্ভারের জন্যই বিদ্যুৎ নিয়ে এত কান্নাকাটি। জামাকাপড় নিশ্চয়ই লাগবে, কিন্তু তাই বলে এত? খামোকা বড়ো বড়ো আলো জ্বালিয়ে রাতের বেলায় স্টেডিয়ামে খেলা দেখার প্রয়োজন কী? কিংবা লন্ডন বানানোর চক্করে ত্রিফলা বা সৌন্দর্যায়নের নামে সারা বছর ধরে শহর জুড়ে লাইটপোস্টের গায়ে নীল-সাদা চোখধাঁধানো আলোর মালা জড়ানো হচ্ছে কোন্ প্রয়োজনে? যে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাদ দিয়েও পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য আলোকিত হোর্ডিং ও ব্যানারের পেছনে ব্যয় করা হয় তাতে কার প্রয়োজন মেটে? সাধারণ মানুষের? ৮০ শতাংশ গ্রামে নাকি বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় দিনে ৪ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ থাকে না, যখন থাকে তখনও ভোল্টেজের অবস্থা তথৈবচ।

আরো আরো বিদ্যুৎ উৎপাদনের বদলে কোথায় কোথায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করব না এটা মোটেও ভাবতে শেখায় না, প্রশ্ন তুলতে দেয় না পুঁজিবাদী সংস্কৃতি। একটা উদাহরণ দিই— পৃথিবীর বিদ্যুৎ শক্তির একক বৃহত্তম ক্রেতা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স)। বিদ্যুৎ লাগে ৩০ হাজার GwH-এর বেশি। দৈনিক জ্বালানি লাগে প্রায় ৫ কোটি লিটার। এটা ডেনমার্কের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের সমান, যে দেশটি বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিরিখে বিশ্বে ৫৭ তম স্থানে। আর তেলের ব্যবহারে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পৃথিবীর ৩৪তম দেশের যোগফলের সমান। বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে এই সংস্থাটি এখন একক বৃহত্তম সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সারণি-৩
দেশে দেশে মাথাপিছু দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বার্ষিক সামরিক ব্যয় (মার্কিন ডলারে) ২০১৩

দেশ	*মাথাপিছু দৈনিক বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট/ঘণ্টা)*	*মাথাপিছু বার্ষিক সামরিক ব্যয় (ডলার)*
নরওয়ে	৭২	৫৯৬
কানাডা	৪৮	৫২৪
সুইডেন	৪৬	৬৭৬
ফিনল্যান্ড	৩৬	৫৯৮
অস্ট্রেলিয়া	২৮	১০৩৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৬	২০২৩
সুইজারল্যান্ড	২৫	৬২৭
ফ্রান্স	২৪	৯৬১
জাপান	২৩	৩৮০
জার্মানি	২১	৫৯৬
বেলজিয়াম	২১	৪৭২
রাশিয়া	২০	৬২১
ডেনমার্ক	১৭	৮১৪
ইংল্যান্ড	১৫	৯০৮
ইতালি	১৩	৫৩৪
চীন	১০	১৩৮
আর্জেন্টিনা	৯	১০৮
ব্রাজিল	৭	১৫৭
কিউবা	৪	-
টিউনিশিয়া	৪	৮৭
ভারত	২	৩৮
পাকিস্তান	১	৪১
বাংলাদেশ	১	১১

গোটা পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই তবে দেখব, যে দেশগুলিতে মাথাপিছু ধার্য সামরিক ব্যয় বেশি, সেই দেশগুলোর মাথাপিছু দৈনিক বিদ্যুৎ ব্যবহারও সাধারণত বেশি। জীবনযাপনের উচ্চ মানের পাশাপাশি ব্যাপক পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় সমর সম্ভার তৈরিতে। জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্কের মতো আপাত শান্তিপ্রিয় দেশগুলোতে তথ্য দুটির দিকে (সারণি ৩) চোখ রাখলেই তা বোঝা যায়। নিজেরা বিশেষ যুদ্ধ না করলেও এ দেশগুলোতেই

সবচেয়ে বেশি যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানা আছে। এ দুটো ভারতের ক্ষেত্রে কম বলে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা মাথাপিছুর ক্ষেত্রে হিসেবটা ১২৫ কোটির বিপুল সংখ্যা দিয়ে বিভাজিত হয়ে যায়। মোট পরিমাণ বিচার করলে কম কিছু না। এদেশে ৪১টি বড় কোম্পানির যুদ্ধাস্ত্র তৈরির ফ্যাক্টরি আছে, আছে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র-সহযোগী শিল্প। এমনকি ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক শিল্পের মস্ত বুনিয়াদি শিল্পেরও প্রচুর জিনিস প্রয়োজন হয় যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানিকারী দেশগুলোর মধ্যে ভারতও অন্যতম। আমার গৃহস্থালিতে বিদ্যুতের উপবাস অন্যের হাতের কালাশনিকভে ঝলকে ওঠে।

বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই লাগবে, কিন্তু তা লাগুক গৃহস্থালি আর পরিষেবা (অফিস, রাস্তার আলো, রেল চলাচল) ক্ষেত্রে। সমরাস্ত্র ও অকারণ উৎপাদনে নয়।

বিদ্যুৎ শুধুমাত্র অতি-উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির ভাঁড়ারে টান দেয় আর প্রকৃতিকে রিক্ত করেই দেয় না। সঙ্গে আরো নানাবিধ সংকট তৈরি করে পরিবেশের। কয়লা, তেল বা প্রাকৃতির গ্যাস (জীবাশ্ম জ্বালানি) পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ তৈরি করতে গেলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন আরো মারাত্মক— পারমাণবিক বিস্ফোরণ নয়, শুধু তেজস্ক্রিয় বিকিরণই জীবকূলকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য যথেষ্ট। তার ওপর তো আছেই চেরনোবিল, ফুকুশিমার মতো জীবনধ্বংসী দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। বড়ো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বানাতে গেলে পাহাড় উপত্যকায় নদীতে বড়ো বাঁধ দিয়ে নদীর দু-কূলকে বহু উঁচু পর্যন্ত প্লাবিত করে জলাধার বানাতে হয়, এতে নদীর ধারের এবং নদীর বাস্তুতন্ত্র ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বহু গ্রামকে নৃশংসভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। নদীর গতিশীল ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, এমনকি প্রভাব পড়ে জলবায়ুর ওপরও।

ভারতে পরমাণু বিদ্যুতের প্রতি পুঁজিবাদের বিশেষ আকর্ষণ। যদিও ভারতে উৎপাদিত বিদ্যুতের ২ শতাংশের কম আসে পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরগুলি থেকে। ৬২ শতাংশ আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে, ১৪ শতাংশ বড়ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে আর ১৪ শতাংশ আসে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে। কয়লা শেষ হয়ে আসছে, তাই পারমাণবিক বিদ্যুৎ-ই ভবিষ্যৎ বলে একটা প্রচার আছে। যদিও সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানি আর সঞ্চিত ইউরেনিয়ামের পরিমাণ বলছে চাহিদা বৃদ্ধির হারকে মাথায় রেখে যদি বর্তমান হারেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় (অর্থাৎ ২ শতাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ) তাহলেই ৬০-৭০ বছরেই ইউরেনিয়াম শেষ হয়ে যাবে। আর জীবাশ্ম জ্বালানি চলবে অন্তত ৬৫০-৭০০ বছর। তার ওপর পরমাণু বিদ্যুতের খরচ বেশি, বিপদও বেশি। তা-ও পারমাণবিক বিদ্যুতের ওপর পুঁজিবাদের এবং আধুনিক রাষ্ট্রনায়কদের এতো ভরসা দুটো কারণে। প্রথমত, রিঅ্যাক্টর থেকে শুরু করে জ্বালানিচক্রের প্রতিটি পর্যায়, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পৃথকীকরণ ও অতি দীর্ঘ কাল ধরে সংরক্ষণ, চুল্লি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও অন্তত ৫০ বছর ধরে ডিকমিশনিং, প্রযুক্তির গবেষণা— সব কিছুতে আছে দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগের বিপুল সুযোগ— যার মাধ্যমে সরকারি কোষাগার থেকে সাধারণ মানুষের বিপুল অর্থ সাইফন হয়ে চলে যেতে পারে কর্পোরেটদের ঘরে। দ্বিতীয়ত, পরমাণু বোমা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়াম প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যুৎ চুল্লিতে ইউরেনিয়াম থেকেই তা তৈরি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ উদ্রেক করার জন্য পরমাণু বোমা একটি মোক্ষম পাঁচন। অন্য দেশের হাতে মজুত থাকার অজুহাতে নিজের পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে তোলার জন্যও পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি দরকার।

সাধারণ মানুষের বা প্রাকৃতিক সম্পদের বা পরিবেশের স্বার্থটা পরমাণু বিদ্যুতের পরিপন্থী। অনেক কম খরচে, সরকারের অনেক কম অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও অচিরাচরিত উৎসগুলো থেকে ১৪ শতাংশ শক্তি আসে ন্যাশানাল গ্রিড-এ (ক্যাপটিভ পাওয়ার ও কম নয়)। আমাদের দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ নিয়ে মোদি সরকার যতটা লাফাচ্ছে তা পুরোটা বাস্তবায়িত হলেও হয় তা হবে মোট বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ। অথচ ন্যাশনাল গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে পাওয়ার লস হয় ৮ শতাংশের কাছাকাছি। এর বিপরীতে যদি অচিরাচরিত উৎস থেকে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের দিকে জোর দেওয়া হয় তাহলে সেটা অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী, জনস্বার্থবাহী এবং পরিবেশবান্ধব হবে। কিন্তু তা পুঁজিবাদী স্বার্থের পরিপন্থী। কেননা উৎপাদন যত কেন্দ্রীভূত হবে, প্রযুক্তি যত জটিল ও বিশেষীকৃত হবে (তা যতই অ-দক্ষ হোক না কেন) ততই পুঁজির নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নাতীত হবে, শ্রমজীবী মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। 'ওসব বিজ্ঞানীদের' ব্যাপার বলে নানান প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যাবে। এগুলোই পুঁজির অস্তিত্বের বড়ো গ্যারান্টি। অচিরাচরিত বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাধান্য দিলে কয়লা-পেট্রোলিয়াম-ইউরেনিয়ামের বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পরমাণু বোমা বানানোর ঢাল হিসেবে পরমাণু বিদ্যুৎকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। এজন্যই প্রতিবছর বাজেটে, প্রতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অচিরাচরিত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গবেষণায় বরাদ্দ কম, আর শীর্ষস্থানীয় গবেষণা সংস্থার মধ্যে বরাদ্দ বেশি ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অরগাইজেশন (DRDO)-এর পরেই অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন-এর।

পরিবেশবান্ধব বস্তু

'গ্রিন', 'বায়ো' বা 'ইকো' শব্দগুলো হাল আমলে খুব ফ্যাশনেবল হয়ে উঠেছে। পরিবেশের ওপর প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে চারিদিকে শোরগোল ওঠায়, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কথা ওঠায়, ইলেকট্রনিক বর্জ্যের ঠিকমতো ব্যবস্থাপনা না

হওয়া নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ায় কিংবা নানান ধরনের বস্তুর ব্যবহারের সময় ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ বা তা ফেলে দেওয়ার পর সেটি প্রকৃতিতে মিশে বিষক্রিয়া করছে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হওয়ায় পুঁজিবাদকেও নড়েচড়ে বসতে হয়েছে নিজের মান্যতা টিকিয়ে রাখতে। নিজের বেতনভুক, তাঁবেদার বিজ্ঞানীদের মুখ দিয়ে 'ওতে কোনো ক্ষতি হয় না' জাতীয় আশার বাণী শুনিয়েও কাজে দিচ্ছে না। বাস্তবত এগুলোতে পরিবেশের ক্ষতিই হচ্ছে এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে আজকের উৎপাদন ব্যবস্থা। তার স্বীকৃতি হিসেবেই কিছু জিনিসে 'ইকো', 'গ্রিন', 'বায়ো' ইত্যাদি ছাপ্পা মেরে হাজির করতে হচ্ছে। কিছু লোক দেখানো গবেষণাও হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে অনুদান ভীষণভাবেই কম, যেটুকু পাওয়া যায় তা সরকারি সংস্থাগুলো থেকেই। অথচ বিজ্ঞান প্রযুক্তির গবেষণার সিংহভাগ অনুদানটাই দেয় বড়ো বড়ো কর্পোরেট সংস্থাগুলো। তারা যে এই গবেষণায় এক পয়সাও ঠেকাবে না সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার মতো প্লাস্টিকের প্যাকেটের উৎপাদন বাড়ছে, ব্যবহার বাড়ছে। আবার এর কার্যকারিতা নিয়ে যুক্তিও বাড়ছে আমাদের চারপাশে। পরিবেশবান্ধব নয় এমন সমস্ত জিনিস ধ্বংস করার আওয়াজ তুলতে ভয় পায় পুঁজিবাদ, কারণ সেই লিস্টে যে এক নম্বরে আছে পুঁজিবাদের নাম।

অজৈব রসায়ন, আসলে রাসায়নিক গণযুদ্ধ

অজৈব রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগের বিপদ সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হলেন র‍্যাচেল কার্সন এবং মার্কিন জিনতাত্ত্বিক এইচ জে মুলার। মুলারের কাজ ছিল তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত কারণে জীবদেহের জেনেটিক পরিবর্তন, জিনের মিউটেশন নিয়ে। আর র‍্যাচেল কার্সেনের *সাইলেন্ট স্প্রীং* (১৯৬২) ছিল বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, বিশেষত কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশকের, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে। এই বইটিকেই ধরা হয় আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনের প্রবেশ বিন্দু। পুঁজিবাদী কৃষির হাত ধরে একদিকে জমির উর্বরতাশক্তি নিম্নগামী, আর অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি উচ্চফলনশীল জাতের শস্যের প্রজাতিগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উচ্চফলনশীলতাই তখন একটা জাতের টিকে থাকার একমাত্র মাপকাঠি ঠিক করে ফেলা হয়েছে, না থাকুক তার স্বাদ, না থাকুক তার ভেষজগুণ, না থাকুক তার পুষ্টি। প্রাকৃতিক নির্বাচনে ফেল করে যাওয়া একটা কৃত্রিম জাতকে টিকিয়ে রাখতে পারে কেবলমাত্র অতিমাত্রায় সার আর কীটনাশকের প্রয়োগ। তৈরি হল কৃষিক্ষেত্রের আইসিইউ। সময়টাও মাথায় রাখতে হবে— এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। বিশ্বযুদ্ধে গোলা-বারুদ সহ নানাবিধ রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির জন্য নির্মিত কারখানাগুলোকেই অল্প পুনর্গঠন করে বদলে ফেলা হলো সার আর কীটনাশক তৈরির ফ্যাক্টরিতে। কৃষি সমস্যার প্রকৃত সমাধানের বদলে কৃষির ঘাড়ে ভর করে একটা যুদ্ধক্লান্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাই ছিল পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানী কার্সেন অভিসন্ধিটা সফলভাবে নির্ণয় করে বলেছিলেন, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয়ের প্রধান কারণ হল ''মুনাফা আর উৎপাদনের অধীশ্বররা''। কেননা আমরা বাস করি ''বৃহৎ শিল্প নিয়ন্ত্রিত এমন এক যুগে যখন যে কোনো মূল্যে টাকা বাড়ানোর অধিকারকে প্রশ্ন করা হয় না''। লক্ষাধিক অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য, যাদের মাত্র ১০-১৫ শতাংশ হয়ত বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষিত, ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবেশে এগুলি কোথায় কীভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং জীবদেহে সঞ্চিত হচ্ছে তা নিয়ে তথ্য নেই, গবেষণাও নেই। অথচ পরীক্ষাগারে তৈরি হাজার হাজার যৌগ খাদ্যজালের মাধ্যমে ঢুকে পড়ছে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যানসারের মতো মারণ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

> ক্ষতিকর কীট, আগাছা ও ছত্রাকের বিরুদ্ধে নির্বিচারে যে রাসায়নিক গণ-যুদ্ধ চালানো হচ্ছে, তা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের জন্য এক সর্বনাশা পরিণতি ডেকে আনছে। (মুলার)
>
> রাসায়নিক যুদ্ধে কেউই কখনো জেতে না, কারণ সমস্ত প্রাণই দুপক্ষের এই গোলাগুলি বিনিময়ের শিকার হয়। (কার্সেন)।

কৃষিতে কীটনাশকের প্রয়োগে কীটের এবং পশুপালনে অতিমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে জীবাণুরা বেশি প্রতিরোধীরূপে বিবর্তিত হচ্ছে ফলে উচ্চমাত্রায় কিংবা আরো শক্তিশালী নতুন কীটনাশকের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে— এ যুদ্ধ ক্রমবর্ধমান। কার্সেনের দৃঢ় বিরোধিতা ও কিছু সামাজিক আন্দোলনের ফলে ডিডিটি-র মতো বহুল ব্যবহৃত অতীব মারণ বিষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও অন্য নামে একই গোত্রের রাসায়নিক দ্রব্য রমরমিয়ে চলছে তৃতীয় বিশ্বে। মার্কিন দেশে কৃষিতে নিষিদ্ধ এমন বহু কীটনাশক এখনো ও দেশে তৈরি হয় কেবলমাত্র তৃতীয় বিশ্বে রপ্তানির জন্য।

নোবেল জয়ী মুলার ছিলেন কার্সেনের আগের প্রজন্মের, তার মূল কাজ ছিল তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে জীবদেহে জিনের পরিবর্তন, মিউটেশন নিয়ে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জীবের বংশানুক্রমে বয়ে আনা বৈশিষ্ট্যগুলোতে আকস্মিক পরিবর্তন আনতে পারে, বংশগতির প্রবাহকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। কোনোভাবেই এই পরিবর্তনের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। পরবর্তীকালে দেখা গেছে কৃষিতে ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিকও একইভাবে জীবদেহে মিউটেশন ঘটাতে পারে।

পৃথিবীতে আজ অবধি পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে ২৪৮১টি। এর সবকটি মাটির তলাতে করা হয়নি। এগুলির ফলে হিরোশিমা নাগাসাকির মতো তাৎক্ষণিক গণহত্যা না হলেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কম হয় না। বিস্ফোরণের সময় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি প্রচণ্ড তাপে বাষ্পীভূত হয়ে অগ্নিবলয়ের সাথে উপরে উঠে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছে যায়, তারপর বায়ুপ্রবাহ আর বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। তারপর সমুদ্র, জলস্রোত এবং খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে জীবজগতে। মানুষের তৈরি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ স্ট্রনশিয়াম ৯০, আয়োজিন ১৩১, সিজিয়াম ১৩৭, কার্বন ১৪, অ্যামেসিরিয়াম ২৪১, প্লুটোনিয়াম ২৩৯ এভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। মিউটেশনের দ্বারা জিনের স্থায়ী মিউটেশন ঘটাচ্ছে এবং জৈবসঞ্চয়ন (বায়ো-অ্যাকুমুলেশন) ও জৈব বিবর্ধনের মাধ্যমে সঞ্চারিত হচ্ছে।

সারণি-৪

বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে মারণব্যাধি

তেজস্ক্রিয় পদার্থ	*মারণব্যাধি*
অ্যামেসিরিয়াম ২৪১	হাড়ের ক্যান্সার, লিউকোমিয়া
আয়োডিন ১৩১	থাইরয়েডের ক্যান্সার
সিজিয়াম ১৩৭	জননকোষে জিনগত পরিবর্তন, অন্যান্য ক্যান্সার
ক্রিপ্টন ৮৫, জেনন	হঠাৎ অসুস্থতা ও মৃত্যু
স্ট্রনসিয়াম ৯০	হাড়ের কান্সার, লিউকোমিয়া, অন্যান্য ক্যান্সার
ট্রিটিয়াম	যে কোন অঙ্গে ক্যান্সার
প্লুটোনিয়াম ২৩৯	হাড়, লিভার ও ফুসফুসের ক্যান্সার

কার্সেন শিখিয়েছেন সমস্ত কৃত্রিম ব্যাপারের প্রতি পুঁজিবাদী সংস্কৃতি মুগ্ধতা আর মৌনতা শেখায় যা আমাদের শক্তি উৎসগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

বিপাকীয় ফাটল

বুর্জোয়াশ্রেণী গ্রামকে শহরের শাসনাধীনে এনেছে। এরা সৃষ্টি করেছে বড় বড় শহর, গ্রামের জনসংখ্যার তুলনায় শহরের জনসংখ্যাকে বিপুলভাবে বাড়িয়েছে আর এইভাবে জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে উদ্ধার করেছে গ্রাম্যজীবনের মূঢ়তা থেকে। এরা যেমন গ্রামকে শহরের ওপর নির্ভরশীল করেছে তেমনি ববর্র আর আর আধা-বর্বর দেশকে সভ্য দেশের আর কৃষকপ্রধান জাতিকে বুর্জোয়া প্রধান জাতির ওপর, প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল করেছে।

জনসংখ্যার, উৎপাদনের উপাদানের এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমশই বেশি বেশি করে ঘুচিয়ে দেয়। জনসংখ্যাকে এরা পুঞ্জীভূত করেছে, উৎপাদনের উপাদানকে এরা কেন্দ্রীভূত করেছে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি জড়ো করেছে।...

জনসংখ্যার এরূপ কেন্দ্রীভবন, শহর আর গ্রাম তৈরি করা সম্পূর্ণতই পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য। এর আগের সমাজব্যবস্থায়-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নগর থাকলেও শহর ছিল না। গ্রাম যেমন অর্থনীতি, পণ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য শহরের ওপর নির্ভরশীল, তেমনই খাদ্য, তন্তু ইত্যাদির জন্য শহর পুরোদস্তুর নির্ভরশীল গ্রামের ওপর। পুঁজিবাদের আমলে কৃষি আসলে একটা দস্যুবৃত্তি, যা মাটিকে রিক্ত করে। খাদ্য, তন্তু, এমনকি বাড়ি বানানোর ইট হিসেবে মাটির লাশ গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এর অর্থ, মাটির অত্যাবশ্যক পুষ্টিগুণ (অধিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় মৌল উপাদান ও স্বল্পমাত্রায় প্রয়োজনীয় মৌল উপাদানসমূহ)-গুলোও পাড়ি জমায় শহরে। চক্রাকারে মাটিতে ফিরে আসার বদলে সেই অত্যাবশ্যক খাদ্যগুণগুলি শহরে দূষণ ঘটাচ্ছে, অথচ সেগুলোর অভাবে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিকভাবে বিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার যে স্বয়ং-পোষিত ব্যবস্থা ছিল তাতে ফাটল ধরেছে আর সে ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে।

রসায়নবিদ ইয়ুস্টুন ফন লিবিগের এ তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে জমির উর্বরতাশক্তির হ্রাসের কারণ জানা ছিল না। কারণ ঘটনাটাই তো সাম্প্রতিক— এ সংকট তো প্রাক-পুঁজিবাদী কোনো ব্যবস্থায় ছিল না। সংকটের প্রথম পর্বে নেপোলিয়ানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, ইউরোপের কবরস্থান থেকে হাড়গোড় ও পেরুর উপকূলবর্তী দ্বীপ থেকে পক্ষী-মল সংগ্রহ করে আমেরিকা-ইয়োরোপের কৃষিজমিতে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। বিংশ শতকে রাসায়নিক সার আবিষ্কারের পর মনে হয়েছিল যেন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল, কিন্তু এই প্রক্রিয়া ডেকে আনল রাসায়নিক গণযুদ্ধকে; সংকট আরো প্রকট হল।

এ সংকট থেকে মুক্তির উপায় একটাই। গ্রাম আর শহরের পার্থক্যকে মুছে ফেলা অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করা। অথচ পুঁজিবাদী সংস্কৃতি নিজগুণেই বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধী। গোটা বিপাকীয় ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার বদলে পুঁজিবাদ জেনে বুঝে ফাটলকে বাড়াতে লেগেছে। প্রথমত, সারা বছর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন চাষ যা চক্রাকারে নানা পুষ্টিগুণ মাটিতে ফিরিয়ে আনত তার বদলে প্রতিবছর একই ফসল চাষের নীতি বাস্তবায়িত করছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামের উন্নয়নের এক নম্বর মাপকাঠি ঠিক করা হয়েছে ঝকঝকে রাস্তা, যাতে আরো তাড়াতাড়ি ফসল ও সস্তার শ্রমিক গ্রাম থেকে শহরে আনা যায়, প্যাকেটজাত ভোগ্যপণ্য গ্রামে পাঠানো যায়। তৃতীয়ত, পাকা স্যানিটারি পায়খানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, প্রবল চিৎকার চলছে সে নিয়ে। এমনকি মোদীর মতো হিন্দুত্ববাদীও বলছেন, 'টেম্পল'-এর থেকে 'টয়লেট' বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্যানিটারি টয়লেট মানে গ্রামে যে খাদ্য ব্যবহার হলো তার পুষ্টিগুণটুকুও মাটিতে ফিরে না আসা। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মাঠে যাওয়া আর 'স্যানিটারি টয়লেট' ছাড়া অন্য বিকল্পের কোনও খোঁজ চলছে না। অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে সে বিকল্প অসম্ভব কিছু নয়।

খাদ্যের উৎস— কৃষি পশুপালন

খাওয়া মানে শুধু পেট ভর্তি করা বা মুখে সুস্বাদু লাগছে কিনা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার পুষ্টিগুণ। সংস্কৃতির বহুত্বকে

ধ্বংস করে পৃথিবী জোড়া এক 'সমসত্ত্ব' সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি খাদ্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে গিয়ে উচ্চফলনশীল চাষের রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে। খাদ্যের ব্যাপারে একমাত্রিক ভাবে কেবল একটা জিনিসের পেছনে দৌড় করানো হচ্ছে— ক্যালোরি, আরো ক্যালোরি। ফসলগুলো উচ্চফলনশীল হলেও নানান ভিটামিন, খনিজ লবণ সহ নানান জিনিসের হিসেবে প্রায়শই এই ফসলগুলির পুষ্টিগুণ কম। কয়েকটি বিশেষ জাতের ফসল ফলানোর ফলে হাজার হাজার বছর ধরে আবিষ্কার করা নানান জংলি উদ্ভিদ থেকে নানান বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফসলের জাতের বিপুল সম্ভারকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। জোয়ার, বাজরা, সাগু, বার্লি খেতে ভালো না হলেও এগুলিতে এমন কিছু পুষ্টিগুণ ছিল যা চাল-গমে নেই; অথচ প্রধান খাদ্য হিসেবে আমাদের অভ্যস্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র ভাত-রুটিতে, যেগুলো আবার বর্তমানে উচ্চফলনশীল হওয়ায় অতীতেদ্দ মতো পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধও নয়। দুপুরের ভাত, রাতের ভাত, পান্তাভাত কিংবা খিচুড়ি, পায়েস, পিঠে, মুড়ি বা চিঁড়ের জন্য আলাদা আলাদা পুষ্টিগুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চাল ব্যবহৃত হত। এখন সব চালই এক। মেশিনে ছাঁটাই চালে সব পুষ্টিগুণ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, ভাত হিসেবে খাই শুধু শ্বেতসার। বর্তমান গবেষণায় এও দেখা যাচ্ছে উচ্চফলনশীল গমে গ্লুটেন বেশি থাকায় বা চালে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি হওয়ায় গ্লুটেন ইনটলারেন্স বা ডায়াবেটিসের মতো রোগের প্রকোপ বাড়ছে। তার সাথে আছে উচ্চফলনশীল চাষে অপরিহার্য ব্যাপক হারে সার, কীটনাশক প্রয়োগের বিপদ— অজৈব রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যের মাধ্যমে ঢুকে পড়ছে শরীরে— ঘটাচ্ছে মারণ রোগ। আগে বর্ষাকালে জলে-ডোবা কৃষিজমি থেকে মাছ, গুগলির মাধ্যমে বছরের একটা পর্বে প্রোটিনের চাহিদার একটা অংশ মিটত; তার দাম কম ছিল না। বর্ষার তিন মাসে একর প্রতি গড়ে ৭৫ কেজি মাছ, গুগলি পাওয়া যেত এই ভাবে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে জমিতে এখন কোনো মাছ হয় না। আগে যেভাবে 'জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে' পোকারা নিয়ন্ত্রিত হতো কীটনাশকের প্রয়োগ তা ছারখার করে দিয়েছে। কৃষিতে অপকারী নয় এমন অনেক পোকার জন্মহার বর্তমানে বিপুল বেড়ে গিয়ে তারা এখন কৃষিতে অপকারী পোকার তালিকাভুক্ত হয়েছে। আর অতীতের অনেক অপকারী পোকাই কীটনাশক-প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। একটা বাস্তুতন্ত্রে একটা প্রাণী বা একটা অজৈব বস্তুর ভূমিকা তার গুরুত্ব না বুঝে নির্বিচারে ধ্বংস করলে কী পরিণতি হতে পারে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। জিএম জাতীয় চাষ তো আরো ক্ষতিকর। বিষ এতদিন ছিল শস্যের বাইরে, এখন শস্যের ভেতরেও।

অন্ধভাবে মুনাফা-সন্ধানী কৃষি আবহাওয়ার ওপরেও প্রভাব ফেলছে। উচ্চফলনশীল বোরোচাষ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারে টান পড়ছে। প্রাকৃতিক জলবিভাজিকাগুলো আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় কিংবা ব্যারেজ বানিয়ে কৃষিজমিতে পাঠিয়ে দেওয়ায় মরুভূমির সম্প্রসারণ দ্রুত হয়েছে। আধুনিক গবেষণা বলছে বার্ষিক বৃষ্টিপাতও এতে প্রভাবিত হয়েছে। নদীর নাব্যতা কমায় উচ্চগতিতে বন্যার প্রকোপও বেড়েছে।

শিল্পক্ষেত্রেও যেমন পুঁজিবাদ উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ করেছে কৃষিতেও তার বিপরীত হয়নি। গোটা পৃথিবীকে আলাদা আলাদা শস্য, ফল, সব্জি এমনকি মাংস উৎপাদনের জন্য আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করে নিয়েছে। লাতিন আমেরিকা সংলগ্ন কিছু দ্বীপ তো সম্পূর্ণত একই ধরনের চাষ হয়, এমনকি কিছু দেশকে তো সরাসরি কফি বা কলা বানানোর কৃষি উপনিবেশ বানিয়ে ফেলেছে। আর খাদ্যশস্য পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে নিয়ে যেতে যে বিপুল পরিমাণ পেট্রোলিয়াম পোড়ানো হচ্ছে তাতে যা ক্যালোরি খরচ হচ্ছে তা বহুক্ষেত্রেই রপ্তানিকৃত খাদ্যের ক্যালোরির থেকে কম। সঙ্গে বিপাকীয় ফাটলের সমস্যা তো আছেই।

বিপুল জনগণকে খাওয়ানোর জন্যই নাকি এত আয়োজন। দেখা যাচ্ছে, অল্প কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থাই গোটা পৃথিবীর খাদ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। দেশের আইন বদল হচ্ছে তাদের সহায়তার জন্য। উদাহরণ হিসাবে ভারতের সাম্প্রতিক 'বীজ আইন'-এর উল্লেখ করা যায়। অতিরিক্ত ক্যালরি সম্পন্ন, অন্যান্য খাদ্যগুণ না থাকা এবং বিষে ভরপুর কৃত্রিম খাবার খাইয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপকার আছে। প্রথমত, এতে পুষ্টি না হলেও পেট ভরে, আর পেট ভরা থাকলে মানুষ বিদ্রোহ করে না। দ্বিতীয়ত, অপুষ্টি আর বিষক্রিয়ার কারণে রোগের হার বৃদ্ধি পায়, তাতে চিকিৎসা ব্যবসাও ফুলে ফেঁপে ওঠে। তৃতীয়ত, জটিল কৃষিপ্রযুক্তি স্বাধীন কৃষককে কৃষিমজুরে পরিণত করতে পারবে। তাকে প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

অথচ প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাবার খাবো, কৃষকদের বাজার থেকে কিনব, যে ঋতুতে যে ফসল হয় সেই ঋতুতে তাই খাবো; স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাবারের ওপর নির্ভর করব, হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে আমদানি করা খাবারের ওপর নয়— একথা বললে, এগুলো করলে একদিকে পুঁজিবাদী খাদ্য সংস্কৃতি ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি বিপদে পড়বে, আর অন্যদিকে পরিবেশের সুস্থিতি ফিরবে। যদিও দালাল সরকারগুলো বর্তমানে জৈব কৃষিকে উৎসাহ দিচ্ছে, কিছু তা লোক দেখানো। নামমাত্র (মাত্র ৩ শতাংশ) জমিতে, নামমাত্র পরিমাণে। এটা করা হচ্ছে, তার কারণ ওটারও বাজার আছে। উচ্চবিত্তরা যাতে বিষমুক্ত খাবার কিনতে পারে। আর সরকার সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে এটা দেখিয়ে কিছুটা ক্ষোভ প্রশমিত করা যায়। কিন্তু যে কৃষক জৈব চাষ করছে সে জৈব খাদ্য খাওয়ার পর উদ্বৃত্তটা বাজারে আসবে এমন পরিসর তৈরি করতে নারাজ সরকারগুলো।

জলাভূমি ও অরণ্য কিংবা জল-জঙ্গল

বাজার অর্থনীতিতে নদী বা জঙ্গলের কোনো দাম নেই। সে জঙ্গলকে দেখে কাঠের উৎস, প্রাকৃতিক জলাভূমিকে দেখে চাষের

জল বা মাছের উৎস কিংবা পরিবহনের সুবিধার দিক থেকে। অথচ জমির দাম যেভাবে ক্রমবর্ধমান তাতে নদী বা জঙ্গলের এসব আশ্লিষ্ট বস্তুর থেকে জমি হিসেবে তার বাজার মূল্য বেশী ফলে নদী আর জঙ্গল আস্তে আস্তে চুরি হয়ে যায়। অথচ বাস্তুতন্ত্রে এরা এক এক জন অপরিহার্য সদস্য। এদের মূল্য অপরিসীম, কিন্তু দাম কম। প্রকৃতিতে অরণ্য ফুসফুস আর জলাভূমি কিডনি। এমনকি সভ্যতার নানান উৎপাতকেও শোষণ করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে এদের। অবশ্য তারও একটা সীমা আছে।

নদীকে পুরোদস্তুর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কত আয়োজন। বড় বড় ব্যারেজ করে বেঁধে ফেলা হচ্ছে, নদীগুলোকে পরস্পর জুড়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, নদীর যে প্লাবনভূমি নদীরই অংশ তা পুরোপুরি দখল করে প্রথমে চাষবাস, তারপর মাছচাষের ভেড়ি, তারপর ইটভাটা এমনকি নগরায়ণ অবধি করে ফেলা হচ্ছে। আর নদীর মূল খাত হয়ে উঠছে শহর আর শিল্পক্ষেত্রের বর্জ্য নিক্ষেপ করার জায়গা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যারেজ বানানোর ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়নি, বরং নদীখাতে পলি জমা হয়ে নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমেছে, তাই বন্যার প্রকোপ বেড়েছে এবং বন্যার সুফলগুলো অপসারিত হয়ে ধংসাত্মক রূপটাই প্রকট হয়েছে। ফরাক্কা আর ডিভিসির কারণে প্রায় প্রতি বছরই এখন বাংলা-বিহারের বিপুল অংশ প্লাবিত হয়। এ বছরই বাংলার বন্যাকে 'ম্যান মেড' বলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দোষ দিয়েছেন বিহারকে আর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ফরাক্কা ব্যারেজ ভেঙে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। বেঙালুরু এক শুষ্ক শহরে পরিণত হতে চলেছে। কাবেরীর জল নিয়ে কন্নড় আর তামিলদের খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে, অথচ গত বছরই চেন্নাই শহর জলে ভেসে গিয়েছিল।

নদীর গতিশীল ভারসাম্যকে মাথায় না রেখে দু-পাড় বাঁধিয়ে দেওয়ার পরিণাম হয়েছে আরো মারাত্মক। নদীর প্লাবনভূমিতে নগরায়নের মারাত্মক ফল দেখেছি উত্তরাখন্ডের বন্যার সময়। আধুনিক গবেষণা বলছে ক্যানেল মারফত জল চাষজমিতে চলে যাওয়ার ফলে বঙ্গোপসাগরে নদী মারফত গিয়ে পড়া মিষ্টিজলের পরিমাণ ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে, তাতে জলের উপরিতলের লবণাক্ততা বেড়েছে, যা কিনা বাষ্পায়নের হার এবং বৃষ্টিপাতের হারের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

যে পুকুর-জলাশয়গুলো ছিল যৌথ সম্পত্তি, ব্যক্তি মালিকানার যুগে তা কব্জাগত হয়েছে। পুকুরের মাছের ওপর যৌথ ভোগদখলের অধিকার খর্বিত হলেও স্নানের জল, বাসনমাজা-কাপড়কাচার জলের উৎস রূপে তা এখনো যৌথ সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হয়, কিংবা ঘিঞ্জি শহরে একখণ্ড উন্মুক্ত জায়গা। কিন্তু সেটাও ভরাট করে সেখানে বহুমূল্য আবাসন বানানো হচ্ছে, বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করতে গিয়ে পুকুরগুলি দূষিত করে ফেলা হচ্ছে, কিংবা পুকুরের পাড়ের স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়ার বিপুল জৈববৈচিত্র্য ধ্বংস করে পাড় বাঁধানো হচ্ছে বড়লোকের বাচ্চাদের সুইমিং পুল বানানোর জন্য। অনেক সময় পুকুর পাড়েই রাখা হচ্ছে ময়লার ভ্যাট, যাতে কিনা ময়লা উপছে পুকুরে পড়ে। কখনো বা সরাসরি পুকুরেই ময়লা ফেলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে অচিরেই দূষণের আঁতুরঘর হিসেবে চিহ্নিত করে ওটাকে বুজিয়ে ফেলে জমিটি কোটি কোটি টাকায় তুলে দেওয়া যায় প্রমোটারদের হাতে।

বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে 'প্রতি ফোঁটা জলে আরো বেশি ফসল' ফলানোর নীতিকে অগ্রাহ্য করে ভূগর্ভস্থ জল ব্যাপক পরিমাণে চাষের কাজে বাণিজ্যিকভাবে লাগানো হচ্ছে; খনিজ তেল, মিথেন উত্তোলনে ব্যবহৃত হচ্ছে; বহুজাতিক পানীয় প্রস্তুতকারকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গভীর অ্যাকুইফারগুলো থেকে যে জল তোলা হচ্ছে তা অন্তত দশ হাজার বছরের পুরোনো; দ্রুত তুলে আনায় সেগুলো রিচার্জ হচ্ছে না। বিঘ্নিত হচ্ছে জলচক্র, বিপাকীয় ফাটল দেখা দিচ্ছে এখানেও। সভ্যতার দীর্ঘদিনের পানীয় জলের উৎসগুলোয় ক্ষয় হচ্ছে। জল নিয়ে চলছে ব্যবসা, জলবণ্টন নিয়ে রাজনীতি। আর জলবণ্টনের অসাম্যের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা সেই আদিবাসী এবং মুখ্য জল আহরণকারী নারী সমাজের হাত থেকে জল নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্কের মারফত বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে। '...কোন মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী/ পাষাণ শৃঙ্খলে / ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো/ এসো হে প্রবল / কলকল চলছল/ এসো এসো হে তৃষ্ণার জল।'

তেজস্ক্রিয় শক্তিধর দেশগুলো বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আবর্জনা সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করে চলেছে। কঠিন তেজস্ক্রিয় আবর্জনা পুরু ধাতব পাত্রে সীল করে নিক্ষেপ করা হয় সমুদ্রে, আর তরল সরাসরি সমুদ্রে ফেলা হয়। এজন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর স্থান নির্বাচন করা হয় সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে। কঠিন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিয়ে একটা ধারণা ছিল যে সেগুলো আবরণী ভেদ করে জলে মিশতে পারবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিকিরণের ধাক্কায় ধারকপাত্রে ছিদ্র হচ্ছে। এবং সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ধারকপাত্রের সংখ্যা সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২,৫০,১২১টি। সেগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগই নেই। আস্তে আস্তে তেজস্ক্রিয় দূষণ জলমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে।

গণবিলুপ্তি

পুঁজিবাদী উৎপাদন অবাধে ছুটে চলা ক্রম-ত্বরান্বিত ট্রেডমিলের মতো; সঞ্চয় আর মুনাফাকে বাড়িয়ে চলাই যার মুখ্য উদ্দেশ্য; ব্যবহারমূল্যের বদলে বিনিময় মূল্য তৈরি করাই যার লক্ষ্য। মানুষের ভোগ গত ৩০ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে, এবং প্রতি বছর ভোগের হার ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২৫০ কোটি, আজ ৭৪০ কোটি, আগামী ৫০ বছরে জনসংখ্যা আজকের দ্বিগুণ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে; ১৯৮০ থেকে অর্থনীতি বহরে প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে।

এসব ধুন্ধুমার কাণ্ডের ফলে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় জীবকূল। এহেন লুণ্ঠনের সামনে পড়ে বহু প্রজাতি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেকেই বিলুপ্তির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। গত ১০০ বছরে পৃথিবীর অর্ধেক জলাভূমি সাফ হয়ে গেছে, আর ৭০ বছরে অর্ধেক অরণ্য সাফ হয়ে গেছে গাছ কাটা আর অরণ্যকে কৃষিজমিতে পরিণত করার ফলে। হিসেব বলে, প্রতিদিন গড়ে ৭৪টা করে প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। যারা এখনো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়নি তাদের অনেকের সংখ্যাই বিপুল হারে কমে গেছে এবং নানান ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বিবর্তনের নিয়মে যেমন একটা প্রজাতি বিলুপ্ত হয় এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয় বর্তমানের গণবিলুপ্তি তার কোনো অঙ্গ নয়; এমনকি অতীত পৃথিবীর ইতিহাসে সে বড় পাঁচখানা গণবিলুপ্তির ঘটনা জানি যার শেষতমটিতে ডাইনোসরের সাথে সাথে বিপুল জীবকূল উবে গিয়েছিল, বর্তমানের গণবিলুপ্তির হার অতীতের সেই সবকয়টি গণবিলুপ্তিকেই ম্লান করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে অতীতের গণবিলুপ্তির হারের তুলনায় বর্তমানে প্রায় ১০০০ গুণ বেশি হারে বিলুপ্ত হচ্ছে জীবকূল। আর একটা বিশেষ পার্থক্য হলো, আগেকার কোনও গণবিলুপ্তির পেছনে কোনও একটা বিশেষ প্রজাতি কারণ হিসেবে ছিল না, আর এবারের বেলায় একক প্রজাতি হিসেবে কেবলমাত্র মানুষের কাজকর্মই দায়ী লক্ষ লক্ষ প্রজাতি উজাড় হয়ে যাওয়ার পেছনে। কৃষিক্ষেত্রে উচ্চফলনশীলতাই কোনও প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র মাপকাঠি। কোনো ক্ষতিকর গুণের দোহাই দিয়ে কৃষিতে অপকারী প্রাণী বা উদ্ভিদকে ঝাড়ে-বংশে লোপাট করে দেওয়া হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের জটিল-জালে তার সামগ্রিক ভূমিকা যাচাই না করেই; অপকারী জীব দমনের নামে নির্বিচারে উপকারী-অপকারী সবাইকে ধ্বংস করা হচ্ছে। কখনো কোনো বিশেষ একটি ফলনের জন্য একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সমস্তরকম বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলছে (গোটা দ্বীপের সমস্ত কিছু আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে) সৃষ্টিশীল ধ্বংসায়ন নাম দিয়ে। শকুন আর দেখা যায় না; এমু উটপাখি ধরনের বড় আকৃতির বিভিন্ন পাখি সংকটে। জাভার বাঘ, ডোডো পাখি, সন্ন্যাসী সীল, মাদাগাস্কারের এক ডজন প্রজাতির লেমুর— এ তালিকা শেষ করা যাবে না।

কোনও একটা নতুন প্রজাতিকে কৃত্রিমভাবে একটা বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করালে তা বহু ক্ষেত্রেই সেই বাস্তুতন্ত্রের প্রচুর প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়া-নিউগিনির স্বাভাবিক উদ্ভিদ ইউক্যালিপটাস ওষধি তেল, কাগজ বানানোর পাল্প আর শৌখিন আসবাব বানানোর জন্যে পৃথিবী জুড়ে ব্যবসায়িক ভাবে চাষ করা হচ্ছে। এই গাছটি বিপুল হারে জলক্ষয় ও ভূমিক্ষয় করে। যেখানে এই গাছটি চাষ করা হয় সেখানে বাকি সব গাছ মারা যায় জলের অভাবে। কোনও কোনও বিশেষ জায়গায় পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে শুধুমাত্র এই গাছটি সেই অঞ্চলের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ জলক্ষয়ের জন্য দায়ী। আমাদের আশপাশেও বনসৃজন আর বৃক্ষরোপণের নাম করে ইউক্যালিপটাস চাষকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইউক্যালিপটাস চাষের দাপটে আমাদের দেশজ বহু বহু প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সমুদ্রে (এমনকি গভীর সমুদ্রেও) সমগ্র খাদ্যশৃঙ্খল বরাবর মাছ শিকার হচ্ছে— নোনাজলের প্রজাতির ৭০ শতাংশ আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সর্বাপেক্ষা ক্ষতির সম্মুখীন বড় শিকারি মাছেরা, কারণ তারা বাঁচে বহু বছর, প্রজননের বয়সও শুরু দেরিতে (২০ বছর), আর তাদের টিকে থাকা নির্ভর করে নীচের স্তরের সামুদ্রিক প্রাণীদের (ছোট মাছ, চিংড়ি) সহজলভ্যতার ওপর। মাছ শিকারে সবচেয়ে অপচয়ী হল কুচো চিংড়ি ধরা। আবার বাজারের পরিবর্তনের ফলে মাছ খাওয়ার অভ্যাসেও বদল হয়, যা বদলে দেয় কোনও নির্দিষ্ট মাছের চাহিদা। পুঁজিবাদ গোটা বিশ্বকে টুনা, হ্যাডক, কড কিংবা ইলিশ খাওয়ানোর বিজ্ঞাপন ক'রে, কৃত্রিমভাবে চাহিদা তৈরি ক'রে, মাছ জোগান দিতে গিয়ে গোটা খাদ্যশৃঙ্খল বরাবর মাছ শিকারে নেমেছে। গঙ্গা-পদ্মার ইলিশ খাওয়াতে শুরু করেছে ইউরোপকে। ইলিশ এখন বিলুপ্তির পথে। তিমি বা ডলফিন শিকার করা হচ্ছে প্রসাধনী দ্রব্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে। বাণিজ্যিকভাবে মাছ শিকারের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে উন্নতর প্রযুক্তিসম্পন্ন ট্রলার যা স্যাটেলাইট বা তরঙ্গ প্রেরণের মাধ্যমে বুঝে নেয় সমুদ্রে কোথায় দামী মাছ ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ট্রলার চলন্ত অবস্থাতেই একহাজার ফুট লম্বা মেশিনচালিত নাইলনের জাল দিয়ে একেক ঘণ্টায় তুলে আনে প্রায় ৪০ হাজার কেজি মাছ। মাছ বাছাই আর সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা থাকে তাতে, যাতে করে মাসাধিককাল সমুদ্রবক্ষে ভেসে মাছ ধরে তারপর তীরে ফিরলেও মাছগুলো টাটকা থাকে। সমুদ্রের বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে মাছ ধরার সময় ধরা পড়ে অন্যান্য নানা প্রজাতির প্রাণী, এমনকি ছোট মাছ, যার বাজার মূল্য অত্যন্ত কম; তাদের বাতিল করে মৃত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রেই। এভাবেই বাজারি সংস্কৃতির আগ্রাসনে উজাড় হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র। পাশাপাশি, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির সাথে সাথে সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ক্যালসিয়াম খোল-যুক্ত শামুক কিংবা প্রবাল দ্বীপের বৃদ্ধির ওপর।

ভূ-উষ্ণায়ন

বর্তমানে পরিবেশের সমস্যার সর্বাধিক চর্চিত বিষয় বিশ্ব উষ্ণায়ন। এমনকি ওয়াকিবহাল মহলও পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ে বাকি বিষয়গুলো শিকেয় তুলে এই একটি এবং কেবলমাত্র একটি সমস্যা নিয়েই চিন্তিত হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আর দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকও আছে। পরমাণু বিদ্যুতের প্রচারকরা কার্বন জ্বালানির সমস্যা নিয়ে তুখোড় যুক্তি হাজির

করছে, যা আপাত-বিপদকে আটকাতে গিয়ে আখেরে নরকযাত্রার পথকে প্রশস্ত করছে। আবার চক্রাকারে প্রাকৃতিক নিয়মেই উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার তত্ত্বকে হাজির করে কার্বন জ্বালানি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা শোনাচ্ছে কেউ কেউ। সে বিতর্কের গভীরে প্রবেশ না করেই দায়িত্বশীল ধারাটিকে আমরা চিহ্নিত করে নিতে পারি।

গত দুশো বছরে ক্রমবর্ধমান ভাবে কয়লা-পেট্রোলিয়াম দহনের ফলে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়েছে শতকরা পঁচিশ শতাংশ, যার জন্য গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটেছে এক সেলসিয়াসের কিছু কম। যা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বলে মনে হলেও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার। কয়লার স্তর সৃষ্টির যুগগুলোর আগে এবং পরে পৃথিবীর তাপমাত্রার যে পরিবর্তন (উদ্ভিদ দেহের কার্বন তৈরি হয় বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শোষণ করে। হঠাৎ বিপুল বনভূমি চাপা পড়ে কয়লার স্তর সৃষ্টি হলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমে যায়, ফলে গড় তাপমাত্রাও হ্রাস পায়।) হয়েছিল তা খুব বেশি ছিল না, এমনকি শেষ তুষার যুগটিতেও তাপমাত্রা ছিল আজকের গড় তাপমাত্রার থেকে মাত্র ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তন গোটা পৃথিবী এবং জীবকূলের পরিস্থিতির যে কী বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা অকল্পনীয়। তার থেকেও বড়ো কথা, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াটা সরলরৈখিক বিষয় নয়, তা আসলে শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মাধ্যমে উষ্ণায়নের প্রক্রিয়াটি দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে চলে।

এই উষ্ণায়ন নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিপুল বনভূমি আর সমুদ্রের শৈবালকে ধ্বংস করে, যা কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের মাত্রাকে দারুণ খর্ব করবে, ফলে উষ্ণায়ণ বাড়বে। তার সাথে যোগ হবে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে মেরুমৃত্তিকা বা পার্মাফ্রস্ট (মেরু প্রদেশে বরফের মধ্যে জমে থাকা হাজার হাজার পুরোনো পচা-গলা প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ) থেকে বিপুল মিথেন গ্যাস (যার গ্রিন হাউস প্রভাব কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চব্বিশ গুণ) বাতাসে ছাড়বে। সামান্য উষ্ণায়ন পরপর ঘটনাগুলোকে ক্রমাগত ঘটিয়ে চলে উষ্ণায়নের মাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। অথচ এহেন পজিটিভ ফিডব্যাক রেসপন্সের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার মত কোনো প্রাকৃতিক পদ্ধতিরও খোঁজ পাচ্ছেন না বিজ্ঞানীরা। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমাগত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখছে, বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে কোনোক্রমেই এ সমস্যা থেকে উৎক্রমণের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অত্যধিক হারে উৎপাদন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে পণ্যের আমদানি-রপ্তানি, গণপরিবহনের বদলে ছোট গাড়ির ব্যবস্থাকে ক্রমাগত উৎসাহিত করে চলা একটা ব্যবস্থা যে কেবল বর্তমানের স্বার্থ নিয়েই মেতে রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকাচ্ছে না সেটা বলাই বাহুল্য। মানবসভ্যতা বিকাশের যুগের (হলোসিন) যাবতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব হঠাৎ আমাদের সামনে বিশ্রীভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

এর দাওয়াই হিসেবে পুঁজিতন্ত্র যা হাজির করছে তা নিতান্তই কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, আর প্রচার চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের গৃহস্থালি শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে। চলছে কার্বন ক্রেডিট কেনা-বেচা নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক তরজা। বিপুল গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনের দায় গরিব দেশগুলোর ওপর চাপিয়েই প্রথম বিশ্ব হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে। আইপিসিসি-ও হাত গুটিয়ে বসে আছে, মেনে নিয়েছে 'সব যথা নিয়মেই চলবে'। কিয়োটো প্রোটোকল আমেরিকা সই করতে নারাজ ছিল, অথচ একা তারাই পৃথিবীর ২৫ শতাংশের বেশি কার্বন নিঃসরণ করে, এবং সেটা পুঁজিবাদী পরিবেশবিধি মেনেই।

'দূষণ' ওদের গিলে খাক

সামগ্রিকভাবে দূষণকে আমাদের সামনে হাজির করা হয় এমনভাবে, যাতে মানুষের মনে হয় সঠিক প্রশাসনিক তদারকির অভাবই দূষণের কারণ। অথচ দূষণের প্রধান কারণই হল বিশ্বায়িত পণ্য-সংস্কৃতি। দূষণের সঙ্গে জড়িয়ে উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ এবং অবশ্যই বিপাকীয় ফাটল। দূষণের জন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা আহত হওয়ার সময়কালে তার আয়ের হিসেব দিয়ে পুঁজিবাদ দূষণের মূল্যকে নির্ধারণ করে (বোঝাই যাচ্ছে পরিবেশের ক্ষতিটা এখানে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় দূষণমূল্য নির্ধারণে, দূষিত পরিবেশকে পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গটা তাই ধামাচাপা পড়ে যায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের আলোচনায়)। আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ দুটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই কম মজুরির দেশ কিংবা গরিব দেশে দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে বা সরিয়ে আনতে সুপারিশ করে। তার ওপর এ দেশগুলোতে পরিবেশবিধি এমনকি আইনকানুনও অনেক শিথিল, তাই বড়ো বড়ো বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেললে পালিয়ে যেতে সমস্যা হয় না। ভোপালের উদাহরণ তো হাতের সামনেই আছে।

আমাদের দেশের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের শিল্পকে দেশে আনার জন্যে আইনকে আরও শিথিল করছে, পারমাণবিক দুর্ঘটনার দায় কমানো হয়েছে বিদ্যুৎ প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী বিদেশি সংস্থার ক্ষেত্রে। চর্মশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন কিংবা সিমেন্ট শিল্পের মত মারাত্মক দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলো তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তরিত হচ্ছে। কর্মসংস্থানের খুড়োর কল দেখিয়ে বিনিয়োগ আনা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে তৃতীয় বিশ্ব— প্রথমত মজুরি হ্রাস করে, দ্বিতীয়ত প্রায় বিনামূল্যে জলসম্পদ, খনিজসম্পদ, বনসম্পদ এবং জমি তাদের হাতে তুলে দিয়ে, তৃতীয়ত রপ্তানিকে উৎসাহ দিতে রপ্তানি-শুল্ককে ছাড় দিয়ে (যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল দেশের মুদ্রার দাম পড়ে যাওয়া)। দেশের মানুষ আরও গরিব হয়। নোংরা

শিল্পগুলো ঢুকে পড়ে-দূষণ বাড়ায়, ক্ষতিগ্রস্থ করে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা। ন্যূনতম পরিধেয় বস্ত্র জোটে না যে দেশে সে দেশের মানুষরা নিজেদের পরিবেশ দূষিত করে, জীবন বিপন্ন করে সাহেবদের জন্য দামী সুদৃশ্য চামড়ার জুতো যোগাচ্ছে।

পরিবেশ ধ্বংসের দায় কেবলমাত্র পুঁজিবাদী সংস্কৃতির?

পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য যদি মনুষ্যকল ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ায় তাহলে বড়লোকরা বেঁচে যাবে নাকি? এহেন যুক্তি দাঁড় করিয়ে অনেক পরিবেশবিদ, এমনকি পরিবেশ আন্দোলনকারীরাও একটা শ্রেণীনিরপেক্ষ পরিবেশ আন্দোলনের তত্ত্ব খাড়া করে। যেন শোষক আর শোষিতর সমান দায় পরিবেশ ধ্বংসের পেছনে। কাঠ-কাটা কোম্পানি আর কাগজকলগুলি বনাঞ্চল উজাড় করে দেবে, আর পরিবেশবিদরা তার বিরোধিতায় নামলে বিরোধ বেধে যাবে কাঠ-কাটা শ্রমিকদের সাথে, কারণ এতে তাদের রুটি রুজিতে টান পড়ে। প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করার দাবি তুললে প্লাস্টিক কারখানার বিপুল শ্রমিকদের কাজ যাবে বলে তাদের সাথেও বিরোধ বাধে। এই অজুহাতে শ্রেণীনিরপেক্ষ আন্দোলনপন্থীরা বনাঞ্চল রক্ষার জন্য শ্রমিকদের বিকল্প জীবিকা সুনিশ্চিত করার দাবি তোলার পরিবর্তে মালিক-শ্রমিক উভয়ের বিরুদ্ধেই একই রকম সংগ্রামের তত্ত্ব খাড়া করে। আর এই পারস্পরিক বিবাদের মধ্যে বড় কোম্পানিগুলো দাঁও মেরে চলে যায়। শ্রেণী প্রশ্নটিকে মাথায় না রেখে এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করলে তা যে বিফলে যাবে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। আমরা আমাদের শহরেই দেখেছি জলাশয় দূষণের কারণ খাড়া করে হাজার হাজার বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আবার সেই পুকুরকেই পরবর্তীতে বড়লোকদের বাচ্চাদের সাঁতার শেখানোর জন্য বাঁধিয়ে দিয়ে (সুইমিং পুল) পুকুরের বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট বড়লোকরা বিপুল বেশি ব্যবহার করে আর গরিব লোক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট; সাধারণ মানুষকে পুষ্টিগুণহীন বিষে ভরা খাবার খাইয়ে নিজেদের জন্য জৈব খাদ্য নিশ্চিত করে বড়লোকরা। কার্বন ক্রেডিট কেনা-বেচার মাধ্যমে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর দায় উন্নত দেশগুলো চাপিয়ে দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের ওপর যদিও উন্নত দেশগুলোই সবচেয়ে বেশি কার্বন উদ্গীরণ করে। উন্নত দেশে নিষিদ্ধ বা চালু হয়নি এমন ওষুধ প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে অনুন্নত দেশের মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয়, ভেঙ্গে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের জনস্বাস্থ্য। বড়লোকেরা বাড়িতে ইনভার্টার ব্যবহার করে লোডশেডিঙের সময়ে চালানোর জন্যে বিদ্যুৎ শুষে রাখে, তাতে লোডশেডিং-এর হার বাড়ে, আর উল্টোদিকে গরিব অঞ্চলে দিনে ৪ ঘণ্টা খুবই লো-ভেল্টেজের বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। সেনেগাল, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি আফ্রিকান দেশগুলো ভয়াবহ আর্থিক অবস্থার চাপে নিজের দেশের উপকূলবর্তী আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় মাছ ধরার স্বত্ব এশিয়া আর ইউরোপীয় দেশগুলোর কোম্পানিকে বেচে দিতে বাধ্য হয়।

অনুন্নত দেশকে উন্নত দেশের কিংবা গ্রামকে শহরের কাছে পদানত ক'রে প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করা হচ্ছে, মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগ ক্ষমতা বাড়ছে এবং দূষণের দায়কে গরিব মানুষর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় পরিবেশ বিনষ্টের দায় কোনোভাবেই শ্রেণীনিরপেক্ষ হতে পারে না। বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন তাই বহু ক্ষেত্রেই পরিবেশ আন্দোলনকে জড়িয়ে ধরেই বিকশিত হচ্ছে।

শেষের আগে

অনন্ত ভোগের বাসনা সম্ভবত মানুষের ভেতরে শেকড় গেড়েছে মানবসভ্যতার যাত্রাপথে। আজকের দিনে ভোগ হয়ত মানুষের চেতনায় একটা মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, আর এর ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে ভোগবাসনায় আরো বেশি বেশি করে উস্কানি দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ভোগের অলীক সুখের দিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র বাজার সম্প্রসারণের যুক্তির দিকে তাকিয়ে। অনেক বিজ্ঞানী আশঙ্কা করছেন, বিগত কয়েক দশকে অবস্থাটা এমন সর্বনাশের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে যে সবরকম ব্যবস্থা নিলেও, এমনকি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তন করে ফেললেও ঘুরে দাঁড়ানোর আর কোনো আশা নেই। প্রকৃতির সহনশীলতার সে চৌকাঠ আমরা পেরিয়ে এসেছি যাতে করে পরিবেশের কলুষতা মুক্ত করতে নামলেও প্রকৃতির ভারসাম্য ফেরানো যাবে না। অর্থাৎ সমাধানকল্পে বিগত শতকের প্রবণতাগুলিকে কেবলমাত্র রাশ টেনে নয়, দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই প্রক্রিয়াগুলো উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এর অর্থ কিন্তু জঙ্গলে গিয়ে বসবাসের মত অতিসরলীকৃত তত্ত্ব নয়। সমস্যাটা প্রযুক্তি বা যন্ত্রের নয়, সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য। ব্যক্তিগত মুনাফা আর পুঁজির সঞ্চয়কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে এবং প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার মানসিকতা ছেড়ে, মানুষের বিপাক-ক্রিয়াকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে, প্রকৃতির নিয়মগুলো যুক্তিশীলভাবে বুঝে তার সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নয়ন করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা বাসযোগ্য সুস্থ পৃথিবী রেখে যাওয়া সম্ভব। এর কম সংস্কার খালি চোখে প্রয়োজনীয় মনে হলেও তা ধ্বংসের প্রক্রিয়ার গতি সামান্য ধীর করবে মাত্র।

এ কথা জলের মত পরিষ্কার যে এমন একটা উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেই সবচেয়ে বড়ো বাধা। ফলে পুঁজিবাদের মূল উৎপাটিত করে বড়সড় রকমের সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া এই নিশ্চিত ধ্বংসকে এড়ানো অসম্ভব। এখন দেখা যাক পুঁজিবাদী সংস্কৃতি আমাদের পৃথিবীটা ধ্বংস করে নাকি আমরা মানুষরা, যারা পুঁজিবাদকে তৈরি করেছি, লালন করছি, তারা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করি। ❐

ঋণ স্বীকার : *আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ, অনীক, পরিপ্রশ্ন* ও *দ্য ডার্টি পাওয়ার*-এর কয়েকটি সংখ্যা

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বাংলা ছবির সম্ভাব্য সংকট

সমসাময়িক সিনেমা নিয়ে কিছু প্রশ্ন

অনিন্দ্য সেনগুপ্ত

এই লেখাটা যখন লিখছি তখন প্রেক্ষাগৃহে অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর 'পিঙ্ক' চলছে। ছবির ট্রেলারটি ইতিমধ্যে বেশ কৌতুহল জাগিয়েছে। সুজিত সরকার প্রযোজিত এবং অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ছবিটি দেখে মনে হতেই পারে যে ছহিটি পার্ক স্ট্রিটে জরডানের হেনস্থার উপর আধারিত, বা অনুপ্রাণিত। তাহলে ছবিটি বাংলায় হলো না কেন? অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী বাংলায় যে যে ছবি পরিচালনা করেছেন তা থেকে এই ছবিটি একদমই আলাদা। 'অনুরণন', 'অপরাজিতা তুমি' ইত্যাদি সম্পর্কের ছবি তিনি করেন বাংলায়, এবং প্রায় নারীবাদী, বিতর্কিত একটি সামাজিক বিষয় নিয়ে ছবি করতে গেলে হিন্দিতে করতে হল কেন? চিত্রনাট্যকার মুম্বইয়ের বলে? এখানে এই ছবি করার পরিকাঠামো যথেষ্ট নয় বলে?

ইতিমধ্যে নির্মীয়মান একটি বাংলা থ্রিলারের প্রথম পোস্টার নিয়ে বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রমাণসহ চাউর হয়ে গেছে যে পোস্টারটি একটি বিখ্যাত কোরিয়ান ছবির হুবহু নকল। পাবলিসিটি ও পিআর-এর উপর ছবির পরিচালকের যে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আর তা বোঝা যায় এই গৌণ বিতর্কটির পর প্রযোজকের মন্তব্যে। তার চৌর্যবৃত্তি যারা প্রথম ধরেছেন তাদের নিয়ে ঠাট্টা করা তো আছেই, তিনি পরোক্ষে এও বললেন যে এই পন্থাটি অবলম্বন না করলে পুজোর বাজারে এতটা পাবলিসিটি পেতেন না। বস্তুত, নৈতিকতাহীনতার এত অকপট স্বীকারোক্তি আগে আমরা কোথাও শুনেছি কিনা মনে পড়েনা।

আমি বাংলা সিনেমা নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করে থাকি সোশ্যাল মিডিয়ায়— মূলত ফেসবুকে, কখনো এক-আধটি ব্লগে। অধ্যাপনার সূত্রে প্রতি বছর অন্তত খান একশো নতুন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে আলাপ হয়। তারা, তাদের বন্ধুরা, আন্তর্জালে পরিচিতির যে জাল বৃহত্তর হতে থাকে তাদের মধ্যে অনেকেই সেগুলি পড়েন। যেহেতু জীবিকার সূত্রে একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়িত আছি এবং বিভাগটির নাম চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগ, তাই মন্তব্যগুলি যে আমারই শুধু, প্রতিষ্ঠানটির নয় তা বোঝানোর জন্য ভাষার নানাবিধ স্ট্র্যাটেজি নিতে হয়। সব স্ট্র্যাটেজি সফল হয় না তো বটেই; যাদের কাছে সফল হয় তারা বোঝেন যে আমি বলছি— আর বাকিরা ভাবেন আমি যে ডিসিপ্লিন ও ডিপার্টমেন্টের সাথে জড়িত সেই প্রতিষ্ঠান বাংলা ছবি নিয়ে অখুশি, এবং এই অতৃপ্তিটি এতটাই প্রবল যে আমরা বাংলা সিনেমাকে ইগনোর করার বদলে সেই অতৃপ্তিকে ক্ষণে ক্ষণে, উত্তরোত্তর আরো তিক্ততর উচ্চারণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এই প্রেক্ষিত ও এই প্রেক্ষিতের সাথে ডিসক্লেমারিটি অতএব দেওয়া যাক; এই প্রবন্ধের সমস্ত অতৃপ্তি শুধুই আমার। আমি এই প্রবন্ধে এমন কোনো স্ট্র্যাটেজি নেবো না যাতে একধরনের অ্যাকাডেমিক নৈর্ব্যক্তিকতা জ্ঞাপিত হতে পারে। একজন দর্শক ও চলচ্চিত্রপ্রেমী হিসেবে এই সারকথা দিয়ে শুরু করা যাক— বাংলা সিনেমার এমন পতন হয়েছে যে তা থেকে উত্থান অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। এই পোলেমিকাল মন্তব্য নিয়ে যাদের অসুবিধে হবে তাদের প্রবন্ধটি পড়ার প্রয়োজন থাকবে না। আমি এই লেখায় ছবির বিশ্লেষণ করে দৃষ্টান্ত দেবো না। পতনের কিছু লক্ষণ বলবো শুধু, যারা নিয়মিত বাংলা ছবি দেখেন তারা মিলিয়ে নিতে পারবেন আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি।

এবার বিস্তারে যাওয়া যাক। আমাদের মতো যাদের সিনেমার নেশা আছে, বাংলা সিনেমার কাছে কিছু অব্যক্ত চাহিদা আছে— তাদের ছাড়া আপামর জনতার কাছে বাংলা সিনেমার সংকটের হয়ত বিশেষ মূল্য থাকে না। নিশ্চয়ই রাজ্যের পানীয় জলের সংকট হলে বা চিকিৎসাব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও ইনকমপিটেন্ট হয়ে গেলে যে সংকট তৈরি হয়, সিনেমার সংকট তার তুলনায় যে শুধু গৌণ তাই-ই নয়, গৌণই থাকা উচিত। কিন্তু সাহিত্য- শিল্প-সংস্কৃতির এই অহৈতুকি অস্তিত্ব, গুরুত্বের নিরিখে যে তার ক্ষেত্রের বাইরে ব্যাপ্ত নয় তা নয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সিনেমা ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির একটি অদ্ভুত প্যারাডক্স আছে— খুব কম সংখ্যক মানুষই সিনেমা-সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেন, অথচ দিনে দিনে উত্তরোত্তর সিনেমা, টেলিভিশনে বিনোদন, এমনকি নাটকেরও খরচা এমনভাবে বাড়ছে যে ওই 'কম সংখ্যার' অনেকগুণ বেশি মানুষের অংশগ্রহণ ও ক্রয়ক্ষমতা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে সিনেমা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। একটি উন্নতমানের বাংলা ছবি বানাতে এক কোটি টাকা লাগতেই পারে; অনেক মানুষ চারশো-পাঁচশো টাকা দিয়ে সেই ছবি দ্যাখেন। জাতীয় স্তরে ও দক্ষিণে একটি তারকাখচিত ছবি যে শুধু বহু বহু কোটি টাকায় তৈরিই হয় তাই নয়, কিছু মাত্রায় চিত্তাকর্ষক হলে তা সেই উৎপাদন-মূল্য ও অন্যান্য টাকা তুলে নেয় দুই-তিন দিনের মধ্যে। ব্যাপকতর মানুষের অংশগ্রহণ না থাকলে এটা সম্ভব হতে পারে না। অথচ অন্য একটি বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির, উদাহরণস্বরূপ— ক্রিকেটে— পরাজয় বা ম্যাচ ফিক্সিং যে আকারের গুরুগম্ভীর প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করে, একটি ছবি যদি টুকে দেওয়া হয় বা ছবিটির প্রযোজক-কলাকুশলী জড়িয়ে পড়ে কোনোরকমের দুর্নীতিতে, তখন তেমন বহুস্বরে প্রতিক্রিয়া ঘটে না আপামর দর্শকদের মধ্যে। বিশেষ করে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে দর্শকদের ভূমিকা প্রায় 'নিরাসক্ত ভোক্তা'-র মতোই— তারা কনজিউম করে যাবেন ঠিকই, কিন্তু তাদের যেন কোনো চাহিদা বা দাবি নেই বাংলা সিনেমা নিয়ে। অন্তত টেলিভিশনের মেগাসিরিয়ালের ক্ষেত্রে দর্শক যে ভাবে দৈনন্দিনে 'আসক্ত' বা 'লিপ্ত', সিনেমার ক্ষেত্রে সেভাবে নয়।

এই 'নিরাসক্ত ভোক্তা'-দের কাছে আমরা, অহৈতুকি চলচ্চিত্রপ্রেমীরা, খানিকটা অদ্ভুত মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হই। ক্রিকেট নিয়ে মত্ত মানুষ তাদের কাছে কাম্য ও স্বাভাবিক, ধ্রুপদী সঙ্গীত নিয়ে তাড়িত মানুষকেও তারা বোঝেন। কিন্তু সিনেমা নিয়ে পড়েন অথচ সিনেমা বানানো শেখেন না, সিনেমা নিয়ে তাড়িত অথচ শাহরুখ-সলমনের ফ্যান নয়, এমন মানুষজন তাদের কাছে বিচিত্র বটে, কিন্তু একটি বিশেষ ঐতিহাসিকতায় ও সংজ্ঞায় তারা আমাদের অবস্থিত করে বোঝেন, আমরা 'আর্ট সিনেমা'-র লোক। বর্তমানে আর্ট সিনেমা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তারা জানেন যে ইতিহাসে একসময়ে 'আর্ট সিনেমা' বলে জোরদার কিছু একটা ছিল, আমরা সেই হুংকারের মিলিয়ে যেতে থাকা প্রতিধ্বনি মাত্র, একটি বিলীয়মান প্রজাতি।

এই ধারণায় কোনো ভুলই নেই যে যাদের বাংলা সিনেমা নিয়ে একটা অতৃপ্তি আছে, তাদের উৎস গত শতকের আর্ট সিনেমার আন্দোলনেই। কারণ ফিল্ম মুভমেন্ট, ফিল্ম ক্লাব এবং লিটল ম্যাগাজিন সদৃশ্য ফিল্ম জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষেরাই আঞ্চলিক, অর্থাৎ যা 'গ্লোবাল' নয়, সিনেমা নিয়ে অতৃপ্তি পোষণ করতেন। তাদের মনে হতো সিনেমার যে অপার সম্ভাবনা তা তাদের ভাষার ছবি ছুঁতে পারছেনা, বরং কিছু বদভ্যাসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। সেই বদভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার সিনেমা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ছিল বলেই তাদের আন্দোলনগুলি ছিল সংস্কারমুখী, সেই অপার সম্ভাবনা তারা নিজেদের ভাষায় পর্দায় দেখতে চাইতেন বলে তারা ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তারা আগামীকালের ছবির জন্য এখন চর্চা করতেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সিনেমায় সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব ও অভিব্যক্তির একটি প্রকাশের চাহিদা, তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই আর্ট সিনেমা আন্দোলনের অনেকটাই বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছিল। তাই আমরা যদি বিলীয়মান প্রজাতির মতোই অদ্ভুত হয়ে থাকি, আমাদের এই ঐতিহাসিক দ্যোতনাগুলিও বিলীয়মান ধাঁচেরই। এখানেই একটি মজার বিরোধাভাস তৈরি হতে থাকে— সম্ভাবনার সিনেমা, সংস্কৃত মুক্ত সিনেমা, যে অভিব্যক্তি দুর্বল সেই অভিব্যক্তির সিনেমা, হয়ে পড়ে গত শতকের অভীষ্ট বস্তু, একদা-র 'আর্ট সিনেমা'।

কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে বাংলা সিনেমা নিয়ে এই অতৃপ্তির কোনো ছাপ নেই। আমাদের মূলধারার ছবি গতরে বহরে বাড়ছে। ইদানিং 'রিজিওনাল মেনস্ট্রীম'-এর একটি ধাঁচা তৈরি হয়েছে যা মূলত দক্ষিণের ছবির মডেলে আধারিত (যা পুরোপুরি আঞ্চলিক এটা ভাবাও গোলমেলে, কারণ এই যে একটি ভাষায় ছবি তৈরি করে তা বিবিধ ভাষায় রিমেকের প্রক্রিয়ায় পরবর্তী স্তরে হিন্দি সিনেমাও পড়ে)। চাকচিক্য, উন্নতমানের প্রযুক্তি, বৈভবের প্রদর্শন এইসব ছবির অন্যতম চরিত্র। শোনা যায় যে বাংলা বাজারে এইসব ছবি অনেক ক্ষেত্রেই ফ্লপ করে, কিন্তু ছবির চেহারায় সেই অনটনের ছাপ আপনি পাবেন না যেভাবে ১৯৭০ বা '৮০-র দশকের ছবিতে পেতেন। অনটনের ছাপ এই মূলধারার ছবিতে কখনোই থাকার কথা নয়, তাই রহস্যজনক ভাবে ফ্লপের সংখ্যা বাড়লেও বাজেট বৃদ্ধি পেতে থাকে, সামনের সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া মূলধারা আরো আরো জৌলুসময় হবে এটাই স্বাভাবিক।

এই মূলধারা পশ্চিমবঙ্গে মূলত একটি-দুটি প্রোডাকশন হাউসের কুক্ষিগত থাকে। এছাড়া আরেকটি গোষ্ঠীর ছবি মুক্তি পায় যাদের এইরকম সামর্থ্য নেই, যাদের ছবিতে বড় স্টারের বদলে মূলত টেলিভিশনের অভিনেতাদেরই আপনি দেখবেন। সেই ছবিরও কোনো চেনা চেহারা নেই, সেগুলি যে খুব বেশি চলে তাও নয়। কিন্তু তাই বলে সেইসব ছবির সংখ্যা কিন্তু ক্ষীয়মাণ নয়। পুঁজি অদ্ভুতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে লাভের মুখ না দেখতে পেলেও।

আর এর বাইরে এক ধরনের ছবি থাকে সেগুলিকে একধরনের নতুন 'আর্বান পপুলার' বলা যেতে পারে। গত শতকের আর্ট সিনেমার সাথে এর যোগাযোগটি মূলত এই ছবির কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ পরিচালক। আগে হয় আর্ট ফিল্ম করতেন বা তার সাথে জড়িত ছিলেন, যেমন অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, অঞ্জন দত্ত ইত্যাদি। পরবর্তী প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ নামের মধ্যে আছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গাঙ্গুলি, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায়, মৈনাক ভৌমিক ইত্যাদি, যাদের ওই পূর্ব-পরিচিতি নেই। এনারাই মূলত মিডিয়ার আনুকূল্য পান নতুন বিষয় ও নতুন ধারার প্রবক্তা হিসেবে। এদের ছবির আরেকটি অ্যাডভ্যান্টেজ হল মূলধারার অন্যতম একটি প্রোডাকশন হাউসের আনুকূল্য।

ফিনান্স ক্যাপিট্যালিজম ও গ্লোবাইলাইজেশন-পরবর্তী যুগে বাংলা সিনেমায় পুঁজি একটি অদ্ভুত, প্রায় প্যারাডক্সিকাল চরিত্র পেয়েছে, যার ব্যাখ্যা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। যুগপৎ সিনেমা ও অর্থনীতির উপর যার দখল আছে তিনিই এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, সেটা হলো মনোপলি। বাংলা সিনেমা এখন কার্যত ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের কুক্ষিগত। মূলত এই হাউস এবং পাবলিসিটি ও ওপিনিয়ন-জেনারেশনের জন্য আনন্দবাজার গোষ্ঠীর প্রসাদ ছাড়া ছবির বা পরিচালকের কোনো সুরাহা হয়না। মুক্তি ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এই হাউস প্রায় একচ্ছত্র, কারণ ডিজিটাল প্রদর্শনের ব্যবস্থা ও অধিকাংশ মাল্টিপ্লেক্স ও সিঙ্গল স্ক্রিনের হল এখনও ওনাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা যারা সীমিত অর্থনীতির জ্ঞানে জানতাম যে মনোপলি পুঁজির যুগ ছিল গত শতকে, তাদের পক্ষে এই চিত্রটি ব্যাখ্যা করা বেশ মুশকিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কর্পোরেট হাউসগুলি যতটা এগোতে পারছে বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে আগামী অনেক বছর তারাও বিশেষ দাঁত বসাতে পারবেন না কারণ পরিবেশনা ও প্রদর্শনের ক্ষেত্র এদের সার্বিক দখলে। এহেন দখল আছে বলেই, এবং মূলত আঞ্চলিক মূলধারার বাইরের ছবির ক্ষেত্রেও এদের একটি সুনির্দিষ্ট মতামত আছে বলেই বাংলা সিনেমা গত অন্তত দুই দশক ধরে একটি প্রোডাকশন হাউস দ্বারা সংজ্ঞায়িত সিনেমা হয়েই আছে, নিকট ভবিষ্যতেও বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু আমরা যারা 'সিনেমা-বোদ্ধা', 'সিনেমা-খুঁতখুঁতে',

‘সিনেমা-উন্নাসিক’, আমাদের কাছে তো প্রোডাকশনের বা বৃহত্তরভাবে ইন্ডাস্ট্রির এই জটিল কার্যপ্রণালীর বোধগম্যতা অধরা থেকে যায় মূলত তথ্যের অভাবে। আমার অন্যান্য লেখার স্বভাবসিদ্ধ অ্যাগ্রেশন উহ্য রেখেও বলা যেতে পারে যে আমাদের কাছে বাংলা সিনেমার প্রধান সমস্যা হল এর অনড়তা, একটি নির্দিষ্ট চরিত্র পেয়ে যাওয়ার পর তাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকা, এবং অন্য সম্ভাবনার দরজা বন্ধ হতে থাকা। আরো দুর্বোধ্য হওয়ার আগে আরেকটু বিস্তারিত করা যাক।

উপরের প্যারাগ্রাফে যা বললাম তা যে কোনো বাংলা ছবির দর্শক উড়িয়ে দিতে পারেন এই বলে যে এই অনড়তা আগের দশকের বাংলা ছবির চরিত্র ছিল, এখন আর নেই। আমরা যে সত্যিই আর্ট সিনেমার যুগের ক্রমহ্রাসমান প্রতিধ্বনি তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়।

তিনি বলবেন যে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিন্‌হারা যে যুগে ছবি করতেন তখন তারা যে মূলধারার বিপ্রতীপে নিজেদের অবস্থিত করেছিলেন তার চরিত্র ছিল ‘অনড়তা’। রোমান্টিক ছবির একটি ধাঁচা পেয়েই সুচিত্রা-উত্তমের যুগে সেটি ছবিতে ছবিতে পুনরাবৃত্ত হত— একই চরিত্র, একই গল্প, একই সংকট, একই সমাধান, একই আবেগ। এমনকি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ফিল্মোগ্রাফি যদি দেখি তাহলেই আমরা দুটি পর্যায় দেখবো যা ঠিক তরুণ সুপারস্টার এবং সিনিয়র সুপারস্টারের নয়। যখন নব্বইয়ের দশকে প্রায় একার কাঁধে উনি ইন্ডাস্ট্রিকে দুঃস্থতা থেকে উদ্ধার করছেন, যখন মূলত স্বপন সাহা প্রোডাকশনের খরচ কমানোর একটি কার্যকর প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করছেন একটি সেটে, একই কাস্ট নিয়ে একাধিক ছবির শুটিং ক’রে, তখন আমরা দেখেছি মূলধারার সেই ফরমুলার আধিপত্য, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কুমিরছানা দেখানোর মত প্রায় একই ছবি দেখানো। কিন্তু গত দশ-বারো বছরে যখন উনি বাধ্য হচ্ছেন রোমান্টিক হিরোর ভূমিকা থেকে নামতে, তখন কিন্তু প্রসেনজিতের ছবি মানে থোড়-বড়ি-খাড়া একই ভূমিকা নয় প্রতিটা ছবিতে। অতএব আমার এই ‘অনড়তা’-র অভিযোগ— এই দর্শকের মতে— খাটছে না।

অনড়তা গল্প, চরিত্র, আবেগের নয়— অনড়তা সিনেমা সম্পর্কিত ধারণার। গত শতকের মূলধারার ছবির একটি অন্যতম চরিত্রই ছিল স্টিরিওটাইপ্‌ড স্টার-পার্সোনা এবং তাকে ঘিরে জঁর (ফিল্ম, সাহিত্য বা সঙ্গীতের একটি স্টাইল)-এর। ১৯৫০-৬০ যে শুধু উত্তমকুমার একই ধাঁচের রোমান্টিক হিরো দিয়ে যাচ্ছেন তাই-ই তো নয়, বম্বেতে রাজেন্দ্রকুমার বা দেব আনন্দ-ও তাই করছেন, তাই করছেন রবার্ট মিচাম বা গ্রেগরি পেক হলিউডে। আমাদের এখানে অমিতাভ বচ্চন বা মিঠুন চক্রবর্তী তো বটেই, এমনকি আমীর-সলমন-শাহরুখের স্টারডমের প্রথম অর্ধ ছিল একই পার্সোনা পুনরাবৃত্তি করে। তাই গোটা বিংশ শতকে সবাক মেনস্ট্রিমের বিরুদ্ধে আর্ট সিনেমার বা বিবিধ দেশে নিউ সিনেমার জেহাদটাই ছিল গড্ডলিকা প্রবাহ ও সিনেমার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে— কখনো তারা মুক্তি পেয়েছেন পুনরুজ্জীবিত বাস্তববাদে, কখনো বাস্তববাদ থেকেই চেয়েছেন মুক্তি। কিন্তু আমাদের সময়ের বাংলা সিনেমা (দেব বা জিৎ অভিনীত মূলধারাকে নিয়ে বলছি না) তার আপাতভাবে ‘ফরমুলা’-র অবসান ঘটিয়ে, নাচ-গান-মারপিটের ছক থেকে নিজেকে মুক্ত করে যে ছবি আমাদের দিয়ে চলেছে তার অনড়তা আরেকটু বিপজ্জনক।

কারণ বিগত শতকের মূলধারার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, বরং বিনীতভাবেই স্বীকার করতো যে এই ছবি একমাত্র ছবি নয়, এই ফরমুলার বাইরের ছবি বিনিয়োগযোগ্য নয়, বিক্রয়যোগ্য নয়, বরং একক পরিচালকের প্রতিভা-নির্ভর বলেই নির্ভরযোগ্যও নয়— এই ছিল তার আশংকা। মূলধারার বাইরের ছবিকে ‘আর্ট সিনেমা’ তকমা দিয়েই সে স্বীকার করতো। এমনকি সেই সিনেমার রূপকারদের প্রতিও তাদের অশ্রদ্ধা, অভক্তিও থাকত না যদি সেই ছবি পুরস্কার পেত, বা যদি সেই ছবি পর্যায়ক্রমে লাভের মুখ দেখতো।

অধুনার এই ‘আর্বান পপুলার’-এর সবচেয়ে আত্মম্ভরী দিক হল তার সীমার বাইরেও যে ছবি থাকতে পারে তা স্বীকার না করা। সে যেহেতু ফরমুলাকেই বিতাড়িত করেছে, তাই সিনেমার সমস্ত সম্ভাবনাকেই সে অন্তর্গত করে নিতে পারে এমনই তার দাবি। তাই সৃজিতের ‘নির্বাক’, কৌশিকের ‘শব্দ’, অঞ্জনের ‘হেমন্ত’, অপর্ণার ‘আরশি’— প্রথম দুটি ছবি সিনেমার শব্দপটের দিকে অভিনিবেশ করে, পরের দুটি শেক্সপীয়রের সমসাময়িক অবলম্বন— নিজেদের যতটা না ব্যতিক্রমী হিসেবে পেশ করে, তার চেয়েও বেশি প্রকট তাদের এই নতুন আর্বান পপুলারের প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছেয়। ‘নির্বাক’ বা ‘শব্দ’ পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ‘শুভা ও দেবতার গ্রাস’ নয়— সেই ছবিটি মূলধারার সীমান্তে নিজেকে অবস্থিত করেছিল একটি বোবা মেয়ের গল্প বলে এবং একটি কবিতাকে চলচ্চিত্রায়িত করে— ‘নির্বাক’ বা ‘শব্দ’ নিজেদেরকে কেন্দ্রে অবস্থিত করতে চায় এবং এভাবে মূলধারার সীমান্ত ও সীমান্তের অপর পারে থাকা ছবির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে চায়। এই ছবি বিনোদন ও গাম্ভীর্য, সবকিছুকেই অন্তর্গত করে নিয়েছে— এটাই এই ছবির দাবি।

এবার আধুনিক বাংলা ছবির তৃপ্ত দর্শক বলতে পারেন যে এইটাই তো কাম্য; যদি মূলধারাতেই এমন ছবি হতে পারে যা মুখের ভাষার দাপটকে সাউন্ডট্র্যাকে রুদ্ধ করতে পারে বা অবলম্বন করতে পারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটক, তার মানে তো এই-ই যে মূলধারা আগের চাইতে অনেক বেশি ইনক্লুসিভ হয়ে উঠেছে, অন্তর্গত করে নিতে পারছে এমন অনেক বিষয় যা পনেরো-কুড়ি বছর আগেও অভাবিত ছিল। স্টার, রোমান্স, নাচ-গান-আইটেম নাম্বারের চাইতে অভিনব বিষয়কে গুরুত্বের কেন্দ্রে রেখে দিতে পারে এই ছবিগুলি; সেগুলিকে প্রসেনজিতের ছবি হয়ে যেতে হয় না; প্রসেনজিৎ সেই ছবির মতো হয়ে ওঠেন— এই-ই তো কাম্য ছিল।

উপরের প্যারাগ্রাফে যে প্রতি-তর্কটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম তাতে দুটি বিপজ্জনক শব্দ আছে— ‘ইনক্লুসিভ’ ও ‘অন্তর্গত’। এই সিনেমার বিপদের দিক এইটাই— তা বিভিন্ন ছবি বা বিষয়কে একটি

তুলনামূলক বৃহত্তর উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত করে তুলতে চায়; সেই উৎপাদন ব্যবস্থা তো প্রোডাকশনের নেহাতই একটি প্রক্রিয়া নয়, সেটি সিনেমা, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ধারণা উৎপাদনকারী একটি সুবৃহৎ ব্যবস্থাও বটে। এই 'অন্তর্গত'-র ডিসকোর্সের ফলে এখনও যাঁরা ভিন্নধর্মী, ব্যতিক্রমী ছবি করতে চান, তাদের ছবি এই মেনস্ট্রিমের আদলে না হলে তেমন রেয়াত পায় না। এমন ছবি কি আছে? আছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রাজনৈতিক ছবি। বাংলা সিনেমা রাজনৈতিক ছবিকে বহুদিন হলো তার উঠোন থেকে বিতাড়িত করেছে। এমনকি রাজনৈতিক কন্টেন্টের ছবি, রাজনৈতিক ফর্ম তো পরের কথা, বাংলায় আর হয় না, হিন্দিতে যতটা হয়। তাই এই ইনক্লুসিভনেসের দাবিটা ভ্রমাত্মক। ঠিক যেমন দেখা যায় না বাস্তববাদী ছবি, যে ছবি মধ্যবিত্তের বাইরের জীবনকে তুলে ধরবে, শহরে বা গ্রামে।

কিন্তু এই প্রায় নিঃসাড়ে 'অন্য ছবি'-র ধারণাটা পাল্টাতে থাকলো কীভাবে? মনে রাখা দরকার যে আর্ট সিনেমা, প্যারালাল সিনেমা, রাজনৈতিক সিনেমার সাথে বামপন্থার একটি যোগাযোগ ছিল। নব্বইয়ের দশকে আরেকটি মজার সমাপতন লক্ষ্য করা যায়। তখন বামফ্রন্ট সরকারের সূর্য মধ্যগগনে। বামপন্থীদের সরকার আসার পর যেন সেই সরকারের হাতে চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির ব্যাটন তুলে দিয়ে রিলে রেসে ফিল্ম সোসাইটিগুলি খানিক ক্লান্ত। বামফ্রন্ট সরকার দুঃস্থ ইন্ডাস্ট্রির উন্নতিকল্পে খুব একটা কিছু করতে পারছে না। শুরুর দিকে তারা বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা করলেও মার্কেটিং-এর পরিকল্পনার অভাবে সেই হুজুগে-উদ্দীপনা টানা যায়নি বেশিদিন। ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের গড় বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ ছুঁয়ে গেছে এবং কমছে না, তখন প্রায় ফল্গুধারায় সিনেমা সম্পর্কিত ধারণার একটি রদবদল ঘটছে— মূলত সেই ধারণার ডিপলিটিসাইজেশন ঘটছে, এবং এক ধরনের নাগরিক বাঙালিয়ানার ধারণার সাথে যুক্ত হচ্ছে একরকম 'সিরিয়াস' ছবির ধারণা, যা বৈবাহিক ও অবৈবাহিক যৌনসম্পর্কের উপর আধারিত, যার পরিসর মূলত দক্ষিণ কলকাতা। এবং এই রদবদলে পশ্চিমবঙ্গের হেজিমনিক একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ এবং নিরুচ্চার একটি ভূমিকা আছে, যেমন ভূমিকা আছে ফিল্ম সোসাইটিগুলির তুলনামূলক ক্লান্তির।

আনন্দবাজার পত্রিকাই নব্বইয়ের দশক থেকে ফিল্ম-সমালোচনায় একটি রদবদল আরম্ভ করলো। ফিল্ম-সমালোচক নামে যে একটি বিশেষ স্পেশালাইজেশন থাকত, লেখার একটি বিশেষ শৈলী— তা উধাও হয়ে গেল। সমালোচক নামে একজন খিটখিটে গম্ভীর মানুষ থাকতেন, যার সাথে খুব কম পরিচালকেরই সদ্ভাব থাকত— তিনিও উধাও হয়ে গেলেন। সমালোচনা লিখতে আরম্ভ করলেন কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, পরিচালক, অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত সেলিব্রিটিরা। এর অভিঘাত হল সুদূরপ্রসারী— চলচ্চিত্র সমালোচনা আর স্পেশালাইজেশন রইলো না, তার জন্য বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ চোখ, বিশেষ লেখার শৈলী আর রইলো না। চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য, তা নিয়ে লেখার ভাষা ভিন্ন হবে— এমন দাবিও আর রইলো না। এটা সংবাদপত্রের সমস্ত সমালোচকদেরই ছিল তা বলা যায় না, অন্তত তাদের কাছে এই দাবিটা করা যেতে পারতো। কিন্তু সেই দাবি সেলিব্রিটির কাছে তো আর করা যায় না।

এ ছাড়াও— সমালোচনার লেখক ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত থাকার হেতুই অনেক সমালোচনা দ্রুত নৈর্ব্যক্তিকতা হারাতে লাগলো, অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের জীবিকার স্বার্থেই এই রিভিউগুলি সমালোচনামূলক রইলো না আর— পরিচালক বা প্রযোজক হয়তো প্রতাপশালী, লেখকের পরিচিত। তখন সেই লেখাগুলি হয়ে উঠলো একরকম ছবির মুক্তি-পরবর্তী বিজ্ঞাপন।

কিন্তু সিনেমার ইতিহাসে প্রিয়জন, পরিচিতজন, সমধর্মী, সমমনস্কদের একপেশে উদযাপন করে লেখার উদাহরণ অজস্র আছে। প্রবাদপ্রতিম 'কাহিয়ে দ্যু সিনেমা'-য় বেশিরভাগ লেখাই একপেশে, একদেশধর্মী এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধ সমালোচনায় অযাচিতভাবে মারমুখী ছিল। কিন্তু কাহিয়ে-র সঙ্গে আনন্দবাজার বা টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া-র তফাতটা এখানেই যে কাহিয়ে-র লেখকরা অচিরেই ফরাসি নবতরঙ্গের প্রবাদপ্রতিম পরিচালক হয়ে উঠবেন— ওনাদের সিনেমা নিয়ে একটি সুস্পষ্ট, বিকল্প ধারার কল্পনা ছিল যা আনন্দবাজারীদের থাকতে পারে না। একদা সাহিত্য নিয়ে আনন্দবাজার যা করে এসেছে, সিনেমা নিয়ে নব্বইয়ের দশকে এই প্রতিষ্ঠান তাইই করলো, আরেকটু পরোক্ষভাবে, আরেকটু বুদ্ধি প্রয়োগ করে— সমালোচনাকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়ে সিনেমা নিয়ে সাধারণ পাঠকের ধারণাগুলিকেই পালটে দিতে থাকলো। সদ্যপ্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের সরলীকৃত মূল্যায়ন, সাবেকি মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানা এবং আধুনিক উত্তর-বিশ্বায়ন কনজিউমারিজমের একটি নির্মীয়মান আত্মপরিচয়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়া গেল সিনেমাকে, নস্টালজিয়ার বিজ্ঞাপনের সাথে বিজ্ঞাপনী নন্দনতত্ত্ব মেলালে যেমন হয়— এর প্রামাণ্য উদাহরণ পাওয়া গেল ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিতে।

এবং এটা নেহাত সমাপতন নয় যে এই দশক থেকেই এমন এক ধরনের বাংলা ছবির উত্থান হতে থাকলো যাকে পোলেমিকালি বলা যেতে পারে আনন্দবাজারী ছবি— অর্থাৎ গত বহু দশক ধরে জনপ্রিয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রকাশনার বিবিধ পূজাবার্ষিকী, আনন্দ পাবলিশার্স যা করে এসেছে— এই প্রথম চলচ্চিত্রে তার সমধর্মী কিছু তৈরি হল। এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই ছবির পৃষ্ঠপোষকতা কখনোই প্রত্যক্ষ রইলো না, কিন্তু পরোক্ষেও বেশ জোরালো হয়ে উঠলো।

কেমন ধরন সেই ছবির? মূলত ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং অপর্ণা সেনের হাতে এই ছবির মডেল তৈরি হলো— উচ্চবিত্ত-অভিমুখী মধ্যবিত্তের ছবি, যে ছবি মূলত সম্পর্কের গল্প বলে, পারিবারিক ও যৌনসম্পর্কজনিত সংকট সেখানে প্রাধান্য পেতে থাকে এবং গল্পগুলি এমন একটি পরিসরে বিস্তৃত হতে থাকে যেখানে ইন্টেরিয়র ডেকরেশন, প্রচুর অবজেক্ট, অহেতুক বস্তুর টেক্সচার

ভিড় করতে থাকে, অতীত ও বর্তমান পর্যবসিত হতে থাকে বস্তুর, আসবাবের আধিক্যের সম্ভারে। বহির্দৃশ্য, বহির্সমাজ, বাস্তব পরিসর কমতে থাকে, সত্যজিতের বাস্তববাদ এক ধরনের ন্যাচারালিজমে পর্যবসিত হয়। এক একটি ছবি দেখে মনে হতে থাকে শারদীয় উপন্যাস পড়া হচ্ছে, যেখান থেকে সত্তরের নতুন ভারতীয় সিনেমার, রাজনৈতিক সিনেমার সমস্ত চিহ্ন মুছে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। সত্যজিতের শেষ দিকের ছবি— যা তাঁর অসুস্থতার কারণে ইনডোরে আটকে গিয়েছিল আবার হয়তো অসুস্থতার কারণেই সরলীকৃত হয়ে যাচ্ছিল— সেখানে যে আর্জেন্সি ছিল বৃহত্তর সমাজ নিয়ে তা এই ছবিতে একধরনের তথ্যে পর্যবসিত হতে থাকে, যেমন 'যুগান্ত'-য় উপসাগরীয় যুদ্ধ।

বস্তুত, এমন ছবি হওয়ারই ছিল কখনো না কখনো স্বাভাবিক কারণেই। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' পরবর্তী ছবি, 'ভুবন সোম' যে চলচ্চিত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ হতে থাকে সেই নিউ ইন্ডিয়ান সিনেমা— এইসব ছবির পিছনে ষাট ও সত্তর দশকের ক্রমবর্ধমান বামপন্থী আন্দোলন প্রেক্ষিত হিসেবে ছিল। নব্বইয়ে সেই বামপন্থী আন্দোলন অন্তত পশ্চিমবঙ্গে জগদ্দল বামফ্রন্ট সরকার হয়ে গেছে, ক্ষমতায় থাকলে আন্দোলনের ধার কমে যাওয়ারই কথা, ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর মধ্যবিত্তের একটি নতুন পরিচিতি এসে গেছে— কনজিউমারের। নব্বইয়ে অতএব একটি মধ্যবর্তী পর্যায়— সদ্য অতীতের রাজনৈতিকতা ফিকে হয়ে আসছে, তৈরি হচ্ছে বড়জোর একরকম ইনফর্মড নৈতিকতা, আসন্ন একটি নতুন মধ্যবিত্ততা, যেখানে অভীষ্ট বৈভব, অথচ ভোগবাদকে আশরীর আলিঙ্গনও করা যাচ্ছে না— এই সময়ের মধ্যবিত্ততার ছবিতে আমরা রাজনৈতিক ইনঅ্যাকশন এবং সামাজিক সচেতনতার এক বিচিত্র মিশেল দেখতে পাই। রাজনৈতিকতা পালটে যাচ্ছে শুধুই নৈতিকতায়, অথচ আসন্ন ভোগবাদ চিহ্নিত হচ্ছে যৌনতার হাতছানিতে— এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধাভাস থাকতে বাধ্য। লাভের মধ্যে চক্রাকার সম্পর্কের সংকট যার মীমাংসা নেই, একধরনের আবছা গিল্ট ও প্রায়শ্চিত্তের আবহ, প্রতিবাদের বদলে সহ্যক্ষমতা বাড়ানো, মেনে নেওয়ার স্পৃহা এই ছবিগুলিতে মেঘলা আকাশের মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। গত এক দশকে নব্বইয়ের এই ভারি দীর্ঘশ্বাসের মতো আবহও আর নেই সে অর্থে— যৌনতা নিয়ে নৈতিক টানাপোড়েন কমেছে, সেট ডিজাইনিং, আলোক সম্পাত, কালার-কারেকশন, ডিজিটাল ইন্টারমিডিয়েটের কল্যাণে জৌলুশ, চাকচিক্য, প্রযুক্তির প্রদর্শন বেড়েছে— ভারী দীর্ঘশ্বাস এখন অনুপম রায়ের গানে হয়ে উঠেছে সুরেলা, মিঠে ও অতিকথনে ভারী।

এই যে প্রযুক্তি ও বৈভবের অর্জন, এবং চাকচিক্য ও ক্রমবর্ধমান বাজেটের ফলে যা অতি-দৃশ্যমান, তার ফলে বাংলা ছবির ইতিহাসে অর্জিত কিছুর কি ক্ষয় হয়? কেউ বলতেই পারেন যে মূলধারার ক্ষেত্রে স্বপন সাহা ও তার আগে অঞ্জন চৌধুরীর ছবির চাইতে, অন্য ধারার ক্ষেত্রে মৃণাল সেনের রঙিন ছবির বা নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ছবির চাইতে এখনকার ছবি তো অনেক 'স্মার্ট', 'বোল্ড', অনেক বেশি 'টেকনিকালি সাউন্ড'— এবং তা অনস্বীকার্য। সমস্যাটা এখানেই।

আমি মূলধারার ছবি নিয়ে খুব বেশি বলব না। সামান্য কিছু কথা ছাড়া। আশি ও নব্বইয়ে অঞ্জন ও স্বপনের হাতে বাংলা মূলধারার ছবি নাভিশ্বাস ওঠা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। বস্তুত উত্তমকুমারের মৃতুর পর যে শূন্যতা এসেছিল আসলে তাঁর জীবদ্দশার শেষ পর্যায়েই, সেটা ছিল নতুন যুগের নায়ক-নায়িকা ও তাদের কেন্দ্র করে নতুন আখ্যান গড়ে তুলতে পারায় বাংলা ছবির অক্ষমতা। সেই সময়ে বাঙালি যুবসম্প্রদায় যে নায়ক চাইছেন তা বাংলা ছবি দিতে পারছে না, হিন্দি ছবি প্রথমে অমিতাভ বচ্চন ও পরে মিঠুন চক্রবর্তীর পার্সোনায় তা দিয়ে দিচ্ছে। 'শত্রু'-র দমনকারী পুলিশ— যিনি যৌবন পেরিয়ে যাচ্ছেন— এমন এক পারিবারিক জ্যেষ্ঠপুত্রকে বহির্সমাজে হাজির করলো যার হাতে দুর্নীতিপরায়ণ জোতদার থেকে বখাটে যুবক, লুম্পেন প্রলেতারিত-ও ঠাণ্ডা। সত্তরে পুলিশের পতিত ইমেজকে উদ্ধার করলো 'শত্রু', রাজনৈতিক রাগ পরিবর্তিত হল কড়া আইনের শাসনের ফ্যান্টাসিতে এবং এরপরের ছবিগুলিতে এই কর্তা-পুরুষের যেখানে ফেরত যাওয়ার কথা সেখানেই গেলেন— বৃহত্তর পরিবারে।

ইতিমধ্যে ভূমিসংস্কার হতে থাকবে, গ্রামে একটি নতুন শ্রেণী তৈরি হবে যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে। ভিএইচএস এবং টেলিভিশনের যুগে একটি ট্র্যানজিশনাল বাংলা মূলধারার ছবি তৈরি হলো যা সে অর্থে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথমবার মূলত গ্রাম ও মফস্বলকে উদ্দেশ্য করে নির্মিত। ট্র্যানজিশনাল বললাম এই অর্থে যে নব্বইয়ের পরে যখন বিশ্বায়িত বাজার নতুন নগরায়নের একটি ছবি তৈরি করে দিচ্ছে, তখন ফের পরিবারের বাইরের পরিসরটি এই মূলধারায় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে, জায়গা তৈরি হবে মূলত জিৎ এবং খানিকটা দেবের মতো পার্সোনার— এখন মফস্বলের ছেলেটি বা মেয়েটিও এমন একটি পার্সোনা দেখতে চায় যে পরিবারের বাইরেই স্বচ্ছন্দ, বাঙালিয়ানা যার পরিচয় নয় আর, পরিবারের নিগড় যার আলগা, যার শরীরে-উচ্চারণে-বেশভূষায় একটি লুম্পেন মেট্রোপলিটান শ্রী থাকবে, মুম্বইয়া স্মার্টনেস ও অগভীরতা যার অভীষ্ট, যার কম্পিটেন্স মূলত নাচ ও কোরিওগ্রাফড ফাইটের অ্যাথিলেটিসিজম, বচ্চনের সামাজিক রাগ যেখানে যত্ন করে মুছে দেওয়া গেছে। গত দশকে এই শরীরটি তার আঞ্চলিক পরিচিতি সম্পূর্ণ হারিয়েছে, তার বাংলায় সংলাপ বলাটা নেহাতই একটি প্রয়োজনীয় বিড়ম্বনা, হয়ত আর পাঁচ বছর পরে তার অধিকাংশ সংলাপ— পারিবারিক পরিসরের বাইরে— সে হিন্দিতেই বলবে।

আপাতভাবে মূলধারায় যে বাঙালিয়ানা ও আঞ্চলিক পরিচিতির ক্ষয়, সেই বাঙালিয়ানাকে মেট্রোপলিটান মোড়কে সাজিয়ে নিতে থাকল আমি যাকে নতুন 'আর্বান পপুলার' নামে অভিহিত করেছি— সেই ছবিতে— যার নায়ক হন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল

সেনগুপ্ত, আবীর চট্টোপাধ্যায় বা যিশু সেনগুপ্ত। দক্ষিণী মূলধারা যখন এখানকার মূলধারাকে সংজ্ঞায়িত করছে, এই ছবিতে ছেয়ে গেল বিজ্ঞাপনী নন্দনতত্ত্ব। কিন্তু ছবিগুলি কিসের বিজ্ঞাপন হয়ে উঠতে লাগলো? মূলত একটি নতুন লাইফ-স্টাইলের। যে লাইফ-স্টাইল শো-বিজ ও সেলিব্রিটি দুনিয়ায় আছে, যে লাইফ স্টাইল এফএম রেডিওর শ্রোতাদের কাছে বিজ্ঞাপিত, যে লাইফ স্টাইলের বাইরের বাস্তব— এমনকি নাগরিক বাস্তব— এই ছবির সাথে যুক্ত কারুরই চেনা নেই, সেই লাইফ-স্টাইল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসতে থাকে এইসব ছবিতে। পরপর ছবিগুলি দেখতে থাকলে মনে হবে একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর হোম ভিডিও-র মধ্যে আপনি অযথা অনুপ্রবেশ করে ফেলেছেন— তারা নিজেদের ছবি তুলে নিজেদেরকেই দেখাচ্ছিল, বলছিল নিজেদের গল্প— আপনি হঠাৎ অযাচিত ঢুকে পড়েছেন। তখন যেভাবে হঠাৎ অনাহূত আপনাকে দেখতে থাকবে হঠাৎ চুপ করে যাওয়া ঝাঁ-চকচকে কিছু নারী-পুরুষ— এই ছবিগুলিও আপনার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। আপনি অনাহূত হলেও আপনার হাতে মাল্টিপ্লেক্সের টিকিট, আপনাকে তাড়িয়েও দেওয়া যায় না, তখন আপনার জন্য তারা দেবেন বাঙালিয়ানার নস্টাজিয়া— একইরকম বিজ্ঞাপনী এবং নস্টালজিয়ার পরিসর হলো উত্তর কলকাতা। দৃষ্টি থেকে দৃশ্যের দূরত্ব হলো সাউথ সিটির ছাদ থেকে শ্যামবাজারের মোড়।

এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল বিড়ম্বনা একটা বড় ভূমিকা নেবে— বাংলা ছবিতে এই পরিসরগত সংকীর্ণতায়, কলকাতার হাতে গোনা কিছু স্থান ছাড়া বাংলা ছবিতে কলকাতা বড় দেখা যায় না। খুব বেশি হলে হাই-অ্যাঙ্গেলে নাগরিক রাস্তা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাত্রিবেলায়। শুনেছি রাস্তা-ঘাট, পাড়া, স্টেশন, মেট্রো রেল— এই সমস্ত স্থানে শ্যুটিং করা বিশেষ কঠিন হয়ে যাচ্ছে অনুমতি, ঘুষ ইত্যাদির জন্যে। কিন্তু আরো বড় কারণ হলো হাতে গোনা কয়েকটি জায়গার বাইরে নির্মাতাদের শ্যুটিং করতে না চাওয়া, বিবিধ নাগরিক পরিসরকে সিনেমার পর্দায় কেন আনতে হবে তার হেতু তাদের মাথায় না আসা। প্রতি ছবিতেই স্পেস বা পরিসর তৈরি হয়, কিন্তু কিছু ছবিতে 'স্থান' বিশেষ ভূমিকা নেয়। মৈনাক বিশ্বাস ও অর্জুন গৌরিসরিয়ার 'স্থানীয় সংবাদ', নবারুণ ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে সুমন মুখোপাধ্যায়ের ছবিগুলি, আদিত্যবিক্রম সেনগুপ্ত -র 'আসা যাওয়ার মাঝে'— এরকম কয়েকটি উদাহরণের বাইরে স্থান যে ভূমিকা রাখে ছবিতে তাদের নন-ফিকশনাল দ্যোতনা নিয়ে, তাই নিয়ে ওই আর্বান পপুলার বাংলা ছবি আদপেই জ্ঞাত বলে মনে হয় না। প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের 'বাকিটা ব্যক্তিগত'-ও এই পরিসরের অর্থকেই ছবির বিষয় করে নেয়, বাংলা ছবিতে কিছু পরিসর যে অলীক হয়ে গেছে তার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে। কিন্তু এই যে আর্বান পপুলার— তাতে স্থানের ভূমিকা প্রায় আর নেই, পরিসর কেবলই চরিত্রদের ধারণ করার বা চরিত্রদের একটি ফেব্রিকেটেড নাগরিক মাত্রা দেওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়। নব্বইয়ের শেষে হিন্দি ছবিতে রামগোপাল ভার্মা যখন 'সত্যা'-য় ও পরে 'কোম্পানি'-তে স্থান ও পরিসরের মাত্রা আমূল পালটে দিলেন মুম্বাইয়ের এমন অঞ্চলে গিয়ে, যেখানে বলিউডের আকাঙ্ক্ষিত গ্লোবাল ইন্ডিয়ান পরিসর বহু দূরে এবং আকাঙ্ক্ষিতও নয়, তখন নতুন গ্যাংস্টার জঁর ওই স্থান থেকেই উঠে এসেছে— জঁরের জন্য স্থান তৈরি করা হয়নি। বাংলা সিনেমায় এরকম সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আখেরে বাংলা সিনেমা একটি সংকুচিত নাগরিক স্পেসেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো, একটি মেট্রোপলিটান পাড়াগাঁয়ে। পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায় তেমনই সংকীর্ণ তার বৈচিত্র্য, তার সম্ভাবনা, তার জীবনশৈলী, তার কামনা-বাসনা- চমক-সন্দেহ-নৈতিকতা। ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কারণেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মহানগরে গড়ে ওঠে, অনেকক্ষেত্রেই বন্দরের কাছাকাছি মহানগরে (ব্যতিক্রম শুধু হলিউড); বিবিধ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কারণেই— বিশেষ করে ছবিতে শব্দ আসার পর এবং আলোকসম্পাত বিশেষ মাত্রা অর্জন করার পর— ক্যামেরা স্টুডিও-র বাইরে বেরোতে পারে না বেশ কিছুদিন। কিন্তু সব দেশের ছবিতেই তারপর বিশেষ কিছু মূহূর্ত আসে যখন ক্যামেরা সচেতনভাবে অনাগরিক স্থান, নগরের প্রান্তিক অঞ্চলকে পর্দায় নিয়ে আসে; এমন মূহূর্ত— সবাই জানেন— বাংলা ছবিতেও এসেছিল। 'পথের পাঁচালী'-র সেই মুহূর্ত বিশ্ব-সিনেমার ইতিহাসের স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ব-সিনেমার ইতিহাসে ক্যামেরা স্তরে স্তরে, পর্যায়ে পর্যায়ে, পর্দায় কখনও না-আসা স্থানকে নিয়ে এসেছে, অনেক ক্ষেত্রেই উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে, অনেক সময়েই পুঁজির সাহায্য ছাড়াই। টাটকা নতুন স্থান থেকে নতুন মানুষজন, নতুন শ্রমের রকমফের, নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার গল্প, নতুন ফ্যান্টাসি, নতুন ইচ্ছেপূরণের গল্প এসেছে ছবিতে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সময়ের বাংলা ছবি কলকাতার কয়েকটি পাড়ার বাইরে বেরোতে পারলো না। 'পথের পাঁচালী' যে সাহস নিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে গিয়েছিল গ্রামে, তখন অনেক ছবিরই সেই সাহস না থাকলেও গ্রামকে তারা কখনোই পর্দা থেকে বিদেয় করে দেয়নি, একটি কল্পিত গ্রাম বাংলা ছবিতে থেকেই গিয়েছিল। তারপর 'যদুবংশ'-র মত ছবিতে, এমনকি 'মৌচাক'-এর মতো ছবিতেও মফস্বল এলো। অঞ্জন বা স্বপনের ছবিতে পরিবেশটি গ্রাম বা মফস্বলেরই ছিল। কিন্তু গত দুই দশকে বাংলা সিনেমা আর গ্রাম বা মফস্বলে যেতে পারে না। বরং তার কাজ এখন গ্রামে বা মফস্বলে কল্পিত মেট্রোপলিসের ছবি নিয়ে যাওয়া।

অথচ ডিজিটাল প্রযুক্তির ফলে, ক্যামেরা ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে এখন প্রযুক্তির গতি ও চলন অবাধ হওয়ার কথাই ছিল, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ছবিতে কল্পনা মেট্রোপলিস ছেড়ে বেরোতে পারে না আর। সেখানে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র ছবিতে পুরুলিয়াও একই দোষে দুষ্ট হবে— পুরুলিয়ার পরিসর সেখানে ফাঁকা টেক্সচার হয়েই থাকে যেখানে পরিচালকের ভাবনা-চিত্র আরোপিত হবে— পুরুলিয়া তার গল্প নিয়ে, তার মানুষজনকে নিয়ে পর্দায় উঠে আসে না। বাংলা সিনেমা যতদিন না পুরুলিয়া, কৃষ্ণনগর, দুর্গাপুর, মিরিকের গল্প বলবে সেইসব স্থানে, সেইসব স্থানের মানুষকে

নিয়ে ততদিন তার এই সংকীর্ণ মেট্রোপলিটান পাড়াগেঁয়েপনা থেকে মুক্ত হবে না। একমাত্র মেট্রোপলিস থেকে ছড়িয়ে গেলেই তার পক্ষে আবার আন্তর্জাতিক মানের ছবি করা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয়। কলকাতার কিছু কৃত্রিম পরিসরের পক্ষে আর নতুন কোনো চরিত্র, নতুন কোনো গল্প, নতুন কোনো ইমেজ তুলে ধরা সম্ভব নয়। যত এইসব ছবি নতুন এবং অন্য বাস্তবকে দেখতে ভুলে যাবে, তাদের কাছে রয়ে যাবে দুই ধরনের কুমীরছানার মতো বাস্তব— এইসব ছবির কুশীলবদের লাইফ-স্টাইলের বাস্তবতা, এবং তাদের শরীর ও যৌনতার বাস্তবতা। এক সময়ে বাংলা সিনেমায় নতুন স্থান দেখা দেওয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়, এখন শরীরের, ত্বকের নতুন স্থান, নতুন কোণা অনাবৃত করে তারা উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে— কিন্তু এই শরীর তো অচেনা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে না আর কোনো নতুন গল্পও বলে না— আর যখন বলার চেষ্টা করে, যেমন করেছিল কিউয়ের 'গাণ্ডু'— তা গতানুগতিক প্রথায় প্রদর্শনযোগ্য থাকে না।

অতএব নতুন মানুষ, নতুন পরিসর, নতুন স্থান যখন পর্দায় আনা যায় না আর, তখন জনপ্রিয় ছবির হাতে একটিই উপায় থাকে স্বাদবদলের— তা হলো নস্টালজিয়া। এই নস্টালজিয়া আসতে পারে দুইভাবে— এমন কোনো পরিসর চিহ্নিত করা সেখানে অতীত স্থির হয়ে, অনড় হয়ে আছে বলে ধার্য হয়, বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে ওঠে উত্তর কলকাতা; অথবা সিনেমা ও সাহিত্য ধরে অতীতচারিতা। কিন্তু এই দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও পুঁজি ও কিছু স্কিলের প্রয়োজন হয়— কৃত্রিমভাবে অতীতের পরিসর তৈরি করতে হয়, ডিটেলের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। সেগুলি আয়ত্ত করতে না পেরে বাংলা সিনেমা অধুনা আগের শতকের গোয়েন্দা গল্পের দ্বারস্থ হয়েছে, বিশেষ করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ব্যোমকেশের গল্পে। এই ছবিগুলিতে স্পেস বা ডিটেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্মাণ এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে বিগত গোয়েন্দার চরিত্রকে পুনরুত্থারিত করে, অর্থাৎ চরিত্র ও পার্সোনাই অতীতচারিতার অবলম্বন হয়ে উঠছে। সন্দীপ রায়ের অবলম্বনে ফেলুদা-তোপসে-লালমোহনবাবু উল্টোদিকে শুধুমাত্র সত্তর ও আশি দশকের একটি চরিত্র হিসেবেই থাকছে; গল্পগুলি বিস্তৃত হচ্ছে একটি অলীক শূন্যতায়, অর্থাৎ গল্পগুলো কোন সময়ে ঘটছে তা বোঝার উপায় নেই। ফেলুদার হাতে মোবাইল ফোন এলেও তার পার্সোনাটা গল্পের বইয়ের মতই পুরানো থেকে যায়, এবং অন্যান্য চরিত্ররাও সত্যজিতের রচনার সময় থেকে বেরোতে পারে না, অথচ পারিপার্শ্বিকে সেই সময়ের চাপ থাকে না। পুঁজি এবং স্কিলের অভাবেই একটি বিস্তারিত অতীত নির্মাণও টালিগঞ্জের হাতে নেই— যেমন হিন্দিতে চেষ্টা করতে পারে দিবাকর ব্যানার্জীর 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী', একটি আদ্যন্ত খুঁতে আকীর্ণ ছবিতেও। এমনকি যেহেতু সাহিত্যের সাথে বাংলা ছবির সম্পর্ক চ্যুত হয়েছে, মেলোড্রামাও বেরিয়ে গেছে হাতের বাইরে, শুধুমাত্র সেটের অভ্যন্তরে 'দেবী চৌধুরানী' বা 'দত্তা'-র মতো পিরিয়ড পিস করাও তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

হয়তো আরো অ্যাকাডেমিক কোনো গবেষণায়, আরো ধৈর্যশীল নিরীক্ষায় খতিয়ে দেখা হবে কীভাবে মেলোড্রামা বাংলা সিনেমা থেকে বেমালুম হারিয়ে গেল। নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয় অর্ধে অ্যাকাডেমিক চলচ্চিত্রবিদ্যা বাংলা ছবির মেলোড্রামার— হয়তো ঋত্বিক ঘটককে বোঝার সূত্রেই শুরু করে— যখন দীর্ঘদিনের অবহেলার অবসান ঘটিয়ে সঠিক মূল্যায়ন করছে, তখন মেলোড্রামাই মুছে যাচ্ছে বাংলা সিনেমা থেকে। থেকে যাচ্ছে মেলোড্রামার বাহ্যিক কিছু ফ্যাসাড— পারিবারিক প্লট, উচ্চকিত অভিনয়, একমাত্রিক চরিত্র। মেলোড্রামা যেভাবে একটি প্রতিস্থাপিত ও গূঢ় অর্থ-র দিকে ইঙ্গিত দেয়, তা হারিয়ে যেতে থাকে অঞ্জন চৌধুরী, হরনাথ চক্রবর্তী, স্বপন সাহা, প্রভাত রায়দের ছবি থেকে। আজ যখন উত্তম-সুচিত্রার ছবিতে আধুনিকতার সাথে বোঝাপড়ার একটি ভিন্ন বয়ান গূঢ়পাঠ করে বের করে আনা যায়, এই ছবিগুলি সেই দিক থেকে ফাঁপা হয়ে যেতে থাকে। এরপর মূলধারা যখন দক্ষিণী ছবির ভাববিশ্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তখন নতুন আর্বান পপুলারও ঋতুপর্ণীয় স্বাভাবিকতাবাদের পর মেলোড্রামায় ফিরতে পারবে না, আবার বাস্তববাদের সামাজিক উন্মোচনও তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। ফাঁপা মেলোড্রামা সুস্থির হবে মেগাসিরিয়ালে। আগের বাংলা ছবির এই ফর্মের উধাও হওয়ার অন্যতম লক্ষণ বা সিম্পটম (যা আমার মতে সার্বিকভাবে ভারতীয় জনপ্রিয় ছবির সমস্যা) হলো গানের সীমাবদ্ধ ব্যবহার। বাংলা আধুনিক গান এবং সিনেমার গান কী ধরনের ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছে তা ভিন্ন প্রবন্ধ ও অনেক বেশি কুশলী প্রবন্ধকার দাবি করে, তা নিয়ে আমি বিশেষ বলব না। কিন্তু এখনকার অভিনেতারা গানে লিপ দেওয়ার স্কিল দ্রুত হারাচ্ছেন, প্রেমের দৃশ্যে গানের ব্যবহারের আগের কম্পিটেন্স আর দেখা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গান ব্যাকগ্রাউন্ডে বিবেকের মত উদয় হয়, ভাসাভাসা একধরনের মন্তাজ মুড তৈরি করতে থাকে। দেব বা জিতের ছবিতে সর্বভারতীয় জনপ্রিয় ছবির মডেলে গান এলে নাচ আসে, সে নাচ আমি যাকে আর্বান পপুলার বলছি তাতে সম্ভব নয়। প্রেমের দৃশ্যে গান তো চলে গেছেই, তাকে প্রতিস্থাপিত করছে প্রচণ্ড তাড়া খাওয়া চুম্বন বা যৌনদৃশ্য, বা রাস্তা-ঘাটে সংলাপহীন হাঁটা-চলা, নায়ক-নায়িকাদের বিজ্ঞাপনী পসচার ও পোশাকের ডিসপ্লে। বাংলা সিনেমায় শেষ কুশলী গান এসেছিল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'জাতিস্মর'-এ। আবার এই ছবিই হয়তো নিদর্শন হয়ে থাকবে কিভাবে এডিটিং ও ন্যারেটিভের তাড়ায় বাংলা ছবি একটি ভালো গানের সময়ে দুদণ্ড দাঁড়াতে পারে না গানকে তার সম্ভ্রম জানিয়ে, তার দৃষ্টান্ত হিসেবেও। অন্যদিকে, একটি 'ভূতের ভবিষ্যত' ব্যতিক্রম ও ক্রাইসিস হয়েও জানাচ্ছে যে অনুপম রায়ের জমানায় বাংলা সিনেমায় হাসির গান, বৈঠকী গান, রাগাশ্রয়ী গান বোধহয় চিরতরেই বিদায় নিয়েছে।

বাস্তববাদ একটা সম্ভাবনাহীন আধার হয়ে আছে; মেলোড্রামার

রেটরিক-ও বিদায় নিয়েছে— বাংলা সিনেমার সংকট অতএব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফর্মের সংকট। ইদানিং বহু ছবি সাসপেন্স থ্রিলার বা অপরাধমূলক ফিল্ম-নোয়া (film noir)-কে ধরার চেষ্টা করছে; কিন্তু এই দুই জঁর-ই যে ক্রাফট্‌ম্যানশিপ, ডিজাইন ও বিশ্ববীক্ষা দাবি করে তা বাংলা সিনেমায় নেই। মনে রাখতে হবে ফিল্ম নোয়া-র আলো-আঁধারিতে পতিত নৈতিকতার গল্পগুলি বলা হতো কতগুলি বিশেষ নাগরিক প্যারানোইয়া ব্যক্ত করার জন্য, এবং হলিউডের রক্ষণশীলতা তখন যৌনতা অনুমোদন করতো না পর্দায়। অতএব সৃজনশীলভাবে ওই পাপের আবহ তৈরি করা হত পরোক্ষভাবে। বাংলা সিনেমা যেহেতু এখন আনাড়িভাবে হলেও যৌনতা দেখাতে পারে তাকে ১৯৪০-৫০-এর দশকের হলিউডের মত সৃজনশীল হতে হচ্ছে না; এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জঁর যখন মূলত ডিজাইনের উপর নির্ভরশীল, শৈলী ও স্টাইলের উপর, বাংলা অপরাধমূলক ছবি হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেবল প্লটসর্বস্ব। আর থ্রিলারেও যেমন প্রযুক্তিনির্ভর শৈলীর উপর দখল আবশ্যিক হয়ে যায়, ভায়োলেন্সের সিরিয়াস কুশলী প্রতিরূপায়ণ বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এখনও অধরা রয়ে গেছে। দেব বা জিতের ছবিতে ভায়োলেন্স দক্ষিণী ছবির মডেলে স্পেশাল এফেক্টের নির্ভর কার্টুন অ্যাকশনে পর্যবসিত হচ্ছে, যা কখনোই ভায়োলেন্স নয়, কারণ তার সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কনটেন্ট শূন্য— কেবলই অ্যাক্রোব্যাটিক ও অ্যাথলেটিক অ্যাকশন। নাচের মতোই এই অতি-কোরিওগ্রাফ্‌ড ফাইট— যেখানে অভিনয়ের বা নাটকীয়তার প্রয়োজনীয়তা ন্যূনতম— আর্বান পপুলারে হতে পারে না। অতএব সেখানে ভায়োলেন্স, প্যারানোইয়া, সামাজিক ভীতি, অস্তিত্ব-র সংকট ব্যতিরেকে কিছু পড়ে পাওয়া ছকের প্লট দেওয়া হয় মাত্র। গল্পগুলো যতটা না সময় আর বাস্তব থেকে উঠে আসে, তার চাইতেও সময় আর বাস্তবের উপর এই গল্পগুলো আরোপ করে দেওয়া হয়।

বাংলা সিনেমা নিয়ে আমার অতৃপ্তি খানিকটা বিস্তারিত করলাম এতক্ষণ, এবং থামছি। সত্যি বলতে কি 'এখন বাংলা সিনেমার গলদ কোথায়', এহেন প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। যাদের দৃষ্টি আরো ক্ষুরধার তারা উপরোক্ত সমস্ত সিম্পটমের অনুধাবনযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, যারা বাংলা সিনেমা নিয়ে তৃপ্ত তারা এই লেখা আর পড়বেন না, যাদের মনে হয় যে বাংলা সিনেমাতে, বা সিনেমাতে, তৃপ্তি পাওয়ার বা তাত্ত্বিক গুরুত্ব দেওয়ার মতো কিছুই থাকতে পারে না, তাদের এই সমস্ত লেখা অহৈতুকি মনে হবে, যাদের মনে হয় যে সিনেমার সংকট বা পতন জাতির সংস্কৃতির সংকট বা পতনের কোনো লক্ষণ হতে পারে না তাদের মনে হবে এই লেখা বাড়াবাড়িতে জর্জরিত।

কিন্তু আমি শেষ করবো এই প্রশ্ন করে যে এই অতৃপ্তির কি ঐতিহাসিকভিত্তি আছে কোনো, অথবা এই লেখার 'অতৃপ্ত বিষয়ী' কি ভ্যালিড একটি অবস্থান? আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার লেখাপত্র আলোচনা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেখানেও বাংলা সিনেমা নিয়ে আমার, শ্লেষ, হতাশা নিয়ে অনেক 'সিনেফিল' (শুধুই চলচ্চিত্রপ্রেমী বললাম না, এই শব্দটির একটি বিশেষ ওজন আছে) বলেছেন যে এত কথা খরচা করার মানে হয় না। বাংলা সিনেমা নিয়ে কিছু প্রত্যাশা করা স্রেফ প্রত্যাশার ভাঁড়ারে ক্ষয় করা মাত্র। বিশ্ব সিনেমার ইতিহাসের বয়স একশো পেরিয়েছে মাত্র, বছর কুড়ি বেশি, এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকা একটি জীবনকে ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট। তার মধ্যে সেলুলয়েড থেকে ডিজিটাল যুগে অবতীর্ণ করার হেতু বড়োসড়ো পরিবর্তন এসেছে ছবির জগতে। টরেন্ট ও পাইরেসির ফলে আমাদের আর হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হয় না ছবির জন্য। আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর আগেও কলকাতার একজন চলচ্চিত্রপ্রেমীকে অধুনার উল্লেখযোগ্য ছবি বা অতীতের ক্লাসিকের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হত, এখন আর হয় না। শুধু স্ক্রিনের সাইজ ছোট হয়ে গেছে, নয়তো কয়েকটি বিশাল স্টোরেজের হার্ড ডিস্ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ছবিতে ভর্তি করে ফেলাটা কার্যত কয়েক মাসের মধ্যেই সম্ভব। কলকাতার একটি ছেলের বা মেয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন সময়ের ছবির মধ্যে নিবিড় নিমজ্জনে বসবাস করা সম্ভব। আর ডিজিটাল শিফটের ফলে সমসাময়িক ছবির জগতেও উত্তেজক বহু পরিবর্তন যেমন হচ্ছে, অতীতের ছবির আর্কাইভ-এও এসেছে নতুন মাত্রা। স্রেফ ভালোবাসার শ্রমের ফলে আর পাগলামির ফলে এখন একটা কম্পিউটারে বিশ্ব-সিনেমার সাথে যে গভীর কথোপকথন সম্ভব সেটা আগে এরকমভাবে সম্ভব ছিল না। এই সময়ে একটা সম্ভাবনাহীন ছবির জন্য চিৎকার হা-হুতাশ করা মানে অনেকগুলি ভালো ছবি দেখার, মূল্যায়ন করতে শেখার সময় নষ্ট করা। আমার কাছে এই তিরস্কারের প্রতিযুক্তি দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আসলে দুরকম প্রতিযুক্তি বেঁচে থাকে। এক, আমার জীবিকার প্রতিযুক্তি। আমাদের কাজ যদি হয় ছবি নিয়ে পড়াশোনা তাহলে ইরানের একজন স্কলার তার সমসাময়িক ইরানিয়ান ছবি নিয়ে বলতে পারেন, একজন চীনের স্কলার তাদের ছবি নিয়ে, একজন ফিলিপাইন স্কলার তার সমসাময়িকে নতুন ছবি পাচ্ছেন যা নিয়ে সারা পৃথিবীর ছবির গবেষকরা শুনতে আগ্রহী— শুধুমাত্র একজন বাঙালি স্কলারের তার সমসাময়িকতা নিয়ে কথা বলার মতো ছবি নেই, আছে শুধু চল্লিশ বছর আগেকার ছবি। সত্যজিৎ, ঋত্বিক, অজয় কর, অসিত সেনকে কুমিরছানার মত তুলে তুলে ধরা বা ইতিহাসের পাঠের প্রক্রিয়ার রকমফের জানানো। বিশ্বকে জানানোর মতো বাংলা সিনেমার সমসাময়িক আমাদের জীবদ্দশায় বুঝি আর এলো না।

দ্বিতীয়ত, সময় ও সমাজ প্রতিনিয়ত নতুন 'সিনেমাটিক'-এর জন্ম দেয়। ভিন্ন ভাষার ছবিতে হয়তো আমার সমাজ ও আমার সময়ের 'সিনেমাটিক'-কে আমি পাবো না। একটি সিনেমাটিক ইমেজ, একটি সিনেমাটিক শব্দবন্ধ, একটি সিনেমাটিক মুহূর্ত শুধু যে সময়কে ধরে রাখে তাই-ই নয়, সময়কে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়, সময়ের প্রতি তা এক ধরনের প্রতিক্রিয়াও বটে। বাংলার 'সিনেমাটিক' চিরকালই হয় কপট, নয় দীর্ঘসূত্রী ছিল— খাদ্য আন্দোলনের সময়ে আমরা ক্ষুধার চিত্র বা খাবারের দাবিতে

চিৎকারের চিত্র পাইনি, দাঙ্গার সময়ে আমরা ভায়োলেন্সের, ভীতির ইমেজ পাইনি। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ অব্দি দেশব্যাপী দক্ষিণপন্থী হিন্দুদের উত্থানের কথা বাংলা সিনেমা থেকে জানা যাবে কি? যে পরিচালককে উদ্দেশ্য করে আমরা যথেষ্ট রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অভাবের অভিযোগ জানাতে ভালোবাসি সেই সত্যজিৎ রায় তার 'ঘরে বাইরে', 'গণশত্রু', 'আগন্তুক'-এ, দুর্বল ছবি হওয়া সত্ত্বেও, বারবার দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্বের উত্থানের কথা বলে গেছেন। আর কেউ বলেছেন? আর কারুর বলার মধ্যে সেই আর্জেন্সি ছিল? কোনো নান্দনিক আর্ট ফিল্মমেকারের ছবিতে চার্চ পোড়ানোর দৃশ্য আমাদের সেক্ষেত্রে নান্দনিক বলেই এক্সপ্লয়েটেটিভ লাগে।

অথচ একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, বিক্রমাজিৎ গুপ্তর 'লাদেন ইজ নট মাই ফ্রেন্ড'-এ আমি টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর কলকাতার একজন মুসলমান যুবকের যে ভীতির চিত্র পেয়েছি তা তো তাৎক্ষণিক ছিল। 'স্থানীয় সংবাদ'-এর শেষে একজন এডুকেশনাল অন্ত্রেপ্রেনিওরের যে অ্যাবসার্ড ক্ষমতার কাব্য— তা কি বাঙালির স্মৃতিতে থাকবে? স্মৃতিতে থাকবে যে বুলডোজার ইতিহাস গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে তার শব্দ শোনা যায় না, তার শব্দ? আশিস অভিকুন্তক নামে একজন অ্যান্থ্রোপলজিস্ট, যাঁর মাতৃভাষা বাংলা নয়, পরপর বাংলা ছবি করে চলেছেন যেগুলো মুক্তি পাওয়ার মতো নয়, এতটাই এক্সপেরিমেন্টাল; 'রতিচক্রব্যূহ' নামে তার একটি ছবি একটি দেড় ঘণ্টার সার্কুলার ট্রাক-শটে— হ্যাঁ, একটি মাত্র শটে— তোলা হয়েছিল। ছবিটি সেন্সর সার্টিফিকেট পায়নি কারণ একটি শটের ছবিতে কাঁচি চালানো যায় না, অথচ এখনকার রক্ষণশীল সেন্সর বোর্ড এই ছবির সংলাপে ক্ষণে ক্ষণে কাঁচি চালাতে চাইবে। এই অবাঙালির ছবি কি বাংলা ছবি? কেন সারা প্রবন্ধে আমি শুধুই পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্রের কথা বলেছি— নন-ফিকশন ও শর্ট ফিল্ম কি বাংলা সিনেমার ইতিহাসের অর্ন্তগত? যে ছবিগুলি মুক্তি পায় না, যে দৃশ্য ও শব্দ সেন্সরের কোপে কাটা যায় হয়তো সেইখানেই আমাদের কাম্য সমসাময়িক আছে? অর্থাৎ, বাংলা সিনেমার সংকট নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখতে বসলাম, হয়তো বাংলা সিনেমা বলতে আমরা যা বুঝি তা আরো বৃহত্তর কিছু, যার হদিশই আমরা রাখিনি।

আমার মনে হয় আমার এই প্রবন্ধের ভিত্তিটাই ভুল, কারণ প্রবন্ধটি বাংলা সিনেমার মধ্যে ক্রাইসিস ও তার সমাধানের শুলুকসন্ধান করে শুরু করেছিল। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে 'বাংলা সিনেমার সংকট' শীর্ষক বহু সেমিনার, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধমালা আমরা পড়তাম— যেখানে আর্ট ফিল্ম-মেকাররা আলোচনা করতেন, এবং অবধারিত আঙুল তোলা হত স্বপন সাহা, হরনাথ চক্রবর্তীদের দিকে; অর্থাৎ, নিজেদের সিনেমার পরিসরের বাইরে। ধরেই নেওয়া হত যে যেহেতু আলোচকদের নাম অমুক এবং অমুক, অতএব তারা 'ভালো ছবি'-র কাণ্ডারী। সেই সময়ে 'সুস্থ সিনেমা' বলে একটি শব্দবন্ধের বেশ প্রচলন ছিল। প্রথমত, এই বেসিক প্রেমিসটাই গোলমেলে যে কেউ একটা ছবি করবেন ঠিক করলেই সেটা ভালো ছবি হয়ে যায়। ছবি ভালো হতে পারে কেবল তার মুক্তির পর, মূল্যায়নের পর। দ্বিতীয়ত, সেই সময়ে সংকটটা ছিল শহুরে মধ্যবিত্তদের নিজের ছবির, কারণ মূল ধারায় তখন যে সিনেম্যাটিক কল্পনা বিস্তৃত হচ্ছে তা মধ্যবিত্ত ও শহুরেদের উদ্দেশ্যে তৈরিই হত না। তৃতীয়ত, ধরেই নেওয়া হতো যে তথাকথিত 'ভালো', 'সুস্থ', 'সাংস্কৃতিক' ভদ্রলোকের আর্ট সিনেমার যেন কোনো অন্তর্গত ক্রাইসিসই নেই যা আলোচ্য, ক্রাইসিসের কারণ শুধুই সফল মূল ধারার ছবি, যা অন্তত ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক-কর্মীদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা সুগম করছে তখন।

আজ যখন মাল্টিপ্লেক্সে মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি শুধুই মধ্যবিত্তকে উদ্দেশ্য করে তখন কি সেই সংকটের সমাধান হয়ে গেছে, যা সেইসব সেমিনারে আলোচিত হত? দেবের ছবি, রাজ চক্রবর্তীর ছবি কি এখন অপর্ণা সেন বা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবির সামনে আর বাধা? তা বলি কী করে যখন দেবই এদের ছবির নায়ক? অতএব এনারা আর সেই যুক্তিতে ভাবেন না। এতে প্রমাণ হয় যে নব্বইয়ের সেই সংকটবোধের ভিত্তিতেই ভুল ছিল। ক্রাইসিস ছিল ভদ্রলোকের সিনেমার ভিতরেই, বা ভদ্রলোকের আত্মপরিচিতির ঐতিহাসিকতাতেই।

সেভাবেই, এই প্রবন্ধের শেষে আমি বলতে চাই যে অধুনার বাংলা ছবির কোনো নিজস্ব বা অন্তর্গত ক্রাইসিস এখানে আলোচ্য নয়, কারণ তা সিনেমার ভিতরে পাওয়া যাবে না। ক্রাইসিস আপামর সংস্কৃতির। বাংলা ছবি আমাকে তৃপ্ত করছে না, এই অভিযোগ বায়বীয়। বাংলা কবিতা কি কবিতার পাঠকদের তৃপ্ত করছে, উপন্যাসের কি কোনো দিগভ্রান্তি হচ্ছে, নাটকের কি কোনো সংকট আছে, বাংলা গান কি কোনো নির্দিষ্ট দিকে এগোচ্ছে যা তৃপ্তিদায়ক? সংকট বিভিন্ন মাধ্যমের উঠোনে সীমাবদ্ধ নয়। উত্তর সংস্কৃতির পাড়াতেই খুঁজতে হবে, বা বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরে— হয়তো আধুনিকতার সংকটে। আর মনে হয় প্রশ্নটি আরো জটিল, কারণ আদপেই সংকট আছে বলে অনেকে মনেই করেন না।

বাংলা সিনেমার অর্থনৈতিক সংকট আছে— মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি হাউজের মনোপলিই একটি সংকট। তার মধ্যে ভেঙ্কটেশ ফিল্মস যে সিংহভাগ গলাধঃকরণ করেছেন, এটা সংকট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসবের দায়িত্বে থাকাকালীন সেই ফেস্টিভালে ইন্ডাস্ট্রির দাপট একটি সংকট। একের পর এক ফিল্ম সোসাইটি শুকিয়ে যাওয়া সংকট না হলেও সিম্পটম। যে ভাষায় রাজনৈতিক ছবি হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সেই ভাষার ছবির ইন্ডাস্ট্রির সম্পূর্ণ পলিটিকালাইজেশন, অর্থাৎ তৃণমূল পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পায়ে সমর্পণ একটি সংকট। এই ইন্ডাস্ট্রির নিয়ামক-রা যে অনেকেই পলিটিকাল পার্টির লোক, সেটা সংকট। যে হিন্দী ছবির কলকাতায় শুটিং হয়, তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তালিকায় একই চেনা নাম ঘুরে ফিরে আসা— সংকট। এই ইন্ডাস্ট্রির পুরোধা ব্যক্তিত্বরা যে মনে করেন যে একটি নতুন বাংলা ছবির ধারা গঠনরত, অতএব তার সমালোচনা করা অনুচিত— সেটা সংকট। ইন্ডাস্ট্রির গিল্ড যেভাবে তাদের শর্তাধীন না থাকলেও একটি ছবির ডিসট্রিবিউশন ও মুক্তি আটকে দিতে

পারে— সেটা সংকট। ইন্ডাস্ট্রিতে নবাগত কর্মী ও কুশীলবদের ঠিকমত পারিশ্রমিক না দেওয়া, সম্পূর্ণ প্রোডাক্টিভিটি-বিরোধী ওয়ার্ক-কালচার, শুধুই প্রফেশনালিজমের অভাব নয়, প্রফেশনালিজম-বিরোধিতা সংকট। নায়ক-নায়িকারা বাংলা বলতে পারেন না, পরিচালকরা পরিচালনার চাইতে পাবলিক-রিলেশন ও ম্যান-ম্যানেজমেন্টে বেশি ব্যস্ত থাকেন, তার বর্তমান ছবি যেন তেন প্রকারেণ শেষ হোক, আগামীতে শিওর ফাটিয়ে দেবেন নিজেকে ও সবাইকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি, একের পর এক ছবি উতরোচ্ছে— অর্থাৎ তৈরি হচ্ছে— কর্মক্ষম ও নির্ভরশীল টেকনিশিয়ান ও প্রোডাকশন ম্যানেজারের জন্য— এইগুলি সমস্যা; কিন্তু উপরোক্তগুলি সংকট।

আমার মনে হয়, আমরা যে সিনেমা চাই, সেই সিনেমার একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে এই প্রত্যয়ে যে আমাদের ভাষায় একটি ভুল যুগ্মপদ আছে— 'শিল্প-সংস্কৃতি', ইংরেজি করে বললে 'আর্ট-অ্যান্ড-কালচার'। সেই যুগ্মপদের আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছে। 'সংস্কৃতি' একটি কনসেন্সুয়াল ব্যবস্থা, সংজ্ঞায়িত ও সীমাবদ্ধ। সংখ্যাগুরুর দ্বারা ঐকমত্যে স্থিরীকৃত— অর্থাৎ যেখানে এইটা নির্ধারিত হয় যে কী সাংস্কৃতিক আর কী নয়, কী অনুমোদিত আর কী নয়। 'শিল্প' হয়তো এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ারই পন্থা, অভিব্যক্তি ও অনুধাবনের মুক্তির খাতিরে। সংস্কৃতি চেনা পথে আলো ফেলে হাঁটে, শিল্প অন্ধকারে পা ফেলে। সংস্কৃতি সাফল্যের খতিয়ান কারণ যা সফল তাই সাংস্কৃতিক, শিল্প ব্যর্থ হতে ভয় পায় না। কিউয়ের 'তাসের দেশ' কি সাংস্কৃতিক বাংলা ছবি? যে কারণে বিদ্দজ্জন ছবিটিকে রবীন্দ্রনাথের অসফল অবলম্বন বলবেন, আমরা কি বলতে পারি যে সেই ভুলের রিস্ক নিয়েছিল বলেই ছবিটিতে শৈল্পিক সম্ভাবনা আছে? শিল্প সম্ভাবনার, সাফল্যের নয়। শিল্প প্রশ্ন তোলার উপায়, সংস্কৃতি উত্তরের পুনরুক্তির নিদর্শন। শিল্প সমস্যার সাথে চোখাচোখি মোলাকাত, সংস্কৃতি সমাধানের আশ্বাস। বাংলা ছবিতে শিল্প দীর্ঘদিন নেই কারণ তা সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক হয়ে গেছে, সে সংস্কৃতি ভদ্রলোকেরও হতে পারে, মধ্যবিত্তেরও হতে পারে, কনজ্যুমারিস্ট সংস্কৃতিও হতে পারে, আমলাতান্ত্রিকও হতে পারে, প্রাদেশিক বা জাতীয়তাবাদীও হতে পারে। যে 'শিল্প-ছবি',আমি আর্ট-ফিল্মের ঝটিতি অনুবাদ করলাম, সংস্কৃতিতে অন্তর্গত হতে চায়, বা যার শরীরে সাংস্কৃতিক কোনো 'অযোগ্যতা' নেই তা হয়তো শিল্প হতে পারে না।

প্রসঙ্গত, এই প্রবন্ধে শিল্প হিসেবে বাংলা সিনেমার কোনো আলোচনাই আমি করিনি, সংস্কৃতি হিসেবে বাংলা ছবির আলোচনা করেছি মাত্র। সবচেয়ে বড় সংকট এই যে আমরা— যারা সিনেমায় শিল্প চাই— আমরাই কেউ জানি না আমরা কোন্ বাংলা ছবিকে চাই। বাঙালির কোনো অভীষ্ট সিনেমাটিক নেই, তার সিনেমাটিক চল্লিশ বছর আগে তোলা হয়ে গেছে, তার সিনেমাটিকের জন্য পিছনে ফিরে তাকাতে হয়, আগামীর বিমূর্ততাকে সে শব্দে ও চিত্রে মূর্ত করতে ভুলে গেছে— এটা একটা ভাষাগোষ্ঠীর ক্রাইসিস কিনা তা পাঠকের বিবেচ্য।

বাংলার মতুয়া আন্দোলন
সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি
মনোশান্ত বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী স্বদেশপ্রেম
দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মণিপুরের মেয়েরা
সংগ্রাম ঘরে বাইরে
সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাস রচনা
রামশরণ শর্ম, মহঃ আথার আলি, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা, সবুজ ভান
ভাষান্তর, গ্রন্থনা ও সম্পা. সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলের গারদে জীবনের গান
অজিত চক্রবর্তী (মাস্টারদা)

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি
সম্পাদনা. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক সাহা

ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে
সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

রামায়ণ গান
চব্বিশ পরগণার রামকথার মৌখিক ঐতিহ্য
সম্পাদনা: বিশ্বজিৎ হালদার

আগুনের খেয়া
সম্পাদনা : মধুময় পাল
নাট্যব্যক্তিত্ব কেয়া চক্রবর্তীর লেখা ও তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ সংকলন

NAXALISM
Post Structurist, Post Colonist and Subaltern Perspectives
Edited by : Pradip Basu

বিতর্কিকা
গ্রন্থ সমালোচনার পত্রিকা
সম্পাদক : অভ্র ঘোষ, মিলন দত্ত, তপস্যা ঘোষ
এবারের বিষয় : **কারা সাহিত্য**

আমাদের সব বই নিজস্ব ওয়েবসাইট, পোর্টাল
www.setuprakashani.com
১ অক্টোবর থেকে পাওয়া যাবে। প্রথম ৭ দিন বিশেষ ছাড় পাবেন দেশ ও বিদেশের পাঠকরা।

বুক মার্ক ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩
(একটি সেতু প্রকাশনী উদ্যোগ)

আর এস এস : একটি প্রাথমিক পরিচয়
আর এস এস-এর দেশবিরোধী দলিলের ভিত্তিতে রচিত
সামসুল ইসলাম
ভাষান্তর : অসীম চট্টোপাধ্যায়

শঙ্কর গুহনিয়োগীর সাথে কয়েক বছর
এক সহযোদ্ধার প্রতিবেদন
পুণ্যব্রত গুণ

সেতু প্রকাশনী
১২এ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৬
৯৪৩৩০৭৪৫৪৯/২২১৯০৭
আউটলেট : ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল ৭৩, ৮-৩৩৫০৪৪২৪৫
E-mail : setuprakashani@gmail.com

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

মূলধারার হিন্দী সিনেমায় নারীর নির্মাণ

ঋদ্ধি ভট্টাচার্য

সম্প্রতি একটি হিন্দী সিনেমা দারুণ হিট হয়েছে। অনেক টাকা রোজগারও করেছে। ৫৫০ কোটি টাকা। সলমন খান ও অনুষ্কা শর্মা অভিনীত 'সুলতান'। নাম-ভূমিকায় সলমন খান প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই মেগা হিট ছবিটি দর্শকদের চিত্ত জয় করেছে। তাই এই ছবিটি নিয়ে ভাবতে বসা। পুরনো ধারার মশলা ফিল্ম এই ছবিটি একটু আলাদা ধরনের। সিনেমাটির নির্মাতারও দাবি সেটাই। সিনেমায় অনুষ্কা শর্মা অভিনীত চরিত্রটির নাম আরফা। আরফা হরিয়ানার এক নারী কুস্তিগীর, যে অলিম্পিক থেকে সোনা বিজয়ের স্বপ্ন দেখে আর তার জন্য বছরের পর বছর খেটে চলেছে। কিন্তু এরপর গল্পটা আর অলিম্পিক-বিজয়ী সাক্ষী মালিকের ধারায় এগোয় না, অন্য বাঁক নেয়।

আরফার পথে দেখা দেয় সুলতান। পাড়ার এই মস্তান ছেলেটি আরফাকে বিয়ের বাসনা জানায়। আরফা অবশ্য তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে তার জীবনে এখন একটাই ধ্রুবতারা— কুস্তি। খাপ পঞ্চায়েতের রাজ্য হরিয়ানায় একটি মুসলিম মেয়ে পিতৃতন্ত্রের বাধা পেরিয়ে কুস্তি লড়ছে, অলিম্পিকে যেতে চায়। নারী মুক্তির এক প্রতীক হতে পারত এই মেয়েটি। কিন্তু আগেই বলেছি, গল্পটি এখানে যে বাঁক নেয় তাতে আরফা আর সাক্ষী মালিক হতে পারে না। কারণ সুলতান ও তার পুরুষের দম্ভ আরফা-র 'না'-কে মানতে রাজি নয়। ত্রিশোর্ধ সুলতানও কুস্তি শুরু করে দেয়। শুধু শুরু করে দেয় না, অনতিবিলম্বে সে এক বিরাট কুস্তিগীর হয়ে ওঠে। আরফা-র তাতে হৃদয় গলে যায়, এবং সে সুলতানের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। বিয়ের পরই সন্তানের প্রশ্ন। ২০১২ সালে আরফা যখন লন্ডন অলিম্পিকে তার মনোনয়নের চিঠি হাতে পেল তখন সে সন্তানসম্ভবা। একদিকে তার সারা জীবনের স্বপ্ন, কান্না, ঘাম, রক্ত। অন্যদিকে সন্তানসম্ভাবনা, এবং সেই সম্ভাবনা নিয়ে স্বামী সুলতানের উল্লাস। কিন্তু এই কঠিন সমস্যার অতি সহজ সমাধান করে আরফা। সে তার কোচ তথা বাবা-কে জানায়, সুলতানের আনন্দ-র চেয়ে অলিম্পিকের মেডেল তো বড়ো নয়! এক ধাক্কায় সে এক শক্তিশালী, উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়ী নারী থেকে কেবল এক স্ত্রী, মা ও স্বামীকে উৎসাহদাত্রীর ভূমিকায় নেমে যায়। সে যেন এখন আগের আরফা-র ছায়া মাত্র। এখন তার সব স্বপ্ন শুধু তার স্বামীকে নিয়ে। আর অন্যদিকে সুলতান, শুরুতে যে ছিল পাড়ার এক ফালতু ছোকরা, সে এবার দ্রুত পরিবর্তিত হয় এক বিশ্বমানের কুস্তিগীরে। সব প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে সে রকেটের গতিতে চলে যায় অলিম্পিকের পদক আনতে। তাহলে এই সিনেমার প্রধান বার্তা হলো, মেয়েদের আসল স্বর্ণপদক হলো মা হওয়া। তুমি অলিম্পিকেই যাও, বা যা-ই করো, সব কিছুর চেয়ে বড়ো হলো মা হওয়া।

এখান থেকে প্রশ্ন ওঠে, হিন্দী বাণিজ্যিক ছবিতে কি মেয়েদের স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের কেরিয়ার সব সময়েই পেছনের সারিতে থেকে যাবে? কবে সিনেমায় আসবে সত্যিকারের বাস্তব জীবনের কথা, যেখানে শয়ে শয়ে সাক্ষী মালিক হাজার বাধা পেরিয়ে অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত হয়? আজকের মেয়েদের জীবনের স্বপ্ন ও বাস্তবকে কবে দেখাতে সক্ষম হবে বাণিজ্যিক সিনেমা? বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সফল 'সুলতান' শুধু একটা সাধারণ ভাবনাহীন সিনেমা নয়, এটি একটি অত্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক ছবি। পুরুষের আনন্দের জন্য নারীর জীবনের সব স্বপ্ন বিসর্জন দেওয়া উদ্‌যাপনের ছবি। নারীর 'না' মানেই হ্যাঁ, এই পুরুষতান্ত্রিক ধারণাকে উৎসাহ দেওয়ার ছবি। বলা প্রয়োজন যে এই শেষোক্ত ধারণা থেকে আমাদের সমাজে মেয়েদের পেছনে লাগা-টা একধরনের মান্যতা পেয়ে যায়। আর তাতে বলিউডের ভূমিকা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

আজ বিশ্বায়নের যুগে হিন্দী সিনেমায় নারী সংক্রান্ত বিষয় ও নারীদের কীভাবে দেখানো হচ্ছে, এই প্রবন্ধে সেটাই আলোচ্য। কেন হিন্দী সিনেমা? ভারতীয় সমাজ সিনেমা দিয়ে দারুণ প্রভাবিত। সবচেয়ে আকর্ষক মিডিয়া এটি আর তা পৌঁছে যায় সবচেয়ে দূরে দূরে, দেশের সব প্রান্তে। জাতি ও শ্রেণী-গত সব বাধা অতিক্রম করে সমাজের সব অংশে পৌঁছে যায় হিন্দী সিনেমা। এলিট ও সাধারণ মানুষ, পৌঁছে যায় সবার কাছেই। সাহিত্যর চেয়ে সিনেমার গ্রাহক অনেক বেশি, অনেক ব্যাপক। আমাদের সমাজে ভারতীয় সিনেমার যে গভীর প্রভাব আছে, অন্য কোন মিডিয়ার তা নেই। এই শতকের ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দী সিনেমা একটা বড়ো রেফারেন্স পয়েন্ট। আধুনিক ভারতের সমাজের পরিবর্তনে হিন্দী সিনেমা প্রভাব ফেলেছে, এবং তাকে প্রকাশ করেছে। নিজেদের জীবন সম্পর্কে মানুষ কী ভাবে সেই চিন্তাকেও প্রভাবিত করে হিন্দী সিনেমা।

বলিউড এখন বহু মিলিয়ন ডলারের এক ইন্ডাস্ট্রি। বিশ্বের অন্য সব দেশের চেয়ে বেশি সিনেমা তৈরি হয় এখানে। ভারতীয়দের মনন ও ব্যবহারকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বলিউডের এক শক্তিশালী ভূমিকা আছে। আমি বলতে চাই, এটা শুধু এক বিনোদন বাণিজ্য নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। অনেক দিন ধরেই সিনেমা ভারতীয়দের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে আসছে। সিনেমার হিরোরা প্রায়ই দেবতার সম্মান পান।

হিন্দী সিনেমার ইতিহাস এবং সমাজের পরিবর্তন নিয়ে একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে বলিউডে নারীদের কীভাবে চিত্রায়িত করা হবে সময়ের সাথে সাথে তা পাল্টেছে। সিনেমার বিষয়বস্তু,

কোথায় সেটির শ্যুটিং হবে, এবং এমনকি সেটিং-এর ওপরও বিশ্বায়ন ও পশ্চিমা সংস্কৃতির জোরালো প্রভাব পড়েছে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে প্রগতি ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, স্পেশাল এফেক্টের ক্ষেত্রে, আরও চমৎকার সুন্দর পরিবেশে শ্যুটিং করার ব্যাপারে। এখন সিনেমার চরিত্রগুলি হয় এনআরআই। কথাবার্তায় তারা দারুণ পশ্চিমা, পোষাকের ক্ষেত্রেও আধুনিকতার প্রভাব, পাশ্চাত্যের প্রভাব। সিনেমা তৈরি ও তা বাজারজাতকরণের পুরো প্রক্রিয়াটাও অনেক বেশি বাণিজ্যিক, ঝকঝকে, কর্পোরেট ধরনের। সিনেমা তৈরির ব্যাপারটা পুরোপুরি একটা ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু এই ঝকঝকে মোড়কের সিনেমাগুলোতে নারীকে এখনও চরিত্রায়িত করা হয় পুরনো ধরনে।

এমনিতে নায়িকারা দেখতে হয় পাশ্চাত্য ধরনের, তাদের সাজপোষাকে পাশ্চাত্যের ছাপ, তাদের চারপাশে সবকিছু পাশ্চাত্য ধরনের, তাতে কিন্তু এই নারীরা প্রগতির স্বাদ পায় না, সিনেমাটির বিক্রি বাড়ানোর জন্য তাদের সুন্দর একটা পণ্য বানানো হয়। পশ্চিমা প্রভাবে শরীর দেখানো বেড়েছে, তাতে করে শুধু দেশে নয় বিদেশেও সিনেমাটির দর্শক বাড়ে, এই পর্যন্ত। অন্যদিকে ধর্ম, পৌরাণিক কাহিনী, পরিবার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে কিছু বস্তাপচা ধ্যানধারণার ভীষণ প্রভাব আছে বলিউডের ওপর, বলিউডে নারীর চরিত্রায়ণের ওপর। এই ধ্যানধারণাগুলোর পেছনে আছে পুরুষতন্ত্র। তাই নারীদের দেখানো হয় এই 'সনাতন' মূল্যবোধের প্রতি অনুগত হিসেবে, পুরুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত হিসেবে। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত নারী নিজেই এই মূল্যবোধগুলি আত্মস্থ করে নেয়, পিতা বা প্রেমিক বা স্বামীর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা বিসর্জনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে। যেমনটা হয়েছে আরফা-র ক্ষেত্রে।

হিন্দী সিনেমায় নারীকে দেখানো হয় একমাত্রিক চরিত্র হিসেবে— সে কন্যা, স্ত্রী, পুত্রবধু, বারাঙ্গনা, প্রেমিকা বা বিধবা। এ ধরনের ছকে বাঁধা চরিত্রের কোন নিজস্বতা থাকে না, থাকে না বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব। তাদের অবস্থান শুধু পুরুষের নিরিখে, নায়কের চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে। পুরুষতন্ত্রে নারীত্বকে যেভাবে নির্দেশ করা হয় ভারতীয় সিনেমায় সাধারণত নারীকে সেভাবেই দেখানো হয়ে থাকে। অবশ্য আজকের বলিউড সিনেমা ও প্যারালাল সিনেমায় দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে নারী এই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। কিছু কিছু সিনেমায় তারা সাহসী ও শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে দেখা দিচ্ছে, দেখা দিচ্ছে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সহ। কিন্তু এ সব সিনেমাগুলো বাণিজ্যিকভাবে 'সুলতান'-এর মতো সফল চলচ্চিত্র নয়। তবে 'কুইন', 'পিকু' বা 'মর্দানি'-র মতো কিছু কিছু ছবি বাণিজ্য-সফলও হয়েছে। শক্তিশালী নারী চরিত্র নিয়ে আরও বেশ কিছু ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেগুলি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি। সত্তরের দশকের আর্ট ফিল্ম মুভমেন্ট নারীর পণ্যায়ন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তারা ছবিতে নারীদের নিপীড়ন ও শোষণের ওপর জোর দিয়েছিল। কিন্তু সেই ফিল্ম মুভমেন্ট এখন মৃত।

জনপ্রিয় হিন্দী সিনেমার ওপর লেখা তাঁর বই *বলিউড গাইডবুক*-এ টি গান্তি বলেছেন, হিন্দী সিনেমা যদিও এদেশের মোট সিনেমার মাত্র ২০ শতাংশ, কিন্তু কেবল সেগুলিকেই সারা দেশে ও সারা বিশ্বে দেখতে পাওয়া যায়, এগুলিই ভারতীয় সিনেমা সম্পর্কে সারা বিশ্ববাসীর ধারণা নির্মাণ করে।

ফেমিনিস্ট রিভিউ (১৯৮৪)-এ 'উইমেন ইন ইন্ডিয়ান সিনেমা' লেখাটিতে উর্বশী বুতালিয়া লিখেছেন, ভারতীয় সিনেমা হলো জনগণের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১.২ কোটি মানুষ সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখছে। অর্থাৎ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায়। ফলে এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আছে কারা, কারা একে নিয়ন্ত্রণ করে সেই বিচার জরুরি।

মুম্বাইয়ের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পুরুষ প্রাধান্য বেশ প্রকট। এখানে মহিলা বলতে শুধু অভিনেত্রী আর গায়িকারা। গায়িকা থাকলেও গান রচয়িতা বা সুরদাতাদের মধ্যে মহিলা প্রায় নেই। সম্প্রতি কিছু কিছু মহিলা কোরিওগ্রাফার, পোষাক ডিজাইনার, এডিটর ও স্ক্রিপ্ট লেখক এসেছেন বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নেহাতই কম। দু-একজন মহিলা সিনেমা পরিচালনাও করেছেন, কিন্তু তাঁদের কারোরই সেরকম বাণিজ্যিক সাফল্য নেই। সিনেমার পর্দায় মাঝে মাঝেই নায়কের পাশে তার মা, প্রেমিকা, বোন ইত্যাদি ভূমিকায় মেয়েদের দেখতে পাওয়া গেলেও পর্দার পেছনে তারা প্রায় অনুপস্থিত। যে ইন্ডাস্ট্রিতে পর্দার পেছনে মেয়েদের সংখ্যা এত কম সেখানে ধরে নেওয়াই যায় যে পুরুষ পরিচালক ও অন্যান্য পুরুষ কর্মীদের চিন্তায় লিঙ্গগত পক্ষপাত থাকবে— নারীর চিন্তাভাবনা, নারীর ধ্যানধারণা, নারীর অবস্থানের ওপর আলোকপাত কমই হবে।

একদিকে পরিচালকের চিন্তায় আছে নারী সম্পর্কে কিছু পুরুষতান্ত্রিক ধারণা, আর অন্যদিকে দর্শকও চায় এমন কিছু দেখতে যা তার ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের সঙ্গে মেলে। সেগুলো আবার তৈরি হয়, পরিচালকের মতোই, সমাজে তার যাপিত জীবন দিয়ে। ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে এটাই হয়। বর্তমান সমাজ, বর্তমান কাঠামোকে সে কোন প্রশ্ন করে না। কারণ তাতেই সবাই খুশি। মনে হয় যেন নারীকে ভারতীয় সিনেমায় যেভাবে দেখানো হয় তাতে কারোর কোনও আপত্তি নেই, তাই পরিবর্তনেরও কোন প্রয়োজন নেই।

সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো ও ধর্ম সহ ক্ষমতা কাঠামো, হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস, জন-সংস্কৃতিতে হিন্দু মহাকাব্যগুলি ও পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব— এগুলো দর্শকদের রুচি ও পছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিচালক ও প্রযোজকরা এটা মাথায়

রেখে সিনেমা তৈরি করেন, তাতে তাঁদের মুনাফা বাড়ে। দর্শকও এমন কিছু দেখে না যাতে তার নিজের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ধাক্কা খায়। এভাবে ব্যাপারটা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এই চক্র থেকে বেরোনো কঠিন। কিন্তু কিছু কিছু সাহসী পরিচালক অবশ্য তা থেকে বেরোনোর চেষ্টাও করছেন।

অথচ কয়েক দশকে সমাজে ভারতীয় নারীদের ভূমিকা কিছুটা হলেও পাল্টেছে। সংসদে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য নারীরা লড়াই করছে। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ি ও পরিবারের বাইরে এসে মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা পাল্টে দিচ্ছে। সমাজে মেয়েদের যেভাবে দেখা হয়, যেভাবে ব্যবহার করা হয়,সেগুলিকে প্রশ্ন করছে তারা। ধর্ষিতা বা অ্যাসিডে পোড়া মুখের নারীও মুখ লুকিয়ে না থেকে এগিয়ে এসে বলছে, এগুলো তো আমার লজ্জা নয়, সমাজের লজ্জা। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিনেমায় নারীদের চিত্রায়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সিনেমা কি মেয়েদের এই পরিবর্তনকে, সমাজের এই পরিবর্তনকে সঠিকভাবে চিত্রায়িত করছে? এ প্রশ্নটি নিয়ে চর্চা প্রয়োজন। কারণ, আগেই বলেছি, ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী জনমাধ্যম হলো সিনেমা, বিশেষত হিন্দী সিনেমা, বলিউডের সিনেমা। তা জনমানবকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে।

নব্বইয়ের দশক থেকে, বা বিশ্বায়নের হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে হিন্দী সিনেমায় নারীদের ভূমিকা আরো নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে। নারী সম্পর্কে এক দক্ষিণপন্থী ভাবনার প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সময়। এর মাধ্যম হলো পারিবারিক ছবি। এই গোত্রের ছবি দর্শকের মধ্যে খুব জনপ্রিয়, বিশেষ করে নারী দর্শকের মধ্যে। আগেও পারিবারিক ছবি হতো, কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে এগুলির পরিমাণ ও প্রভাব খুব বেড়ে যায়। পাশাপাশি, ভারতীয় সিনেমায় ঐতিহ্য/আধুনিকতার দ্বন্দ্ব এখন ভারতের বাইরে অভিবাসীদের কেন্দ্র করেও শুরু হয়েছে। 'ভারতীয়'/পাশ্চাত্য নিয়ে এই টানাটানিতে 'ভারতীয় সংস্কৃতি'র নৈতিক বিজয় ঘোষিত হয়েছে। বিলেত ও আমেরিকায় অনাবাসী ভারতীয় বা এনআরআই-দের মধ্যে হিন্দুত্ববাদীদের সমর্থনের এক ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এই সিনেমাগুলোতে প্রথম প্রজন্মের অনাবাসিক ভারতীয়দের কাছে ভারতের এক 'সরল ও সুখী' জীবনের কথা চিত্রিত করে, যা তাদের মধ্যে এক নস্টালজিয়া তৈরি করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে তা এক কল্প-ভারত নির্মাণে সক্ষম হয়। পশ্চিমের বস্তু-সর্বস্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের বিপরীতে বস্তু নিয়ে অনাগ্রহী, কৌম জীবনের এক সুখ-স্বপ্ন!

শেষত, এইসব ফিল্মের গল্পটি চলতে থাকে ভারতের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের পাশাপাশি। একই সময়ে এদেশে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের বৃদ্ধি ঘটেছে, তারা আরও সংহত হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি এতদিন তার কঠিন বক্তব্যগুলি নিয়ে বেশি এগোনোর চেষ্টা করতে পারে না। কিন্তু তার সেই লুকোনো বক্তব্যগুলো বিশ্বায়ন-পরবর্তী বলিউডের ছবিগুলিতে সুচতুরভাবে ধরা হয়েছে।

এই সিনেমাগুলিকে তাই বলা চলে হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থার বক্তব্যের ফিল্মায়িত রূপ। ১৯৯৯ সাল থেকে ভারতে যেসব ছবি তৈরি হয়েছে তার প্রায় প্রতিটিতেই একজন পিতা, বা পিতামহ বা নিদেনপক্ষে একজন জ্যাঠা-কাকা থাকেন। এরা যেন হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থীদের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার প্রতীক। যৌথ পরিবার-কে ভারতীয় জীবনযাত্রা বলে দাবি করার পাশাপাশি এই সিনেমাগুলো সেই জীবনযাত্রাকে সুখী জীবনের ধারণার অঙ্গীভূত করে ফেলে। প্রশ্ন করা হয় না, এইরকম স্তরীভূত কেন্দ্রায়িত ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ কি আজকের সমাজে সম্ভব, বা কাম্য? সিনেমায় যুবকরা বয়স্কদের কথা শুনে চলেন, না শুনলে পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। নারীরা পুরুষদের ও বয়স্কা নারীদের কথা শুনে চলেন। পাশাপাশি আবার চলে নারীর পণ্যায়নও।

কুমকুম রায় তাঁর 'নারীকে যেখানে পুজো করা হয়, দেবতারা খুশি হন?' শীর্ষক প্রবন্ধে মনুস্মৃতি অনুসারে হিন্দু নারীদের রূপ-নির্মাণের হিন্দুত্ববাদী প্রচেষ্টা খুঁজে বের করেন। সেখানে নারীকে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, পুরুষ যার স্বত্বাধিকারী। পাশাপাশি স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর ঐতিহ্যবাহী অবস্থানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নারীকে দেখানো হয়েছে নির্ভরশীল ভূমিকায়। তারা ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। তারা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, সামাজিক মূল্যবোধকে ধরে রাখে। নারী জাতীয়/সাংস্কৃতিক স্বরূপের প্রতিনিধি। নারীর শরীর সাংস্কৃতিক প্রতীক/চিহ্নগুলি ধরে রাখে। সিঁদুর বা মঙ্গলসূত্রের মতো বিবাহের প্রতীকগুলিকে নিয়ে তাই এত মাতামাতি। নারী প্রসঙ্গে ঐতিহ্য/আধুনিকতা-র দ্বন্দ্ব আবার জড়িত আছে শরীর/আত্মা, বাহির/ভিতর দ্বন্দ্বের সঙ্গে।

হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থীদের চোখে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক একক। পরিবার হলো সেই জায়গা যেখানে 'হিন্দু সংস্কৃতি'র মূল্যবোধ রোপন করা হয়। নারী ও পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে মেলে পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে। সেজন্যই বোধহয় সব উৎসব উদ্‌যাপন আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ওপর এত জোর দেওয়া হয়। এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী, শক্তিশালী ও সুস্থিত পরিবার একটি শক্তিশালী ও সুস্থিত জাতি বা রাষ্ট্রের ধারণার বীজ। পরিবারের কাঠামোর মধ্যে কঠিন ক্রম-সমন্বিত সংগঠন বা হায়ারার্কি পরিবারের নিয়ম, পরিবারের শাসন মেনে চলতে বলে তরুণদের। এই কাঠামোয় নারীদের থাকতে হয় তাদের জন্য স্থিরীকৃত জায়গায়, তাদের জন্য স্থির করে দেওয়া কাজ করে যেতে হয় তাদের। নারী সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদী ধারণার কেন্দ্রে আছে মাতৃশক্তি-র ধারণা। ভালো স্ত্রী ও ভালো মা-কে শ্রদ্ধা করো, ব্যক্তি হিসেবে নারীকে নয়।

হিন্দু দক্ষিণপন্থীদের নারীত্ব-র নির্মাণ অবশ্য কেবলমাত্র ঐতিহ্য-ভিত্তিক নয়। তাদের চোখে আদর্শ ভারতীয় নারী হবে একই সাথে আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী। এই আখ্যানবাহী সিনেমাগুলি কিন্তু শিক্ষামূলক বা ধর্মীয় সিনেমা নয়, প্রান্তিক সিনেমা নয়। এগুলি সব নাচে গানে ফাইটিং-এ পরিপূর্ণ হিট ছবি। নাচ-গান, বিদেশে শ্যুটিং, ডিজাইনার পোষাক, দারুণ ফোটোগ্রাফি, আর এর সুন্দরী, লাস্যময়ী নায়িকা অনেকসময়ই মেধাবী, জীবনে সফল এক নারী, যে নারীত্বের এই ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। এইসব মশলা দিয়ে যে সিনেমাটি নির্মিত হয়, তা দর্শকদের, বিশেষ করে তরুণ দর্শকদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। নীরবে তা ভেতর থেকে দর্শকদের জীবনবোধে পরিবর্তন আনতে থাকে। আর তা হলেই হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের উদ্‌গাতাদের উদ্দেশ্য সম্পূণ সফল হয়।

পর্দায় যে সিনেমা চলতে থাকে তাতে আছে পুরুষরা, তাদের দ্বন্দ্ব, তাদের স্বপ্ন, তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি, তাদের প্রতিশোধ, কামনা, তাদের হিরোগিরি। আর পর্দার নারীদের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, কামনা-বাসনা, ভোগ-ত্যাগ সবই পুরুষদের ঘিরে— তাদের স্ত্রী বা মা হিসেবে, প্রেমিকা হিসেবে। প্রেমিক বা স্বামী নেই এমন কোন নারীকে ঘিরে সিনেমা প্রায় নেই। কোনও ছবিতে নায়িকা নিজের মতো স্বাধীন ভাবে চলছেন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিচ্ছেন, কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করছেন— এসব ছেড়ে দিন— নায়িকা কর্মরতা এটাও প্রায় দেখা যাচ্ছে না। যদি দেখাও যায় সেটা বিয়ের আগে, বিয়ের পর নয়। দেখা যায়, যেসব নারী 'ঐতিহ্য' মেনে চলছেন, তারা সুখী হচ্ছেন। আর যারা এই 'ঐতিহ্য' থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, হয় তারা পরে লজ্জাবনত মুখে ফিরে আসছেন, নয়ত এক অসুখী, অনৈতিক জীবন বহন করে চলেছেন।

এর পাশাপাশি চলতে থাকে নারীর যৌবন আর 'সৌন্দর্য' পূজা। এই সব সিনেমায় নারীরা শুধু সুন্দর একটি মুখ। তাদের সৌন্দর্য এইসব সিনেমায় পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাদের এই বিশেষ ভূমিকাটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় নাচ-গানের দৃশ্যে। এই সব নাচ-গান সিনেমাটি বিকোতে সাহায্য করে, সিনেমার প্রচারেও এগুলো খুব গুরুত্ব পায়। এখন তো আইটেম নাম্বার বলে এক ধরনের বিশেষ নাচ-গান দেখা দিয়েছে, সেগুলির উদ্দেশ্যই হলো পুরুষ দর্শকের মনোরঞ্জন। অনেক সময়ই এই আইটেম নাম্বারের সঙ্গে মূল ছবির খুব একটা সম্পর্ক থাকে না। শুধু পুরুষ-দর্শক টানার জন্য এগুলো সিনেমার মধ্যে জোর করে ঢোকানো হয়। বলা বাহুল্য, আইটেম নাম্বারের প্রধান জায়গা নাচ বা গান নয়, যত নগ্নভাবে সম্ভব নারীশরীর ও শরীরী বিভঙ্গ দেখানো। মেক-আপ, পোষাক, ক্যামেরা কারসাজির মাধ্যমে পুরুষের কামনার দৃষ্টিতে নারী শরীর প্রদর্শন।

পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের চোখে তরুণী নারী আকর্ষক, বয়স্কা নারী অনাকর্ষক। তাই নায়কের বয়স পঞ্চাশের কোঠায় হলেও নায়িকাকে হতে হবে তরুণী।

আজকের স্যাটেলাইট টিভি আর কেব্‌ল টিভি-র যুগে মার্কিন দর্শকের কাছেও ইন্টারনেট, ভিডিও ও অন্যান্য নানা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারীর এক চিত্র পৌঁছে যাচ্ছে। এই চিত্র ভারতীয় নারীকে যেভাবে দেখায় তা আসলে ভারতীয় নারীকে খর্বিত করে। এই নারীর রঙ ফরসা, চমৎকার ইংরাজি বলে সে, সমাজের উপরের তলা থেকে আসা। কিন্তু এ নারী তো কোটি কোটি ভারতীয় নারীর প্রতিনিধি নয়। আর একধরনের ভারতীয় নারীর কথাও থাকে। গ্রামে বসা করা এই ধর্মবিশ্বাসী এই নারী পিছিয়ে পড়া চিন্তার। তার জীবন-সংগ্রাম, জীবনের পথে প্রগতির পথে তার দৃপ্ত পা ফেলার কথা আসে না কোথাও। এই দুই নারী যেন দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। একদিকে শহরের, শিক্ষিত, পয়সাওলা, আকর্ষক, বিশ্ব-নাগরিক নারী। আর অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের গ্রামের অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া নারী। রক্ত-মাংসের ভারতীয় নারীকে, আসল ভারতীয় নারীকে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করার কোন প্রচেষ্টাই নেই।

সত্তরের দশকের কাল্ট ফিল্ম শোলে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত হিন্দী সিনেমায় নারীরা প্রায়ই বিপদে পড়া সুন্দরী রাজকন্যা, নায়ক এসে নাইটের মতো তাকে উদ্ধার করে। আর এক ধরনের নারী আছে, সুন্দরী লাস্যময়ী এই নারীদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভালো (পয়সাওয়ালা, বড়ো ঘরের) পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। নারীর জীবনের ওপর তেমন আলো ফেলা হয় কোথায়! হয় সে গৃহ নামক সমস্যাসঙ্কুল কারাগারের চক্রব্যূহে আবদ্ধ এক জীব, নয়ত খুনোখুনি, প্রেমিক আর বিশ্বাসঘাতকতার নাটকের এক পরোক্ষ চরিত্র। বিয়ের আগে যে মেয়েটি ছিল খুব আধুনিক, স্বাধীন, ঝকঝকে, বিয়ের পর, অনেকসময়ে প্রেমিক আসার পরই, সে কেমন ভিজে ভিজে, প্রথাগত, রক্ষণশীল হয়ে পড়ে, তার স্বাধীন চেতনা জলাঞ্জলি দিতে এতটুকু সময় লাগে না। এর কারণ হলো দর্শকের বাস্তব থেকে পলায়নের ইচ্ছার কাছে নতি শিকার করা, পুরুষ-দর্শকের ফ্যান্টাসির কাছে নতি স্বীকার করা। এতদিন ধরে এভাবে নারীর স্টিরিওটাইপ বর্ণনাই তো জনপ্রিয় সিনেমা তৈরি করেছে। তাকে পাল্টানোর চেষ্টা করবে কে?

সিনেমায় পশ্চিমা ধাঁচের অনুপ্রবেশ বলিউডের নারী চিত্রণকে স্বাভাবিক করে দেখাতে খানিকটা সাহায্য করে। বলিউডের ছবির এখন বিশ্ব জোড়া বাজার তৈরি হচ্ছে। তাই হলিউডের মতো তাকেও অন্তত বাইরের দিক দিয়ে সমসময়ের হয়ে উঠতে হবে। বিশ্বায়ন ও পাশ্চাত্য প্রভাবে বলিউডের সিনেমার পরিবর্তন হচ্ছে।

ভারতকে দিন দিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে এদেশের বাইরে এদেশের জনপ্রিয় মাধ্যমগুলিকে দেখাটাও বদলে যাচ্ছে, বিশেষ করে বিশ্বের বড়ো শহরগুলিতে। আর এরই একটা ফল হলো ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিশ্বায়ন। ভারতীয় সিনেমার ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কী ফল পড়ছে সৌন্দর্যের বা যৌনতার

ধারণার ওপর, বা নারীর লিঙ্গগত ভূমিকার ওপর?

জার্নাল অ্যাব্রড-এ 'হাও উইমেন আর স্টিল স্টিরিওটাইপ্‌ড ইন হিন্দী সিনেমা' লেখায় ভি লক্ষ্মী লিখেছেন, ''দাদাসাহেব ফালকের 'রাজা হরিশচন্দ্র' হরিশচন্দ্রের স্ত্রীর সিনেমার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা থেকে 'মাদার ইন্ডিয়া'-য় মায়ের দুঃখী কিন্তু সাহসী ভূমিকা, তার পর 'মাদার ৯৮'-এর লিবারেটেড সিঙ্গল মাদার, এটা ভারতীয় সিনেমায় একটা লম্বা ও কঠিন (চ্যালেঞ্জিং) যাত্রা।" একটি বাক্যের মধ্যে লক্ষ্মী ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের গতিপথ এঁকে দেন। ১৯১৩ সালের নির্বাক চিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র', ১৯৫৭ সালে 'মাদার ইন্ডিয়া', এবং ১৯৯৯ সালের 'মাদার ৯৮'। এই দীর্ঘ সময় ধরে দেখলে ভারতীয় সিনেমায় নারীর ভূমিকা তো অনেক ভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কি অনেকটাই শুধু বহিরঙ্গের পরিবর্তন নয়?

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ভাবমূর্তি নির্মাণকে সহজ করে তুলেছে। একে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। মূলধারার 'বলিউড' সিনেমার ধাক্কা অন্যান্য ভাবমূর্তিকে সরিয়ে দেবে— এই ভয় অলীক নয়। কিন্তু বারবার এর মধ্যেই পথ খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টাও চলছে।

পুরনো বলিউডের দিনে ফিরে যাওয়াটাই ভালো এমন কথা আমি বলছি না। সেসময় প্রেমকাহিনীই ছিল বলিউড সিনেমার মূল ব্যাপার। বরং আগে অনালোচিত বিভিন্ন দিক, যেমন বিবাহ-পূর্ব যৌনতা বা বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েও যে সিনেমা হচ্ছে সেটা ভালো ব্যাপার। কিন্তু পাশাপাশি, সিনেমায় নারীকে যৌনবস্তু করে তোলার মধ্য দিয়ে সমাজে, ব্যক্তিজীবনে ও পেশাগত জীবনে নারীর যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটুকুও ছিনিয়ে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছে, তার বিরোধিতা করা দরকার। ভারতের এই শক্তিশালী চিত্তবিনোদন শিল্পের একটা দায়িত্ব আছে ভবিষ্যৎ ভারত গড়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার। নারী চরিত্রগুলির সেই ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে করে এই কাঠামোর মধ্যে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য গুরুত্ব পায়। শুধু পুরুষদের চোখের আরাম দেওয়া নয়, সিনেমার নারী চরিত্রগুলির আরও কিছু করার সময় এসে গেছে।

বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে নারীদের অভিজ্ঞতা ও তাদের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠুক সিনেমার আখ্যান। নারী চরিত্রগুলির স্বপ্ন সফল হওয়ার জায়গা গড়ে তুলতে হবে সিনেমায়। সিনেমা তো শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়। বিনোদনের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রগতির সন্ধান করাও তার কাজ। একটি প্রচারমাধ্যম হিসেবে আধুনিকতার প্রসারও তার কাজ। তাই হিন্দী সিনেমাকে ফরমুলা ফিল্ম-এর বাইরে বেরোতে হবে। অনেক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীকে দেখানোর পথে এগোতে হবে তাদের। নারী ও সমাজে নারীর ভূমিকার প্রতি সুবিচারের স্বার্থে এটা করা দরকার। দরকার সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ❐

লোকসংস্কৃতিতে আগ্রাসনের কয়েকটি দিক

৬৪ পৃষ্ঠার পর

থেকে মানুষের মুক্তিই একমাত্র পথ। 'লোক'-কে বাঁচানোই লোকসংস্কৃতিকে বাঁচানোর সবচেয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ। ডিজিটাল ম্যাগাজিন, গানকে ক্যাসেটবন্দি করা, ওয়েবসাইট বা ব্লগ চালানো, ছোটখাটো স্টুডিও তৈরি বা ইউ-টিউবে লোকসংস্কৃতি পরিবেশনের চ্যানেল বানানো কিংবা কমিউনিটি রেডিও চালানো যেতেই পারে, করাও উচিত। এতে কেবলমাত্র বাজারের কবলমুক্ত সঠিক সংরক্ষণ হবে কিন্তু তাতে লোকশিল্প বাঁচবে না। বলা যায় লোকশিল্পের বিলুপ্তির সময়কালকে দীর্ঘায়িত করতে পারা যাবে মাত্র। লোকশিল্পকে বাঁচাতে বরং তৈরি করা যেতে পারে নতুন যৌথ পরিসর। এলাকায় এলাকায় ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত, এমনকি এনজিও প্রভাবমুক্ত সেকুলার চরিত্রের মেলা বা জন-উৎসব আয়োজন করা যেতে পারে।

বিলুপ্তপ্রায় শিল্পগুলিকে ওয়ার্কশপ মারফত নতুনদের শিখিয়ে আবার নিজেদের সমাজে ফিরে গিয়ে সেগুলোর পুনরুৎপাদন, চর্চা ও পরিবেশনার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। গরিব শিল্পীদের লোকশিল্পের উপকরণগুলো (যেমন লোকবাদ্য) সারানোর কিংবা নতুন কেনার আর্থিক সহায়তা যোগাড় করা যেতে পারে লোকসমাজ থেকেই। লোকসমাজকে আবার তার সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক করে তুলতে হবে। লোকসংস্কৃতি যেহেতু শ্রমজীবী মানুষের একান্ত আপনার জিনিস, লোকসংস্কৃতিও বরাবরই ছিল মেহনতি মানুষের শ্রমের সাথে, তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সাথে, তার মুক্তির আকুলতার সাথে সম্পৃক্ত। আজও লোকসংস্কৃতি সেটা করতে পারে। আজকের শ্রমের যন্ত্রণা, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা আর অসহনীয় অসম্মানজনক জীবনযাপনের কথা নিয়েই লোকশিল্প নির্মাণ করতে হবে। লোকশিল্পের ভাষাতেই ফুটিয়ে তুলতে হবে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আকুলতাকে। আর মুক্তি সম্ভব একমাত্র বিদ্রোহে— এই দার্শনিক ভিত্তির ওপর লোকসংগীতকে আশ্রয় করে বিকশিত হতে পারে গণসংগীত (কোনো কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোটে জেতানোর গান গেয়ে নয়)।

আসলে আমাদের দাবি করতে হবে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ। উন্নয়নের মডেলটাই পাল্টাতে হবে। কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের বদলে কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়নের ধাঁচা বানাতে হবে। শ্রমের সময় ৮ ঘণ্টা থেকেও কমিয়ে আনতে হবে এবং কড়া নজরদারিতে বাধ্যতামূলকভাবে লাগু করতে হবে। মানুষকে নিজের জন্য ব্যবহার করার সময় দিতে হবে। তবেই লোকসংস্কৃতির মরুপ্রান্তরে বারি সিঞ্চন সম্ভব হবে। ❐

ঋণ স্বীকার : *লোকশ্রুতি*-র নানা সংখ্যা

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

ইতিহাসবিমুখ এ সময়, বাংলা গান

বিপুল চক্রবর্তী

আমরা এক ইতিহাসবিমুখ সময়ে বাস করছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান— যা সবচেয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সবচেয়ে ইতিহাসনির্ভর, সবচেয়ে সমাজসম্পৃক্ত, সবচেয়ে শিকড়যুক্ত, সবচেয়ে দরদি মানবিক প্রক্রিয়া— সেই গান কী করে বাঁচবে এই পোড়া সময়ে!

আমরা তো বহু আগে এমনকি আকাশকেও জুড়ে নিয়েছি আমাদের ঘর-উঠোনের সঙ্গে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে খুঁজেছি আমাদের প্রিয়জনের মুখ। তাদের নামে নক্ষত্রের নাম রেখেছি স্বাতী, কৃত্তিকা বা অরুন্ধতী। চাঁদ আর সূর্যকে ডেকেছি চাঁদমামা আর সুয্যিমামা বলে। মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তির ওপর নতুন পৃথিবীর আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষায় আমরা তো কবে থেকেই আন্তর্জাতিক! সেক্সপিয়র, তলস্তয়, চ্যাপলিন, পিকাসো, রবসন— এঁরা তো কবেই আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' চিহ্ন নিয়েই বিশ্ববন্দিত।

বণিকসমাজের বিশ্বায়ন কিন্তু ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাদের শিকড়-ইতিহাসের রূপকথা। বণিকের এই বিশ্বায়ন কেড়ে নিচ্ছে আমাদের ভাষা। জন্ম নিচ্ছে এক বিদঘুটে সঙ্কর: 'ও মেরে মিষ্টি বিন্দু', 'ওপেন দ্য জানালা ইয়ার' বা 'হাই! আমি অভিরূপ'। গানের ছত্র তৈরি হচ্ছে: 'বৃষ্টি ঝম ঝম/ বাড়িতে নেই মম/ বাড়িতে নেই ড্যাড/ ভাল্লাগে না, কোথায় তুই/ ভাল্লাগে না, ধ্যাৎ/ কাঁদছে সেলফোন।' এরকম আরও আরও আরও। নতুন প্রজন্মের বাঙালি হারিয়ে ফেলছে তার ভাষার বিশিষ্টতাকে। তার ভাষাকে। ভাষাহীন মানুষ বোবা হয়ে যায়। গোঙানি ছাড়া তার আর কিছুই থাকে না। শুধু নদী বলা হলে নদীর কতটুকু বোঝা যায়? জল আর পাড়। জল আর পাড়। কিন্তু যখন উচ্চারিত হয় গঙ্গা বা পদ্মা বা মিসিসিপি বা ভোলগা, তখনই উঠে আসে তার চারপাশ। তার ভূগোল। তার ইতিহাস। তার মানে এই নয় যে আমি কোন বিশেষ ভূগোল বা ইতিহাসের দাসত্ব করতে বলছি। জীবন বহমান। জীবন ব্যাপ্ত। ছোট ছোট ঢেউ আর স্রোতেই যদি আমাদের দৃষ্টি আটকে থাকে তবে তার বিস্তৃত স্রোতস্বিনী রূপকে আমরা হারব। কিন্তু ঢেউ আর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা সামনের দিকে তাকাই তবে দেখব আমাদের জীবন তার আপন গরিমা নিয়ে মহাজীবনে মিশতে চলেছে, এবং অববাহিকায় নতুন পলিমাটিতে কত উর্বরা ক্ষেত্রের জন্ম হচ্ছে। আধুনিকতা এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে।

বাংলা গানে চখা-চখি, শুক-সারি থেকে শুরু করে লোকজীবনের যে অজস্র দৃশ্যকল্প ছড়িয়ে আছে, সুরের যে কাঠামো যে বৈশিষ্ট্য বহুকাল ধরে আমাদের শ্বাসে প্রশ্বাসে ধরা আছে আর তা রামপ্রসাদ, লালন, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আরও বহু বহু গুণীজনকে ছুঁয়ে ক্রমে ক্রমে যে আধুনিকতায় পৌঁছেছে তাকে নষ্ট করার সবরকমের প্রচেষ্টা চলছে আজ। তৈরি হচ্ছে বিশিষ্টতার চিহ্নহীন পংক্তি বা সুর। আবারও কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু অহেতুক অশ্লীল উচ্চারণে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না আমার এই নাতিদীর্ঘ লেখাটিকে। যা কিছু আজ ঘটছে তা-ই আধুনিক, এমনটা মোটেই নয়। পুরনো যুগ শেষ হয় তখনই যখন মানুষের অভিজ্ঞতায় নতুন বোধের উন্মেষ ঘটে— মানুষের জাগ্রত চৈতন্যের প্রসার ঘটে আর তারই ফলে সমাজ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সংস্কৃতির সাধনার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ববোধকে সচেতন রাখতে হয়। প্রাচীন পরম্পরা আত্মস্থ করেই প্রগতি। সংস্কৃতির সাধনার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ববোধকে সচেতন রাখতে হয় যে এখানে বহু যুগের বহু প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে আছে এবং তাকেই ধারণ করে আছে আধুনিক কাল।

জানালা দিয়ে তাকালে চতুর্দিকে অসংখ্য ফ্ল্যাটবাড়ি। সেইসব ফ্ল্যাটবাড়িতে আমাদেরই খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা থাকে। তারা গিটার হাতে গান করে, তালি বাজিয়ে নাচে। তাদের নাইক স্যু-র নীচে পড়ে আছে খাল-বিল-ডোবার মানুষ, মাঠ-প্রান্তরের মানুষ, যারা ফ্ল্যাট-সংস্কৃতির কাছে হেরে গিয়েছে। না কি তারা সব দূরে কোথাও চলে গিয়েছে! যদি কোথাও চলে গিয়ে থাকে তো বাঁচোয়া। তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলা ভাষার ইতিহাস। বাংলা গানের ইতিহাস।

বিশ্বায়নের বহু আগেই অবশ্য বণিকসমাজ বাংলা গানে তাদের ব্যবসায়ী থাবা বসিয়েছে। তারা জীবনের প্রতি গানের দায়বদ্ধতা কমিয়ে বাজারের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে তুলেছে। তবু, জীবনের অমোঘ টানেই কখনও মীরা দেববর্মন আর শচীন দেববর্মনের লেখা ও সুর করা গানে, কখনও প্রবীর মজুমদারের লেখা ও সুর করা গানে, কখনও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও সুর করা গানে ঢুকে পড়েছে দেশকাল। যেমন, 'তোর কে যাস রে ভাটি-গাঙ বাইয়া/ আমার ভাইধন রে কইও নায়র নিত বইলা/ তোরা কে যাস' বা 'বাংলা জনম দিলা আমারে/ তোমার পরাণ আমার পরাণ এক নাড়িতে বাঁধা রে/ মা-পুতের এই বাঁধন ছেঁড়ার সাধ্য কারও নাই/ সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল/ আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল' বা 'মাটিতে জন্ম নিলাম/ মাটি তাই রক্তে মিশেছে' বা 'তুমি রাতের সে নীরবতা দেখেছ কি/ শুনেছ কি মানুষের কান্না/ বাতাসে বাতাসে বাজে/ তুমি শুনেছ কি'।

আর আছে সমাজ-সচেতন সলিল চৌধুরীর গান, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান। আরও পরবর্তী সময়ে আছে সুমনের গান। যে গানে আছে দেশের জন্য ভাবনা, মানুষের জন্য ভাবনা আর

আমাদের বিশিষ্টতার চিহ্ন বাংলা ভাষার জন্য ভাবনা। আছে সংগ্রামের দৃপ্ত ঘোষণা 'গ্রাম-নগর-মাঠ-পাথার-বন্দরে তৈরি হও', আছে সাধারণ গৃহবধূর বেদনাও 'বউ কথা কও বলে পাখি আর ডাকিস না/ কী হবে কথা বলে, হৃদয়ের দুয়ার খুলে', আছে অভিশপ্ত দেশভাগের ব্যথা 'সোনা বন্ধু রে/ আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি', আছে হিরোশিমা ধ্বংসলীলারও সাক্ষ্য 'শঙ্খচিল', আছে দুঃসময়কে দেখতে পাওয়ার দূরদৃষ্টি 'যুগের হাওয়া অন্য মনে/জমি বেচার টাকা গোনে', আর আছে সেই দুঃসময়ে দাঁড়িয়েও প্রত্যয় 'হাল ছেড়ো না বন্ধু'।

এদের মেধাবী গানের পাশে পাশে অসংখ্য মাধবীও ফুটে আছে যা প্রকৃত অর্থে মূল্যবান গান, কিন্তু নানা কারণে বাণিজ্য হয়ে উঠতে পারেনি, বা বাণিজ্য হয়নি। সে জন্য হয়ত তা বহু-বহু মানুষের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। তবু বহু মানুষের কাছেই আজও সে গান খুবই আদরের। বিগত চার দশক ধরে আমি আমার সব ধরনের অপটুতা আর অসহায়তা নিয়ে তবু গানের সঙ্গে পথ হাঁটছি। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শহর আর গ্রামের রাস্তায়, রাস্তার পাশে বা খোলা মাঠের কোনও মঞ্চে এমন আশ্চর্য সব গান পেয়েছি যা এই সময়ের শ্রেষ্ঠ গানের গুচ্ছ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেশ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ সহ আরও কত যে কবির কবিতা সুরারোপিত হয়েছে এই সময়ে, আর কী উপযুক্ত সুষমা সেইসব সুরের ছাঁচে। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে বিনয় চক্রবর্তীর কত অনুপম অবয়বে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে। মনে পড়ছে অনুপ মুখোপাধ্যায়ের সুরে আরও একবার বেজে ওঠা কবি দীনেশ দাসকেও। এ রকম আরও আরও আরও। নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উঠে আসা আরও কত যে সফল গান 'আমি নাম-হারা ছোট্ট এক পাখি', কঙ্কন ভট্টাচার্যের এই গানটিকে আমি কতবার যে কত মাঠে বেজে উঠতে শুনেছি, বা নীতিশ রায়ের লেখা 'আমরা নওজোয়ান'-এর দৃপ্ত বেজে ওঠাকেই বা ভুলি কী করে! প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অনেক গানের কথাই মনে পড়ছে। সুরেশ বিশ্বাসের, মেঘনাদ দাশগুপ্তর, দিলীপ বাগচির, শুভেন্দু মাইতির।। সমরেশ বন্দোপাধ্যায়ের, সাগর চক্রবর্তীর, মৌসুমী ভৌমিকের বেশ কিছু গানও মনে পড়ছে এই অনুসঙ্গে। পল্লব কীর্তনিয়ার কিছু গানও। আর আছে বিভিন্ন দলের সৃষ্ট গান। অরণি, গণবিষাণ সহ অসংখ্য গানের দল গড়ে উঠেছে এই সময়ে। এ রকম কত কত যে গান আর এ গানের সঙ্গে কী অনায়াসে যুক্ত হয়েছে অদূর ইতিহাস থেকে লাফিয়ে নেমে আসা রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত বা গুরুদাস পালের গান— যুক্ত হয়েছে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রণেন রায়চৌধুরী বা কালী দাশগুপ্তর সংগৃহীত লোক-গানের অজস্র অরূপ রতন। আমার এ ছোটো লেখায় আমি সে আলোচনায় যেতে চাইছি না এখনি। এ বিষয়ে তো ভিন্নভাবে কখনও আমাকে লিখতেই হবে। এ প্রজন্মেও যে ব্যতিক্রম নেই, এমনও নয় মোটেই। এই তো, এ কথা বলতে না বলতেই ময়ূখ-মৈনাকের গানের কথা মনে এল, কালীকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের লেখা, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদারের সুর করা একটি গানের কথাও মনে এল। কিন্তু, আমি এখানে সে আলোচনায়ও যেতে চাইছি না।

বিশ্ববাজার আজ সবটুকুকেই মুছে দিতে চেষ্টা করছে। ফলে, কোন ভাবনা নেই কোন অন্বেষণ নেই। যা পাওয়া যাচ্ছে আসলে তা এক বিরাট ফাঁকি। প্রতিযোগিতার বাজারে একটু আধটু তোল্লা পেয়েই কেউ কেউ অবশ্য ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। লাটাই থেকে কেটে যাওয়া ঘুড়ির কোন দেশ থাকে না, আকাশও থাকে না। তা ওড়ার নামে কিছু সময় লাট খাওয়ার পর কোনও গাছের মগডালে বা কার্নিশে আটকে যায় আর আগামীর কোনও ঝড়ে বিচূর্ণ হয়।

গানকে (শিল্পকে) কেন যে কখনই পণ্য-সামগ্রী বলে মনে হয় না আমার। বাজারে রবি ঠাকুরের গানের ক্যাসেট বা সিডি বা ডিভিডি হাজারে হাজারে প্রতিদিন ঝাঁকায় ওঠে, গান ঝাঁকায় ওঠে না— তাঁর গান তখন দূরে কোথায়, দূরে দূরে। আইটেম বা প্রোডাকশন বিকোয়, গান বিকোয় না।

আমার মনে হয়, যেভাবে কোনও এক অখ্যাত লোককবির বাঁধা গান শতাব্দীর কুয়াশা ঠেলে ঠেলে আমাদের কাছে এসে মূর্ত হয়ে ওঠে আজও— যেভাবে রাজা বা জমিদারের শাসন অগ্রাহ্য করে অন্দরমহলের মেয়েদের গান ছড়িয়ে পড়ে মাঠে-প্রান্তরে, ঠিক সেইভাবেই এই সময়ের চলমান আর যুদ্ধরত বেশ কিছু গানও আমাদের সব সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গান পণ্য-সামগ্রী নয়। এই গান কোনও জাতীয় কোনও 'শো-কেস'-এর তোয়াক্কা করে না।

হৃদয় থেকে উৎসারিত আমাদের গেয়ে ওঠা এইসব গান তাদের শ্রোতা ও বন্ধু খুঁজে নিয়েছে— দূরে কোথাও, দূরে দূরে...❐

ভারতীয় ঐতিহ্যে শিশু

৫৪ পৃষ্ঠার পর

গ্রন্থপঞ্জী

দত্ত, চৈতালী। ২০০৮। *মনুসংহিতা*। কলকাতা ঃ নবপত্র প্রকাশন

দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ। ২০০৭। *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*। কলকাতা ঃ চিরায়ত প্রকাশন

বসু, রাজশেখর। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। *মহাভারত*। কলকাতা ঃ এম সি সরকার

সুর, অতুল। ১৪০২ বঙ্গাব্দ। *ভারতের বিবাধের ইতিহাস*। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স

স্তলেতভ, ভ.ন (সম্পাদিত)। ১৯৮৬। *ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে*। মস্কো ঃ প্রগতি প্রকাশন। অনু- বিজয় পাল

Bottomore, T.B. 1979. *Sociology*. New Delhi: Blackie & Son (India) Ltd

From, Erich. 2012. *Fear of Freedom*. London: Routledge

Kakar, Sudhir. 202. *The Inner World*. New Delhi: Oxford University Press

Srinivas, M.N. 1952. *Religion and Society among Coorgs of South India*. Oxford: Clarendon Press

Srinivas, M.N. 2001. *Social Change in Modern India*, New Delhi: Orient Longman

গল্প

শীতলক্ষ্যা থেকে চূর্ণী

দীপঙ্কর দাস

ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়ানো মাত্র ট্রেনের কামরার জানলায় মুখ রেখে উৎপল স্টেশনটার নামটা পড়তে চাইল। পারল না। হলুদের ওপর কালো কালি দিয়ে হিন্দী, ইংরেজি আর বাংলা হরফে স্টেশনের নাম লেখা ফলকটা কামরা থেকে অনেক পেছনে সরে গেছে। অগত্যা তার সিটের পাশে বসা ঝিমোতে থাকা যাত্রীটিকে মৃদু ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে উৎপল জিজ্ঞেস করল, মশাই, এটা কোন স্টেশন?

—পায়রাডাঙা। চোখ না খুলেও যাত্রীটি আশ্চর্য এক ক্ষমতার সাহায্যে স্টেশনের নামটা বলে দিল উৎপলকে।

—এর পরের স্টেশনই তো রাণাঘাট, তাই না!

—হ্যাঁ, যাত্রীটি একইভাবে ঝিমোতে ঝিমোতে জবাব দিল।

রবিবারের সকাল। সাতটা আটান্নর আপ কৃষ্ণনগর লোকাল, কাজের দিন শিয়ালদা থেকে ট্রেনটা ছাড়ার সময় যাত্রী বোঝাই হয়ে থাকে। বসার জায়গা পাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য পা রাখার জায়গা পাওয়াও রীতিমতো কঠিন হয়ে যায়। অধিকাংশই অফিস যাত্রী। শিয়ালদা থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে রওনা দিয়ে প্রথম যাত্রী নামায় ব্যারাকপুরে। তারপর কল্যাণী। রাণাঘাট। আর শেষ এবং প্রান্তিক স্টেশন জেলা সদর কৃষ্ণনগর। এই কয়েকটা স্থানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বহু অফিস আছে। এই লোকালটাকে নাকি যাত্রীরা 'অফিস প্যাসেঞ্জার' বলেই চেনে।

রবিবারের সকাল বলেই আজ 'অফিস প্যাসেঞ্জার' একেবারে খালি। ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা অনুপস্থিত। কিছু কিছু যাত্রী। অধিকাংশই ব্যক্তিগত কাজে বেরিয়েছে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। তাই শিয়ালদা থেকেই উৎপল আর তার বড়দি প্রতিমা কেবল বসার সিট-ই পায়নি, দুজনে পাশাপাশি না হলেও একটু তফাতে জানলার ধারের সিট পেয়েছিল। শিয়ালদা থেকে রাণাঘাট— লোকাল ট্রেনে অনেকটা সময়ের পথ। প্রায় পৌনে দু ঘণ্টার মতো। অতক্ষণ লোকাল ট্রেনের দুলুনি সইতে সইতে স্বাভাবিকভাবেই তন্দ্রার ভাব জেগে ওঠে। যাত্রীদের দোষ নেই।

ট্রেন একসময় রাণাঘাট স্টেশনের আউটার সিগনাল পেরিয়ে গেল। উৎপল সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত তুলে মাথার ওপরের বাঙ্ক থেকে তার এবং প্রতিমার ব্যাগ দুটো নামিয়ে প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, দিদি এবার ওঠ। রাণাঘাট এসে গেছে। এবার নামতে হবে।

প্রতিমা এবং উৎপল প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ট্রেনটা হুইসল দিয়ে কৃষ্ণনগরের দিকে রওনা হয়ে গেল। রাণাঘাট স্টেশনে বেশ কিছু যাত্রী নেমেছিল। আর মুষ্টিমেয় যাত্রী রইল। সামনের স্টেশনে নামবে। বাকিরা কৃষ্ণনগরে নেমে যাবে।

চলে যাওয়া ট্রেনটার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা উৎপলকে রীতিমতো চমকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে ছোট, আমরা রাণাঘাট স্টেশনে এলাম কেন রে?

—আজ তোর কি হয়েছে বলতো দিদি? উৎপল প্ল্যাটফর্ম থেকে স্টেশনের বাইরে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে পা চালাল। পাশে পাশে প্রতিমা। উৎপল তার কথা প্রসঙ্গে বলে চলল— কাল থেকে তুই কতবার যে তোর এক বান্ধবীর গুরুদেবের আশ্রমে পুজো দেওয়ার জন্য রাণাঘাট স্টেশনে আসার কথা বলেছিস তার কোনো হিসেব নেই। রাণাঘাট স্টেশনে এসে রিক্সা নিয়ে প্রথমে হাইওয়েতে যেতে হবে। সেখান থেকে অটো করে চূর্ণীর ব্রিজ পেরিয়ে হাবিবপুর। হাবিবপুরেই সেই বাবাজির আশ্রম। তোর বান্ধবীর গুরুজি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। প্রতিমা তার সাময়িক বিভ্রম কাটিয়ে উঠে বলল— মাধবীই বলেছিল তার গুরুদেবের কাছে একবার সব কথা খুলে বললে গুরুদেব নাকি তাঁর সংগ্রহ থেকে দুটো বাতাসা কলাপাতায় মুড়ে প্রসাদ হিসেবে দেবেন। আর সেই মন্ত্রপূত বাতাসা দুটো জলে গুলে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে খাইয়ে দিলে রোগী দুদিনেই সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই তো আজ সকাল সকাল তোকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি রাণাঘাট যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

—আজ নিয়ে কত দিন হলো রে দিদি? উৎপল সামান্য উদাস গলায় জিজ্ঞেস করল।

হঠাৎ করে এমন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শুনে যে কেউ স্বাভাবিক কৌতূহলে জিজ্ঞেস করত— কীসের কত দিনের কথা বলছিস উৎপল। কিন্তু যতই উদাসীন ভাবে উৎপল প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে থাক না কেন, প্রতিমার কাছে তার অর্থ ভীষণ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। তাই নিয়ে ও কিছু বলতে যাওয়ার আগেই উৎপলই নিজে হিসেব করতে শুরু করে দিল, এ মাসের ফোর্থ মানে মঙ্গলবার সকাল আটটায় মুম্বাইয়ে তোর ফোন পেলাম— মা-র ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। সেন্স নেই। ডাক্তার নাগের অ্যাডভাইস মতো হাসপাতালে অ্যাডমিট করাতে নিয়ে যাচ্ছি মাকে। তুই শিগগিরি চলে আয়। ফ্লাইটেই আয়। ভীষণ হেল্পলেস লাগছে রে ছোট। আসার সময় সঙ্গে যথেষ্ট টাকাপয়সা নিয়ে আসিস।

উৎপল আর প্রতিমা প্ল্যাটফর্ম থেকে স্টেশনবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। এ জাতীয় শহরতলির রেল স্টেশনগুলির ক্ষেত্রে যেমন হয়, রাণাঘাট স্টেশনেরও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সামনেই পাকা সড়ক। সড়কটা হয়তো যথেষ্ট চওড়া। কিন্তু সড়কের দু-পাশ

জুড়ে যে দোকান ঘরগুলি দাঁড়িয়ে আছে তারা দুপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে সড়কের গলা টিপে ধরার উপক্রম করেছে। যেটুকু অংশ এখনও খোলা আছে, সেটুকু জুড়েই চলেছে পথচারীদের মিছিল, সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ, রিক্সার প্যাঁক প্যাঁক ধ্বনি, অটোর পিঁপ পিঁপ আর্তনাদ। আর টেম্পো, ম্যাটাডোর পোড়া কেরোসিনের কালো ধোঁয়া উগরে দিতে দিতে ধেয়ে চলেছে।

প্রতিমা আর উৎপল রাস্তার একটা ধার ধরে এগুতে এগুতে একটা ছাতিম গাছের নীচে দাঁড়াল।

—আমি ফোর্থ লেট নাইটে পৌঁছলাম। আর আজ নাইনটিনথ্। তার মানে আজ নিয়ে পনেরো দিন চলছে। হিসেবটা সম্পূর্ণ করল উৎপল।

—সত্যি, ভাবতে কেমন অবাক লাগে। প্রতিমা প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল। আমি মাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সময় ভাবতেই পারিনি যে মা তোদের পৌঁছানোর মতো সময় দেবেন। তার আগেই হয়ত...। সেখানে পনেরো দিন ধরে রয়ে গেছেন। এটা আমাদের ভাগ্য বলা চলে, তাই না রে ছোট!

—এটা কি রকম থাকা দিদি! উৎপল বলল, সেই যে পনেরো দিন আগে মা আইসিইউতে ঢুকেছিলেন, তারপর থেকে তো আর হুঁশ নেই। আমাদের কাউকে চেনা তো দূরের কথা, তার ছেলেমেয়েরা যে সকলেই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটুকুও টের পেলেন না। কোনোরকমে ভেন্টিলেশনের দয়ায় প্রাণটা টিঁকে আছে। ব্রেন ডেথ ঘটে গেছে অনেক দিন। উৎপলের গলাটা একটু ধরে এসেছিল। গলা খাঁকারি দিল উৎপল। তারপর প্রতিমাকে তাড়া দিয়ে বলল, চল চল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বাজতে চলেছে। এবার রিকশায় উঠি।

—তার আগে এক ভাঁড় চা খেয়ে নিলে হতো। প্রতিমা বলল, শরীরটা চা-চা করছে।

—যা বাব্বা! বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে আমি যখন চা করলাম তখন তুই বললি কিনা, একদম নিরম্বু অনশনে তোর বান্ধবীর গুরুদেবের আশ্রমে মায়ের পুজো দিতে হবে রে। না হলে গুরুজির মন্ত্রপূত বাতাসা পাওয়া যাবে না। তাই চা খাওয়াও নিষেধ। আবার এখন বলছিস কিনা চা খাবি।

—শুধু চা তো। সঙ্গে টা-ফা না নিলেই হলো। প্রতিমা উৎপলের এক হাতের কনুই চেপে ধরে টানতে টানতে রিক্সা স্ট্যান্ড লাগোয়া একটা চা-বিস্কুটের দোকানের সামনে এসে বলল, দুভাঁড় চা দাও না ভাই। একটু তাড়া আছে।

এতক্ষণ মা কি আছেন? আছেন মানে হৃদ্‌যন্ত্রটা চালু আছে! প্রতিমা এবং উৎপল দুজনেই কাছেই সেল ফোন আছে। এই ফোন নম্বর দুটো হাসপাতালে দেওয়া আছে। তাছাড়া কাজল, পরিতোষ আর সুপ্রিয় সকলেই জানে উৎপল আর প্রতিমার নম্বর। তেমন কিছু ঘটলে এতক্ষণে খবর ঠিকই চলে আসত।

এমন চিন্তাটা উৎপলের মনে উদয় হওয়ার পেছনে একটা মস্ত বড়ো বাস্তবতা আছে। গতকালই ডাক্তার গুপ্ত উৎপলদের বলেছিলেন, ডোন্ট টেক আদারওয়াইজ। এটা আপনাদের ভাগ্য যে আপনাদের মা এতবড় ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাকের পরেও এখনও সারভাইভ করে আছেন। তবে এটাও ঠিক যে পেশেন্টের যে ট্রিটমেন্ট চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে, তার জন্য আইসিইউ-এর মতো কস্টলি বেডে রেখে টাকা খরচ করার কোনো মানে হয় না। জেনারেল ওয়ার্ডে রেখেই একই চিকিৎসা করা যাবে। আপনাদের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবেই একথা বলছি।

—আমরা নিজেরা একটু আলোচনা করে এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের আমাদের ডিসিশন জানাচ্ছি ডাক্তারবাবু— পরিতোষ বলেছিল। ডাক্তার গুপ্ত আইসিইউ থেকে রাউন্ডে চলে গেলেন।

আলোচনার বিশেষ কিছু ছিলই বা কি! প্রতিমা বাদে বাকি তিন ছেলে— পরিতোষ, সুপ্রিয় আর উৎপল এবং এক মেয়ে কাজল— চারজনই কলকাতার বাইরে থাকে। সেখানেই তাদের ঘর সংসার। রুজি রোজগারের কর্মস্থল। পরিতোষ থাকে শিলিগুড়ি, সেখানে পোস্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন দপ্তরের কর্মী। তার একটি মেয়ে। বউদির শরীর তেমন ভালো নয় যে তার ওপর সংসার এবং মেয়ের কাজকর্মের দায়িত্ব দিয়ে দিয়ে বেশিদিন থাকা যায়। সুপ্রিয়র কর্মস্থান বিলাসপুর। রেলের চাকুরে। থাকে রেল কোয়াটার্সে। সুপ্রিয়র দুই ছেলে। স্ত্রী কলকাতার মেয়ে নয়। রায়পুরে বাপের বাড়ি। সুপ্রিয়র পরে কাজল। ওর বিয়ে হয়েছে সেই কানপুরে। জামাই কানপুরের গান অ্যান্ড সেলস্ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। কাজলের এক ছেলে, এক মেয়ে। দুই সন্তানের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ছেড়ে রেখে ক'দিন আর মার জন্য কলকাতায় থাকা যায়! কাজলের পরে, অনেকটা ব্যবধানে উৎপল। সে থাকে সবচেয়ে দূরে। সেই মুম্বাই-এ। সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার। বছর দুই হলো উৎপলেরও বিয়ে হয়েছে। উৎপলের স্ত্রী লাবণীও ওখানে একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালের রিসেপশনিস্ট। এখনও বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে গত পনেরো দিনেই সকলে অস্থির হয়ে উঠেছে। কতদিন নিজের স্ত্রী-সন্তান-স্বামীকে দূর দূরান্তে ফেলে রেখে মার অসুস্থতাকে উপলক্ষ্য করে কলকাতায় পড়ে থাকা যায়! পনেরো দিন তো বহুদিন। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই তো ওরা সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এক সপ্তাহ পার করে সন্ধ্যায় উৎপলের সঙ্গে বড়দা পরিতোষ যখন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিল, তখনই বড়দা উৎপলকে জিজ্ঞেস করেছিল— হ্যাঁরে ছোট, তোর কী মনে হয় রে?

—কী মনে হবে? উৎপল বড়দার দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করেছিল।

—মানে, বলছিলাম যে এত বড় সেরিব্রাল অ্যাটাক, এমন

প্রোফাউন্ড হেমারেজ, অ্যাটাকের পর থেকেই পেশেন্ট একেবারে কোমায় চলে গেছে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে যাবতীয় চিকিৎসা করানোর পরেও কোনো রেসপন্স নেই। এমন পেশেন্ট কি আর বাঁচবে! বলতে বলতে পরিতোষ শুকনো জিভ দিয়ে ততোধিক শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়েছিল।

—মা তো বেঁচেই আছে। উৎপল বলেছিল।

—বাঁচা বলতে আমি সম্পূর্ণ সেরে ওঠার কথা বলছি। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার কথা বলছি। এতদূর বলে পরিতোষ তার দু হাতের তালু দুটোকে এমনভাবে বাতাসে দোলালো তা দেখে উৎপল পরিতোষের মনের ভেতর জমা হতাশার পরিমাণটাকে সহজেই বুঝে নিতে পাল।

—তুই তো জানিস ছোট, তোর বউদির শরীর ভালো না। তার ওপর সে আবার তেমন কাজকর্মে পটুও নয়। মেয়েটাও তো ছোটই। ওর পড়াশোনা, ওর স্নান-খাওয়া, স্কুল যাওয়া-আসা— এতসব সামলানো তোর বউদির পক্ষে একার হাতে সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম, এর মধ্যে মা যদি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন তাহলে...

কথা শেষ করার প্রয়োজন নেই। কারণ পরিতোষের মতোই সকলের মনের অবস্থা। সকলেই মায়ের সন্তান ঠিকই, তেমনি সকলেই আবার স্বামী কিংবা স্ত্রীও বটে। সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের জনক কিংবা জননীও। একমাত্র প্রতিমা ছাড়া বাকি চার পুত্রকন্যা আজ অনেক দিন আগে থেকেই মার সঙ্গ ছাড়া দূরদূরান্তে থাকে। হুট করে মাকে তেমন দেখতে আসা হয় না। নিজের সংসার সামলে, চাকরি-বাকরি রক্ষা করে কথায় কথায় ছুটিও পাওয়া যায় না। ফলে একটা গোটা সপ্তাহ ধরে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে মার সঙ্গলাভ আদৌ বাস্তবোচিত নয়। তার ওপর মা যখন প্রায় মৃতও বলা চলে। কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। যাকে ভেজিটেবল স্টেট বলা হয়, সেরকম। হার্টটা বন্ধ হলে তবে মেডিক্যাল ডেথ ঘোষণা করবে ডাক্তারবাবু। এক সপ্তাহের মাথাতেই যখন সকলের মনের অবস্থা এরকম চেহারা নিয়েছে, তখন দুই সপ্তাহের মাথায় সেই মন আর আলোচনা করার পর্যায়ে থাকতে পারে নি। পরিতোষও ডাক্তারবাবুর কাছে আইসিইউ থেকে মাকে জেনারেল বেডে শিফ্‌ট করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য একঘণ্টা সময় চেয়ে নিলেও, একঘণ্টা ধরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার কোনো রসদই খুঁজে পাচ্ছিল না।

—ডাক্তারবাবুই যখন বলছেন রোগীর আরোগ্যের কোনো সম্ভাবনা নেই, তাহলে আর মিছিমিছি— কাজল বলল।

—তাই ডাক্তারবাবুকে আমাদের মতামতটা জানিয়ে দে দাদা। তাছাড়া টাকাপয়সার দিকটাও তো ভাবতে হবে। এত দিনে সঙ্গের টাকাপয়সা তো ফুরিয়ে এসেছে। কত আর তোদের জামাইকে টাকা পাঠাতে বলা যায়! তার আয়ও তো অফুরন্ত নয়!

অত্যন্ত বাস্তব এবং সত্য ঘটনা সব। সকলেই অন্তর থেকেই প্রতিটি কথা উচ্চারণ করছে। এর মধ্যে এতটুকু আবেগ নেই। স্বার্থপরতাও নেই। এমন এক প্রেক্ষিতের সামনে দাঁড়িয়ে নিরাবরণ সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না।

—তুই কিছু বলবি না দিদি? উৎপলের দৃষ্টি গেল প্রতিমার মুখের দিকে। করিডোরের রেলিং ধরে প্রতিমা এমনভাবে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন সে মাকে নিয়ে এমন রূঢ় বাস্তবতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

—কী আর বলব বল! মা তো কেবল আমার একার নয় যে আমি যা বলব সেটাই মানতে হবে সবাইকে! মার ওপর আমার যতখানি অধিকার, তোদের কারোরই তার চেয়ে একচুল কম অধিকার নেই। তাছাড়া আমারও তো তেমন আর্থিক সংগতি নেই যে আমি একার হাতেই মার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সামাল দিতে পারব। তাই তোদের সকলের যা সিদ্ধান্ত, আমারও সেই সিদ্ধান্ত। প্রতিমার গলাটা হঠাৎ করে কেন জানি না ধরে এসেছিল। হয়তো আবেগে। হয়তো সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন্ড এই কর্পোরেট হাসপাতালের শীতে থাকতে থাকতে গলায় কিছু শ্লেষ্মা জমেছিল।

গতকালই মাকে আইসিইউ থেকে জেনারেল ওয়ার্ডে শিফ্‌ট করা হয়েছে। উৎপল না ভেবে পারল না এই মুহূর্তে মার থাকা না থাকার প্রসঙ্গটা। উৎপল ডাক্তার নয়। তার ওপর এমন ক্রিটিক্যাল পেশেন্টের আরোগ্য লাভ করা না করার মতো জটিল বিষয় সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। কেবল লোকমুখে শোনা কথাটাই জানে। বিশ্বাসও করে। মা তো এত দিনে ভেন্টিলেশনে ছিল। ভেন্টিলেশনে দীর্ঘদিন রাখার পরেও পেশেন্ট-এর যদি কোনো উন্নতি না হয়, তবে ভেন্টিলেশন দিয়ে যে পেশেন্টকে সচল রাখা হয়েছে, ভেন্টিলেশন সরিয়ে নিলে সেই পেশেন্টের অন্তিম শ্বাস বেরিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। মা ভেন্টিলেশন ছাড়া আর কতক্ষণ শ্বাস নেবেন? প্রতিমার বান্ধবীর গুরুদেবের প্রসাদী বাতাসা নিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে খাওয়ানোর অবসরটুকু পাবে তো প্রতিমা!

উৎপল নিজে কোনোদিন এমন সব তুকতাক, দৈবশক্তি, দেব-দেবতার প্রতি সামান্য দুর্বলতার প্রশ্রয় দেয়নি। বিশ্বাসও করেনি। তাই প্রতিমার অনুরোধের কথা শোনার পর শত অবিশ্বাস ও আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেবল প্রতিমার মনে মাকে নিয়ে গড়ে ওঠা শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করার জন্য গতকালই রাজি হয়েছে। মার জীবন ফুরিয়ে গেলে তাদের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে একা হয়ে যাবে বড়দি। উৎপল জানে বড়দি সেই আসন্ন একাকীত্বের আতঙ্কে মার আয়ুকে আরও একটু দীর্ঘ করার আশায় গুরুজির বাতাসা নিয়ে মাকে খাওয়ানোর মতো যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে উৎপল কেমন করে বড়দিকে ফেরায়!

বড়দা, সুপ্রিয়, কাজল এবং উৎপল সকলেই জানে আজ তারা যেখানে এসে দাঁড়াতে পেরেছে সেটা সম্ভব হয়েছে কেবল বড়দির জন্য। তাদের বাবা কোনকালেই তেমন রোজগেরে ছিলেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও তার মন্ত্রণালয়ের সামান্য সাব পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাও শেষের দিকে। তার ওপর চাকরি বজায় রাখতে এক সাবডিভিশন থেকে অন্য এক সাবডিভিশনে দফায় দফায় বদলি হতে হত। পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন নতুন শহরে সংসার পাতার জন্য খরচখরচাও কম হত না। তাও যদি বাবা তার চাকরি জীবনের পুরো সময়টা পূর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সেই তিনি হঠাৎ একদিন অফিসের মধ্যেই তীব্র হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই সব শেষ।

তখন উৎপলরা রাণাঘাটে থাকে। এই রাণাঘাট শহরেই বাবা তার সার্ভিস পিরিয়ডের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়— টানা আট বছর কাটিয়ে ছিলেন। তখন উৎপলের বছর সাতেক বয়স। ক্লাস টু-এর ছাত্র। তার ওপর কাজল। কাজলের ওপরে সুপ্রিয়। সুপ্রিয়র বড় পরিতোষ। আর প্রতিমা সকলের বড়দি। বয়স তখন আঠারো-উনিশ। নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

বাবার এমন অকস্মাৎ বিদায়ের পরে স্বাভাবিক কারণেই মা সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। সামান্য এক সাব পোস্টামাস্টারের মৃত্যুর পরে প্রাপ্য উইডো পেনশন দিয়ে বড়জোড় এক বিধবার নিজের জীবন চলতে পারে। পাঁচ-পাঁচটি পুত্রকন্যা সহ বিধবার বাঁচাটা প্রায় অলৌকিকতার পর্যায়ে পড়ে। হয়তো উৎপলদের কপালে সেই মর্মান্তিক বিপর্যয়ই ঘটত। যদি না বাবার কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার কারণে 'ডেথ ইন হার্নেস'-এর দৌলতে পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টেই এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর চাকরি পেয়ে যেত প্রতিমা। আর ভাগ্য বলতে হবে যে প্রতিমার পোস্টিং হলো কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির গড়িয়া অঞ্চলে, যেখানে একটা ছোট দু ঘরের বাড়ি করে রেখে গিয়েছিলেন বাবা। রাণাঘাটের পালা চুকিয়ে ওরা গড়িয়াবাসী হয়েছিল।

প্রতিমার করণিকের চাকরি আর মার উইডো পেনশনের কল্যাণে সংসারটা তরতর করে না হলেও লগি ঠেলার মতো এগিয়ে গেল। ভাইবোনদের পড়াশোনা শেষ হলো। যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি-বাকরিও শুরু করে দিল। দূর দূরান্তে চাকরিস্থল হওয়ার কারণে সবাই বাড়ি ছাড়তে শুরু করল। ফলে তাদের বিয়ে দেওয়াও জরুরি হয়ে পড়ল। প্রতিমা পিছিয়ে গেল না। তিন ভাই আর বোনকে বিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তবে এর মধ্যে কখন যে নিজের যৌবন বিসর্জন দিয়ে ফেলল, খেয়াল করল না।

রিকসা চলছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে চূর্ণী। তবে এদিকে এখন জনবসতি বেড়েছে অনেক। আরও ঘন হয়েছে ঘরবাড়ি। অধিকাংশই বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। তাই তারা আড়ালে ঠেলে দিয়েছে চুর্ণীকে। একে রবিবারের বেলা। এগারোটা ছুঁই ছুঁই ঘড়ির কাঁটা। তার ওপর জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি। রোদ যেন এখনই চরাচরের সব কিছু পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।

এই থাম, থাম ভাই। আমাদের এখানেই নামিয়ে দাও। হঠাৎ প্রতিমা রিক্সা চালককে রিক্সা থামাতে বলল। বলল, এতো সবে পোস্ট অফিস-ঘাট। হাইওয়ে এখনও অনেকটা পথ।

হোক। আমরা এখানেই নামব। হাইওয়ে যাব না। প্রতিমা তার ব্যাগটা হাতে নিয়ে রিক্সা থেকে নামতে নামতে বলল, নাম ছোট। আমরা আর যাব না। উৎপল সকাল থেকেই বড়দির মতিগতি দেখে এতটাই বিস্মিত হয়ে পড়েছে যে এখন আর কোনো প্রশ্ন করল না। নিঃশব্দে নেমে পড়ল। প্রতিমা রিক্সা চালককে পুরো ভাড়াটাই দিল। বলল, তুমি ফিরে যাও। রোদ বাড়ছে খুব।

—দেখ, দেখ উৎপল। ওই যে ওদিকে যে চারতলা ফ্ল্যাট বাড়িগুলি দেখেছিস, ওর ইস্ট ফেসিং ব্লকটার শেষ সীমার বাড়িটার চারতলায় ছিল বাবার কোয়ার্টার। ঘরের জানলা দিয়ে এদিকে তাকালে চূর্ণী নদীটাকে স্পষ্ট দেখা যেত। মা তো ছিলেন ওপার বাংলার মেয়ে। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় এপারে চলে এসেছিলেন। বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যেত শীতলক্ষ্যা নদী। ছোট বেলা থেকেই শীতলক্ষ্যার জলে ভেসে বেড়াতেন। বিয়ের পরে এপারে এসেছিলেন। বাবার সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। শীতলক্ষ্যার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। শেষমেষ এই রাণাঘাটে এসে খুঁজে পেয়েছিলেন কৈশোরের শীতলক্ষ্যাকে এই চুর্ণীর মধ্যে। কোয়ার্টারে পাইপ ওয়াটারের ব্যবস্থা থাকলেও মা স্নানের জন্য ঠিক চূর্ণীর ঘাটে— ঐ যে চূর্ণীর যে ঘাটটা দেখছিস, সেই ঘাটে চলে আসতেন। ছুটিছাটার দিনে, গ্রীষ্মের সময়, পুজোর লম্বা ভেকেশনের সময় রোজ দুপুরে আমিও মার পিছু ধরতাম। একদিন এই ভাবে কেমন করে যেন সাঁতারটাও শিখে ফেললাম। আমি মার সঙ্গে পাশাপাশি সাঁতার কেটে দুপুরের স্নান শেষ করতাম এক সময়। বাবার অকাল মৃত্যুর আগের দিনও মা ওই চূর্ণীতে সাঁতার কেটেছিলেন। স্নানও করেছিলেন।

প্রতিমা কথা বলতে বলতে কখন যেন চূর্ণীর পোস্ট অফিস ঘাটে এসে দাঁড়াল। পেছন পেছন উৎপলও। প্রতিমা যে দিনগুলির কথা বলছে সেই দিনগুলির কোন স্মৃতি তার মনে নেই। থাকবে কেমন করে? উৎপল তখন জন্মালেও তার স্মৃতি তখনও জন্মায়নি। ধরে রাখার প্রশ্ন নেই। পোস্ট অফিস বাড়িটা নাকি প্রধান পোস্ট অফিসের সঙ্গে মিশে গেছে। স্টাফ কোয়ার্টার্সগুলি অনেক দিন হলো কর্মীদের অভাবে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। কিছু কিছু বাড়ি

ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। এখানে নাকি নতুন মাইক্রোওয়েভ সাবস্টেশন বসবে। তবে কাজ এখনও শুরু হয়নি।

পোস্ট অফিস নেই। কর্মীরাও নেই। স্থানীয় বসতিটা উঠে গেছে। ফলে পোস্ট অফিস ঘাটটাও এখন বহুদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সংস্কারের অভাবে ঘাটের সিঁড়িগুলির ওপর সিমেন্ট বালির প্লাস্টার উঠে গিয়ে ক্ষয়া ইটগুলি দাঁত বেড় করে রেখেছে। ঘাটের দুদিকে আগাছার জঙ্গল। ভর দুপুরে এর মধ্যেই ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। চূর্ণীর জল এখন ঘাটের শেষ ধাপ পর্যন্ত সরে গেছে। ঘাটের গায়ে জলস্রোত আছড়ে পড়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলছে। প্রতিমা ঘাটের সিঁড়ির প্রথম ধাপে হাতের ব্যাগটা রেখে ব্যাগের চেন খুলে শাড়ি, সায়া, তোয়ালে, সাবান বের করল। তারপর ধাপ ভেঙে ভেঙে চূর্ণীর জলের দিকে এগিয়ে গেল।

—হ্যাঁরে দিদি, তুই এখানে স্নান করবি নাকি? উৎপল জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। করব বলেই তো রানাঘাট আসা। কাঁধ ফিরিয়ে ভাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল প্রতিমা।

—তাহলে তোর গুরুজির আশ্রমে যাওয়ার কী হবে? কখন যাবি?

—আচ্ছা, ছোট। তুই কী করে ভেবে বসলি যে তোর এই পোড় খাওয়া কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে আসা দিদিটা এমন সব সাধুবাবাদের তুক-তাকে বিশ্বাস করবে! প্রতিমা হাসল। বহুদিন হলো প্রতিমার মুখে এমন চপল হাসি দেখেনি কেউ।

—তাহলে আমাকে বললি কেন এমন সব কথা।

—মা তো বাঁচবেই না রে ছোট। দুচার দিনের অপেক্ষা। তাই কদিন ধরেই রানাঘাট এসে চূর্ণির জলে সাঁতার কেটে মাকে ছুঁতে চাইছিল মনটা। কিন্তু এই বয়সে এতদিন পরে একা আসতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তাই ওরকম একটা গল্প বানিয়ে তোকে শুনিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলাম। এভাবে মিথ্যে কথা বলে তোকে নিয়ে আসার জন্য তোর বড়দিদিটাকে ক্ষমা করে দিস ছোট। ক্ষমা করে দিস।

উৎপল সম্মোহিতের মতো ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল প্রতিমা, তাদের বড়দি, চূর্ণীর মাঝ বুকে জলতরঙ্গ তুলে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। তরঙ্গের সঙ্গে ছিটকে যাওয়া জলের বুদবুদিগুলিতে রোদ পড়ে রামধনু সৃষ্টি করেছে দিদির মুখে। কখনও বা মায়ের কৈশোর কালের দুষ্টুমি ভরা হাসি, কখনো বা যৌবন কালের নিমন্ত্রণ জানানো রহস্য, কখনো বা পড়ন্ত বেলার সূর্যাস্ত ফুটে উঠেছে। এভাবেই দিদি একসময় শীতলক্ষ্যার বুক ঠেলে চূর্ণীর জলে পৌঁছে গেছে। ঐ তো মা। এখন আর কিশোরী কিংবা যুবতী নন। এক বয়স্কা নারী। অসময়ে কাঁধের ওপর এসে পড়া একটা গোটা সংসারকে দাঁড় করিয়ে এখন পরম তৃপ্তিতে চূর্ণীর জলে সাঁতার কাটছে। ❐

পাঠকের কলমে

ওদের বেতন বাড়ে
আমাদের হাড়ে কাঁপন ধরে

মূল্য বৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি চলমান ধারা। ষাট-সত্তর-আশির দশকে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চলত। কে জি বোস, প্রভাত পালিতরা সেই আন্দোলন থেকে উঠে আসা নেতা।

মূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা চলত। তখনও কম আয়ের মানুষজনকে আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধির আঘাত সহ্য করতে হত। কৃষি উৎপাদন বাড়লে, বাজার নিম্নমুখী হলে কম আয়ের মানুষজন শাক সব্জি মাছ একটু ভালোভাবে কিনতে পারত।

বিশ্বায়নের (গাড়ি-বাড়ির অর্থনীতি, অর্থাৎ যত পারো তেল তোলো আর জ্বালাও উন্নয়নের নামে এবং দুনিয়াকে দূষিত করো) অর্থনীতিতে ঢুকে ষষ্ঠ পে-কমিশনের পর সরকারি সংস্থায় বিপুল পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। উচ্চ ও মধ্য আয়ের কর্মচারীদের ভোগক্ষমতার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। সাথে সাধারণভাবে অপচয়ও বাড়ে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ভোগ ক্ষমতার বৃদ্ধি শ্রীহীন শহর ও ঝাঁ-চকচকে আবাসন অঞ্চলের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে কৃষিজমি দখল ক'রে। ফলে কৃষি উৎপাদন নিম্নমুখী, দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব (আরও দূষণ) ঘটিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা চলছে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পে কমিশনের কালে সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের বেতন/আয়ে যে পার্থক্য থাকত এখন তা বহুগুণ বেড়ে গেছে।

যাদের উপার্জন সীমিত বা যারা অবসরের পর সঞ্চয়ের মাসিক সুদের উপর নির্ভরশীল (সুদ কমিয়ে তাদের আয়ে আঘাত করা শুরু হয়েছে)— এই মাত্রাছাড়া বৃদ্ধি তাদের হাড়ে কাঁপন ধরায়, ন্যূনতম ভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ আবারও কমল সেই আতঙ্কে।

শুধু জন-প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের জন্যই মূল্যবৃদ্ধিজনিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা? তাও এত উচ্চ হারে, উৎপাদনশীলতা ছাড়াই? বাকি জনগণ নাগরিক নয়? বেকার ভাতা, সমস্ত বৃদ্ধদের জন্য পেনশন, সমস্ত জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, সকলের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ পানীয় জল, ন্যূনতম আশ্রয়, সব হাতে কাজ— এগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য নয় কি? জনপ্রতিনিধিরা এ সব দেখবেন না? নিজেদের ভাতা ও সুযোগ সুবিধা বাড়ানো ও পেনশনের নিরাপত্তায় জনগণকে উপেক্ষিত রাখবেন? বেঁচে থাকার আকাশ পাতাল পার্থক্যকে সীমার মধ্যে রাখতে গণ আন্দোলন ও গণ জাগরণের ডাক দেবেন না রাষ্ট্রকে মানবিক ও সহৃদয় করে তুলতে? ❐

শঙ্কর নন্দী, শেওড়াফুলি

গল্প

নীলবর্ণ

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

আমাদের পাড়ায় একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। গাছ আছে আরও। তবে যে গাছটির কথা বলছি, সেটি অন্যদের চেয়ে একেবারেই আলাদা। গোড়া থেকে আগা অবধি সে চোখ টেনে নেয়। তাই আমরা সব্বাই কৃষ্ণচূড়া বলতে ঐ একটি গাছকেই বুঝি। আজ তারই নিচে আমাদের শোকসভা।

সম্প্রতি আমাদের পাড়ায় কেউ মারা যায়নি। না কোনো মানুষ, না কারও পোষা পশুপাখি। তবুও আমরা জমায়েত হয়েছি। আমাদের পাড়ায় কিছুদিন হল দুটি বিড়ালের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা একটি মারুতির ছাদে বসে আছে। জুলজুল করে দেখছে চারদিক। কচি বিড়াল। কৃষ্ণচূড়া থেকে খানিকটা দূরে রাখা এক চারাবটের নিচে বাতিল মারুতিটা। বিড়াল সেই গাড়ির ছাদে। নামলেই কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে।

আমাদের পাড়ায় হাজার কুকুর। একটিও বিড়াল নেই। আগে ছিল। দারুণ ভাবে ছিল। তখন আমরা তাদের দ্বারা চালিত ছিলাম। পরে কুকুরেরা পাড়ার দখল নেয়। ওদের মারধোর, হামলা চলে দিনভর। বিড়াল ক্রমে কমতে কমতে, শেষ। সেক্ষেত্রে এই দুটি বিড়াল কীভাবে এল, তা রহস্য। যখন সকলেই বলছে তারা কেউই বিড়াল দুটি আনেনি।

যেহেতু কুকুরের হাতে আইন, তাই তাদের কেউ ঘাঁটায় না। পাড়ায় কিছু পুরুষ-মহিলা আছে, যারা এদের পৃষ্ঠপোষক। কিছু অন্ধ ভক্ত রয়েছে। আমাদের অগ্রিম শোকসভা ওই বিড়ালদের জন্য, যারা কুকুর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে।

শেষবার একটি বিড়াল এসেছিল আমাদের পাড়ায়, সাত বছর আগে। কীভাবে যে একটি পূর্ণ বয়স্ক সাদা বিড়াল সেবার ঢুকে পড়ল, তা আজও রহস্য। সে একাই বীরদর্পে চ্যালঞ্জ জানিয়েছিল কুকুরের দলকে। আমাদের গোটা পাড়া ভেঙ্গে পড়েছিল সেই লড়াই দেখতে। কুকুরেরা যতবার ওর টুঁটি টিপে দূরে ছুঁড়ে দেয়, সে পালিয়ে না গিয়ে আবার লড়াইয়ের ময়দানে। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখি, যেন সে মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যু বরণ করতে এসেছে। মিনিট পনের পর অবশেষে সে হার মানে। অথবা তার আত্মহত্যার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়।

এতগুলি বছরের পর এই দুটি বিড়াল আমাদের পাড়ায়। ওরা কী করে ঢুকল, গাড়ির মাথায় উঠল, কেই বা তুলে দিল, আমাদের কাছে তা অজানা এখনও। ওদের কে খেতে দেয়? রুমাদি, বুড়োদা, সুধীন দত্তের কবিতা পড়া লোকটি (রোগা-লম্বা-সরু, সাদা-কালো পরিপাটি চুলের; যে একা থাকে, চোখে কালো রঙের মোটা ফ্রেমের চশমা, যে ভাড়া নিয়ে সদ্য এসেছে); এদের কুকুরপ্রীতির কথা সব্বাই জানে। ওরাই নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচা করে অসুস্থ কুকুরদের সেবা, ভেট দেয়। কিন্তু বিড়াল প্রীতির লোক চোখে পড়েনি। ভয়ে কেউ সে কথা প্রকাশ করেনি ঘুণাক্ষরেও। আর তাই এই বিড়ালদের আমরা সকলে মিলে একটি শোকপ্রস্তাব এনেছি। যা আসলে কুকুরদের খুশি করা।

দলে জীবিতর পাশাপাশি বেশ কিছু মৃত মানুষও। কিছুদিন আগে লিভার ক্যান্সারে মারা যাওয়া মোটাসোটা রুমাদিও হাজির। সে কুকুরদের পরম ভক্ত। বেপাড়ার কুকুরদের প্রবেশ ঠেকান, পাড়ার কুকুর-বাচ্চাদের মানুষ করা— হেন কাজ নেই যা রুমাদি করত না। ও নিজের ঘরের পথ কুকুরদের জন্য খুলে রাখত।

তখন রুমাদির পোষা বিড়াল হল জিনিয়া। পরে এই জিনির কতগুলি বাচ্চা হয়। একটি বাচ্চা কোন কারণে মারা গেছিল। ময়লা ফেলার লোক পান্না তাকে বাইরের মাঠে ফেলে দিয়ে আসে। সেই বিড়াল-দেহ খেয়ে দুটি কুকুর বাচ্চা মারা যায়। জিনিয়া আমাদের পাড়ার শেষ বিড়াল। তার বাচ্চারা মারা যেতেই বিড়ালদের পুনঃ পাড়া দখলের স্বপ্ন চুরমার।

এখন যদি কুকুরদের তাড়িয়ে পাড়ার দখল বিড়ালেরা নিয়ে নেয়, খারাপ কী। কুকুর আমার কোনো কাজে আসে না, বিড়ালও আসবে না। কিন্তু এই দুটি কচি বিড়াল কী করে এতবড়ো পাড়ার দখল নেবে, তা মাথায় আসে না।

তাহলে এই মাত্র দুটি বিড়াল এখানে এল কেন? কে আনল? কথাটা জীবিত মানুষরাই বা কেন, মৃতেরাও বুঝতে পারল না? তাই আমরা দু' দল একত্র হয়ে ঠিক করলাম, একটি শোক প্রস্তাব আনব। তাই আমরা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে। এখানেই এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রাগের বশে এক কুকুরকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেয়। পরের দিন সে নিজেই লাশ।

'কুকুররা এই বিড়ালদের কীভাবে হত্যা করতে পারে?'

কথাটা আমি ছুঁড়ে দিলাম। অমনি দলটার মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়ে গেল। জীবিত ও মৃত দু' দল মানুষ নানা ভাবে একথা আলোচনা করেও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। এই সময় একজন বলল, 'তবে আলোচনা শুরু হোক—'। কিন্তু তাতেও কোনো ফায়দা হল না। বরং এক মৃত মানুষ বলল, সে দেখেছে বিড়ালমরা মাঠে শেয়াল জমায়েত হতে।

শুনে সকলেই কমবেশি ক্ষিপ্ত।

হচ্ছিল বিড়াল-কুকুরের কথা, এর মধ্যে শিয়াল কেন?

সে বলল, 'এমন কি হতে পারে না যে, এটা শিয়ালদের চাল? তারা প্রকাশ্যে আসতে চাইছে না। তাই বিড়ালদের সামনে রেখে কাজ হাসিল করতে চাইছে। ওরা পিছন থেকে বুদ্ধি জোগাচ্ছে। আর কে না জানে শিয়ালদের বুদ্ধির কথা।'

সবাই চুপ।

জীবিতরা যেদিকে তাকাচ্ছিল, মৃতরাও। রুমাদি বলল, 'আমি কখনও শিয়াল দেখিনি জানিস, খোকন। থাকতুম রাজস্থানের এক ছোট শহরে। সেখানে শিয়াল ছিল না। বাবা মারা যেতে আমরা এই পাড়াতে বাড়ি কিনে চলে আসি। সেই সময় শুনেছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে এক শিয়ালকে পিটিয়ে মারা হয়েছে।

রুমাদির কথায় আবার জমায়েত মধ্যে গুঞ্জন।

এবার সকলে মিলে সিদ্ধান্ত, শিয়ালের বুদ্ধি পিছনে আছে বলেই বিড়ালদের এত সাহস। বিড়ালরা যে শিয়ালদের সাহায্য নিয়ে লড়াইতে নামতে পারছে, সেটা বোঝা গেল। কোনো এক ফাঁকে তারাই তবে বিড়াল গাড়ির মাথায় রেখে গেছে। তখন সেই পুরানো কথা ফিরে এল, কেন আমরা শোকপ্রস্তাব নিয়ে মেতে উঠলাম?

এই সময় একজন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'এতক্ষণ ধরে যে বিড়ালরা গাড়ির মাথায় বসে রয়েছে, আমরা এতজন রয়েছি, তা কি কুকুরেরা জানে না? ওরা কি সোর্স মারফৎ কোনো খবরই পাচ্ছে না?

এমন এক যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সবাই তার দিকে চোখ ফেরাল। করকরে আয়রন করা জামা প্যান্ট। টান টান চেহারা। সাদা ঝোলা দাড়ি। কিন্তু তার মুখ দেখা গেল না। অন্ধকারে ঢাকা। বুঝতে পারলাম না, সে কোন দলের, জীবিত না মৃত।

লোকটা পাড়ার বা বহিরাগত, কিন্তু সে যা বলেছে তা খাঁটি। কুকুররা সত্যি এখনও কোনো খবর পেল না। একটাও ঘেউ শুনলাম না। তবে কি কুকুরদেরই কোনো বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিড়াল এনেছে? যেভাবে বিড়ালেরা এখান থেকে একদিন বিতাড়িত হয়েছে, গুপ্ত হত্যা হয়েছে; তার বদলা নিতেই কি এই আগমন?

ব্যাপারটা ভাবার।

ওদিকে খবর আসতে থাকল, ফাঁকা মাঠে দাপাচ্ছে শিয়ালরা।

হচ্ছেটা কী! আমরা কি কেউ কোনো প্রতিবাদ করব না? কেবল মোমবাতি মিছিলেই আমাদের যাবতীয় কাজ শেষ? কুকুর-বিড়াল যদি নিত্য কামড়া-কামড়ি করে, আমরা বাস করব বা কী করে?

লোকটা ভিড় ঠেলে সামনে এল। ফুলহাতা জামায় ঢাকা দু' হাত দু' দিকে ছড়িয়ে দিল। বটের ঝুড়ির মতো তার অজস্র পাকানো মেরুন চুল পিঠ কাঁধে আছড়ে পড়ল। সেখানে যে কত চড়ুইয়ের বাসা, নাড়া পেয়ে তারা চুল ছেড়ে কিচকিচ আরম্ভ করল। তারা শূন্যে উড়ন্ত।

লোকটা বলল, 'ভাইসব, তোমরা কি সকলে দুটি বিড়ালই দেখেছ? আমি যে দেখছি ডজন খানেক বিড়াল!'

'ডজন খানেক? তা কী করে হয়?' বলে সকলে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। গাড়ির মাথায় বিড়াল; গাড়িটার নিচে বা ভেতরেও কিছু। কী করে?'

লোকটা বলল, 'ওরা আগে থেকেই ছিল; তোমাদের চোখের ভ্রম, দেখতে পাওনি।'

'তুমি কোনো জাদু করলে?'

রুমাদির আমাকে ফিসফিস, 'ব্যাপারটা কী, খোকন? এত বিড়াল ছিল? না। এল কোথা থেকে? এই লোকটি? আমাদের পাড়ায় থাকত? কই, এতদিন তো দেখিনি! কেউই চেনে না।'

'বিড়ালগুলো জিনির ছেলেপুলে?'

রুমাদি বলে, 'তা কেন; জিনির সব বাচ্চাকে কুকুররাই মেরে দিল। জিনি বিবাগী হয়ে গেল।'

তখন আমরা একজোট হয়ে সেই মুখ না দেখা লোকটাকে ধরার চেষ্টা করি। কারণ আমাদের মনে হয়েছে, বিড়ালদের আগমন ও সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার পিছনে এই লোকটির হাত আছে। ওকে ধরার জন্য আমরা প্রাজ্ঞদের মতামত নিই। এই লোকটা এখানের কেউ নয়। কুকুর-বিড়াল হামলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে এই লোকটাকে পাকড়াও করা খুব প্রয়োজন।

কিন্তু তাকে আমরা ধরতে পারি না। সে যে উড়ন্ত। সঙ্গে উড়ন্ত চড়ুই ও পোকামাকড়। সহস্র। তার পিছু পিছু আমরা বিড়ালমরা মাঠে। লোকটা উড়তে উড়তে, 'তোমরা আমাকে ধরতে পারছ না? হা হা হা, তোমরা সব কী বোকা!'

এই কথায় আমরা সকলেই রাগান্বিত। এ লোকটা কে, যে আমাদের কলোনির বাসিন্দা না হয়েও আমাদের বোকা বলে। আমরা তাই চিৎকার করে বলি, 'আমাদের বোকামো তুমি দেখলে কোথায়?'

'না দেখার কী আছে। তোমরা কি বিড়ালদের কথা বলতে দেখেছিলে? দেখনি। তাই জানতেও পারোনি ওরা জীবিত কিনা।'

'এরা মৃত?'

'না। ওরা আসলে পুতুল। বিড়াল-পুতুল। দেখতে হুবহু আসলের মতো। ওরা চোখ বোজে, ব্যাটারিতে মিয়াওঁ বলে। কিন্তু কথা বলে না।'

অমনি আমরা সকলে গুজগুজ ফুসফুস।

ওদিকে লোকটা মিটিমিটি হাসে।

আমি চুপি চুপি বলি, 'তুমি উড়তে পারো, রুমাদি?'

'না রে। এই লোকটা আলাদা জাতের মৃত অথবা জীবিত। দেখলি না, ওর চুলের ভেতর কত চড়ুই।'

বুড়োদা বলল, 'এই যে বিড়ালমরা পিছনের জলাভূমি ভরাট হচ্ছে, কুকুরদের ভয়ে তা নিয়ে আমরা চুপ। এদিকে ভরাট শেষ হলে বর্ষার জল আর বেরোতে পারবে না, জমতে পারবে না কোথাও। পাড়ায় জলস্রোত চলবে, সাপের উপদ্রব শুরু হবে। ডেঙ্গু হবে।'

শুনে রুমাদি মাথা চুলকে বলল, 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না বুঝলি। আমি কুকুর ভালোবাসি, আবার বিড়াল। তাই তো

বিড়ালদের যখন কুকুররা শেষ করে দিল, কিছু বলতে পারলাম না। 'সেটি এখন আর হবার নয় রুমাদি। এখন মধ্যপন্থা বাতিল। যেমন নোটা একদিন বাতিল হবে। তাই নতুন নিয়ম, যে থাকবে সে একাই। পালটা কেউ না।'

'আমি জীবিত, তখন অণিমার থেকে মাছের কানকো-ফুলকো আনতাম। প্রবীরের থেকে মুরগির গলা-পাকস্থলী। তাই দিয়ে রেশনের চাল কুকুরদের জন্য রেঁধে দিতাম। আমার প্রিয় কুকুর কালু। এতটুকু বয়স থেকে মানুষ করেছি। সে মারা যেতে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। জিনির সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। হয়ত মৃত্যুর পর তারা অন্যত্র চলে গিয়ে থাকবে। সেই হিসেবে শিয়ালদের সাপোর্ট করব। কারণ আমি কখনও শিয়াল দেখিনি।'

দলটার কলরব থেমে গেল।

যাকে কেউ কখনো দেখেনি, সে যে কেমন, কারও কোনো ধারণা ছিলনা। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি, 'তাই তো! শিয়ালদের কথা আমরা কেউ ভাবিনি। সে যে এমন একপেশে হবে, তা নাও হতে পারে। সে নিশ্চয় ভালো হবে।'

এই নিয়ে মহা হট্টগোল!

কয়েকজন বলল, 'তারা খারাপ, এটা কেন মেনে নেব? কুকুর-বিড়াল টানাপোড়েন আর নয়। ওরা যখন পাড়ার দখল নেয়, আমরা খারাপ হবে বলে কি ভেবেছিলাম? ভাবিনি। ওরা একটা সুযোগ চেয়েছিল, আমরা দিয়েছি। এখন আবার আমরা মুখ বদলাতে চাই।'

অন্যরা বলল, 'তোমরা কি সব পাগল? নীতিকথায় ওদের গল্প শোননি? নীতিকথায় ওদের গল্প এই জন্য, কারণ ওদের কোনো নীতি নেই। আমাদের কলোনিতে মিশ্র কালচার। ওরা এক কাঠামো চালু করতে চায়। ওরা যদি নীলবর্ণ, তোমাদেরও গায়ের রঙ নীল করে দেবে। তাদের লেজ যদি কাটা যায়, তোমাদের ল্যাজও অক্কা।'

আবার জোর হট্টগোল।

সেসময় সুধীন দত্তের কবিতা পড়া লোকটি তার সরু গলায় বলল, 'তোমরা যেভাবে স্লোগান দিচ্ছ, তাতে আব্রু আর থাকছে না।'

'কিন্তু আমরা তো কোনো স্লোগান দিইনি।'

জীবিত-মৃত আবার একদল।

'তোমরা কেউই স্লোগান দাওনি। আর সেটাই সবচেয়ে বড় স্লোগান।'

উড়ন্ত লোকটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু উড়ন্ত চড়ুই, পোকামাকড়। লোকটা কোথায় হাওয়া হয়ে গেল? আমাদের পাড়ায় কি কিছু চলছে? কুকুর-বিড়াল মারামারি? না, আর সহ্য নয়। এবার শিয়াল। ওদের ভেতরে আনতে হবে। এ মোমবাতির কাজ নয়। মাথা নিচু বাঁচা নয়; এবার মাথা উঁচু বাঁচা। এবার লড়াই করতে হবে। তাই নিয়ে সব্বাই একমত হল।

তাই চাঁদ সাক্ষী, আমরা শিয়ালদের স্তব শুরু করলাম।

একজন বলে, 'শিয়াল খুব ধূর্ত।'

মৃত একজন, 'শিয়াল খুব চালাক।'

রুমাদি বলে, 'ওরা খুব জোরে দৌড়য়।'

জীবিত ব্যক্তি, 'কুকুর-বিড়াল ওদের ডরায়।'

সুধীন দত্তের কবিতা পড়া লোকটি তার গলা যথা সম্ভব গম্ভীর করে, 'ওরা পণ্ডিত ব্যক্তি। দেশজ।'

স্তব।

স্তব।।

স্তব।।।

ক্রমে আমরা বুঝতে পারি, শিয়াল আসবে না। কারণ এখানে কোনো শিয়াল নেই। ছিল না। একটা প্রচার ছিল।

কিন্তু তাই বলে আমরা কি ফিরে যাব? না। কুকুর-বিড়ালরা জানে, আমরা শিয়ালদের খোঁজে এসেছি। তাদের না নিয়ে আমরা ফিরব না।

আর তাই এই নীল চাঁদের আলোয়, আমরাই নীলবর্ণ হয়ে উঠব।

সব্বাই। ❐

মিডিয়া কবলমুক্ত,
তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ

বই-চিত্র

কলেজস্ট্রিট, কফিহাউস কলকাতা-৭০০০৭৩

মুঠোফোন

৯৪৭৭৪৩৩৩৫২ / ৯৮৩০৮৪৭১৫৯

স্মরণ

প্রিয় মহাশ্বেতাদি, মারাং দাঈ

অমর মিত্র

মহাশ্বেতাদি আমাকে *অনীক* পত্রিকার সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৮০-র এক গ্রীষ্মদিনে তাঁর বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়িতে। 'দানপত্র' গল্পটি তখন আমি লিখেছি সদ্য। দীপঙ্করদাকে গল্পটি দিয়ে বললেন, পড়ে দ্যাখো। তারপর থেকে *অনীক*-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। দীর্ঘ তিরিশ-বত্রিশ বছর প্রতিটি পুজো সংখ্যায় আমি লিখেছি। মাঝে দু-এক বছর বাদ গেছে। দীপংকরদা চলে গেছেন। মহাশ্বেতাদি চলে গেলেন। বছর দুই-তিন *অনীক*-এ আমার লেখা থেমেছে। মহাশ্বেতাদিও অনেকদিন *অনীক*-এ লেখেননি। একটা সময় তো আসে যখন আর লেখা হয়ে ওঠে না। আর এ কথাও সত্য, পত্রিকায় নবীন প্রজন্ম যদি না যুক্ত হন, পত্রিকা নীরক্ত হয়ে যায়। নবীন লেখককে খুঁজে বের করা পত্রিকা সম্পাদকের কাজ। দীপংকরদা যখন আমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন, তখন আমায় তেমন কেউ চেনেন না। মহাশ্বেতাদি, *অনীক*-এর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা দীপংকর চক্রবর্তীকে বাদ দিয়ে বলা যায় না। আসলে মহাশ্বেতাদি আমাকে যেটি দিয়েছিলেন তা একজন লেখক কীভাবে জীবন দেখবেন, সেই আদলটা। একজন লেখক কীভাবে জীবন যাপন করবেন, সেই আদলও। মহাশ্বেতাদি এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই দুই লেখক আমাকে শিখিয়েছিলেন তাঁদের জীবন ও সাহিত্য দিয়ে। এ আমার পরম প্রাপ্তি। একজন লেখককে লিখতে হয় দাঁতে দাঁত চেপে, সমস্ত অপমান আর প্রত্যাখ্যানকে তুচ্ছ করে। আর অনেক কিছু ত্যাগ করেও। এই শিক্ষাই ছিল ওই দুই লেখকের কাছ থেকে আমার পাওয়া। শ্যামলদা অনেকদিন নেই, মহাশ্বেতাদি চলে গেলেন। নিঃস্ব তো হলামই।

মহাশ্বেতাদির সঙ্গে জীবনের অনেক দুর্লভ মুহূর্ত কাটিয়েছি। তখন তাঁর বাড়িতে কত লেখক যেতাম আমরা, জয়ন্ত জোয়ারদার, স্বপ্নময়, অসিত চক্রবর্তী, অসীম চক্রবর্তী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়। আরো অনেকজন। অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র থাকতেন বালুরঘাট। তাঁদের চিনি মহাশ্বেতাদির মাধ্যমেই। একটা কথা ভাবতে হবে, মহাশ্বেতাদি যে পত্রিকা *বর্তিকা* প্রকাশ করতেন তা বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হত। খুব সম্ভবত বহরমপুর ভ্রাতৃ সংঘের মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন মণীশ ঘটক। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের মহাশ্বেতাদির বাসস্থান থেকে নতুন চেহারায় বেরোতে থাকে। *বর্তিকা* একেবারেই অন্যরকম পত্রিকা। গ্রাম সমীক্ষা, ক্ষেত মজুর থেকে রিকশা চালক, শ্রমজীবী মানুষের লেখা, উচ্ছেদ হওয়া বর্গাদারের কাহিনী নিয়ে বের হতো *বর্তিকা*। আমি কিছু ফরম্যাট বানিয়েছিলাম গ্রাম সমীক্ষার, বর্গাদার সমীক্ষার। গ্রামে আমার কাজ ছিল। সুবিধে হয়েছিল। সেটেলমেন্ট-এ ভিলেজ নোট তৈরি হতো আমাদের চাকরির আরম্ভে। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা গল্পও লিখেছি *বর্তিকা*-য় একটি দুটি। জয়ন্ত জোয়ারদার তার ভুতনি দিয়ারা উপন্যাসটি লিখেছিল বর্তিকায়। মহাশ্বেতাদি নিজে কখনো বড়ো পত্রিকার লেখক ছিলেন না। সম্পাদকও ছিলেন না বড় পত্রিকার। ফলে আমাদের সকলের মেলামেশা ছিল নিঃস্বার্থ। এবং তার ভিতরে লুকিয়ে ছিল তাঁর লেখার প্রতি আমাদের অনন্ত শ্রদ্ধা। আমরা একটা দিশা খুঁজে পেয়েছিলাম। জীবন এবং সাহিত্য কেমন হাত ধরাধরি করে চলে তা মহাশ্বেতাদিকে দেখে আমি বুঝেছিলাম। তাঁর 'বিছন' গল্প যেবার *অনীক*-এ প্রকাশিত হয়, আমি *অনীক*-এ আমার প্রথম গল্প দানপত্রও লিখি ওই সংখ্যায়। মহাশ্বেতাদি আমাদের বুঝিয়েছিলেন *অনীক, অনুষ্টুপ, বারোমাস, প্রমা, পরিচয়, কবিপত্র, লাল নক্ষত্র* পত্রিকায় লিখে লেখক হওয়া যায়। লেখা এক দীর্ঘদিনের সংগ্রামই। এখন এই কথা কি কেউ বিশ্বাস করেন? নবীন লেখকরা? করেন না। সকলে কিছু পেতেই ক্ষমতাবান সম্পাদকের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। তাতে কোনো অসুবিধে নেই, লিখুন, কিন্তু তার দিকে চেয়ে বসে থাকা কিন্তু আত্মহননের সমান। এই যে প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা, তা লেখককে শেষ করে দেয়। আমি তা দেখেছি। মহাশ্বেতাদির শিক্ষায় আমি *সত্যযুগ, বারোমাস, অনীক* পত্রিকায় উপন্যাস লিখেছি। আবার বড় প্রতিষ্ঠান লিখতে বললে সম্মানিত হয়েই লিখেছি। মহাশ্বেতাদি *অনীক*-এও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে মিশে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম। আর জেনেছিলাম মানুষই লেখার উৎস। মানুষের কাছেই যেতে হবে ক্রমাগত। আমাকে তিনি ভেরিয়ার এলুইনের বই দিয়েছিলেন পড়ার জন্য। হাসান আজিজুল হকের দুটি বই পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে। নতুন লেখকের ভাল বই পেলেই পড়তে দিতেন। আমার মনে আছে ১৯৮৩-তে অসুস্থ হয়ে মেডিকেল কলেজে আমি ভর্তি। বগলে ছাতা আর জ্যালজেলে বিবর্ণ একটি শাড়ি পরে মহাশ্বেতাদি হাতে তাঁর নতুন বই নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত। অসুখ ওতেই সেরে গিয়েছিল বুঝি। ১৯৭৯-তে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার রোহিনী গ্রামে প্রথম আদিবাসী সম্মেলন। আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ তার নাম। সাংবাদিক নির্মল ঘোষ, কবি সব্যসাচী দেব, হিন্দি কবি পবন কুমার, হিন্দি পত্রিকার অরুণ শ্রীবাস্তব... অনেকজন ট্রেন বাস করে সুবর্ণরেখার তীরে সেই গ্রামে উপস্থিত। আমার কর্মস্থল ছিল ওই জায়গা। *অরণ্যের অধিকার* পড়েছি আমি

তখন। আমার কাছে জমির কাগজ বুঝতে আসা মুন্ডা উপজাতির একজন, নাম মনে আছে স্পষ্ট, জ্যাকব মুন্ডা। জ্যাকব আমার কাছে শোনে বীরসা মুন্ডার কাহিনি যা *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে লেখা হয়েছিল। সে আমার কাছ থেকে অরণ্যের অধিকার নিয়ে যায়। পড়ে। তারপর বই আর ফেরত পাই না। একের পর একজন পড়ছে। আমার কাছে এসে বলে, তার বাবা পড়ছে। বলে, তার বন্ধু রাবণ পড়ছে। একদিন বুড়ো বাবাকে নিয়ে এল সিঁদুরগৌরার জ্যাকব। বুড়ো বাবার চোখে জল, আমার হাত ধরে বললেন, ধরতি আবা বীরসার এই জীবন কাহিনীর কিছুই জানতেন না তিনি। মহাশ্বেতাদিদির কাছ থেকে আরো শুনতে চান। সেই ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাঁকরাইল থানার মুন্ডা সাঁওতাল ভূমিজরাই প্রথম আমাকে বলল, একটা সভা করবে মহাশ্বেতাদিকে নিয়ে। তাদের ছিল অনেক বঞ্চনা অনেক অভিযোগ। আমি কলকাতার ঠিকানা দিলাম, খুব সম্ভবত, ১৮-এ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, স্যুট নম্বর ৫, এমনিই ছিল। স্মৃতি থেকে লিখলাম। ভুল হতে পারে। বছর ৩৫ আগের কথা। তারা চিঠি লিখল মহাশ্বেতাদিকে। আমি কলকাতায় এসে সব কথা শোনালাম। তিনি বললেন যাবেন। আমি ইতিমধ্যে বদলি হয়ে দীঘার সমুদ্রতীরে। সেখান থেকেই চিঠিতে যোগাযোগ থাকল জ্যাকব মুণ্ডার সঙ্গে। এরপরেই আদিম জাতি ঐক্য পরিষদের প্রথম সভা এক বর্ষার দিনে। জুলাই মাস হবে। গ্রাম রোহিনী। সুবর্ণরেখা আর ডুলং নদী মিশেছে সেখানে। বর্ষায় তিনি তো চলে গেলেন। মনে আছে সমস্ত রাত ধরে সভা। পরদিন সকালে মারাং দাঈ মহাশ্বেতাদি ডুলঙে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে স্নান করলেন। আমরা সকলেই মনে হয় নদীতে সাঁতরে ছিলাম। ভরা বর্ষার নদী উত্তাল। পশ্চিমে বৃষ্টি হলে ডুলং ভাসে। সব কথাই এখন অলীক মনে হয়। আমরা সকলে চাষিদের মাথায় দেওয়ার তালপাতার টোকা কিনেছিলাম হাট থেকে। সেই টোকা মাথায় কলকাতায় ফিরেছিলাম। মহাশ্বেতাদি তখন সৃজনের চূড়ান্ত জায়গায়। অপারেশন বসাই টুডু লিখেছিলেন ১৯৭৫-এ। হাজার চুরাশির মা ১৯৭২-এ। তারপর স্তনদায়িনী, জগমোহনের মৃত্যু, বেহুলা, বিছন, জল, শিশু... লিখেই চলেছিলেন। আর গড়ে তুলেছেন খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি পুরুলিয়ায়। কলকাতায় বসে শীতের পোশাক সংগ্রহ করেন, পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করেন, পাঠিয়ে দেন দুঃস্থ মানুষের কাছে। গজদন্ত মিনারে বসা লেখক তিনি নন। মানুষের পাশে সমস্ত সময় ছিলেন। আমি তাঁর অনেক সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কিন্তু সংগ্রহে নেই। শেষ বড়ো সাক্ষাৎকার ছিল কলকাতা বইমেলার পত্রিকায়। ইন্ডিয়ান লিটারেচারে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আমি ও কবি সব্যসাচী দেব। কত মিশেছি। যখন বড়ো পত্রিকায় লিখেছি উল্লাস প্রকাশ করেছেন। চিঠি দিয়েছেন শালতোড়া বাসের সময়। পরে ফোন এলে অনেক রাতে তাঁর ডাক পেতাম। রাত বারোটায় আমার উপন্যাস, 'নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান' (*অনীক*-এ প্রকাশিত হয়েছিল এক পুজোয়) পড়ে ফোন করেছেন। হ্যাঁ, শীতের রাত ছিল তা। আর জমির আইন নিয়ে কোনো ধন্ধ মনে এলেই ফোন করতেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় অধিগ্রহণ নিয়ে কথা হতো, আইন জেনে নিতেন। মহাশ্বেতাদির বাসস্থান ছিল ভারতবর্ষ। সেখানে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ আসতেন। তিনিই মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে আবিষ্কার করেন। মনোরঞ্জন এখন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। আর আমরা সত্তর দশকের লেখকরা তাঁর কাছে গিয়েছি তাঁর আদর্শে প্রাণিত হয়ে। কিন্তু সকলেই লিখেছেন নিজের মতো করে। লেখক কী লিখবেন, তা মহাশ্বেতা শ্যামলের কাছে শিখেছি। আর সেই শেখাই বড় পাওনা। এখনো তাঁদের পড়ি। মহাশ্বেতাদি চলে গেলেন, সজীব এক শালতরুর পতন হলো। বনভূমি নিঃস্ব হলো। হ্যাঁ, দিদি, আপনার কাছেই তো কতবার শুনেছি, আপনার লেখায় তো কতবার উচ্চারিত হয়েছে, উলগুলানের শেষ নাই। মানুষের সংগ্রাম ফুরায় না। জানি, বীরসা আর চোট্টি মুন্ডা বনের অধিকার বুঝে নিতেই এসেছিল, কিন্তু এখনো তারা এসেই যাচ্ছে। সেই আসার বিরাম নেই। বিরাম হবে কেন, মানুষ যে সেই কত বছর ধরে যুদ্ধ করতে করতে টের পেয়েছে যুদ্ধ ফুরোয় না। মারাং দাঈ মহাশ্বেতা বলেছে, এক যুদ্ধ যেতে যেতে আর এক যুদ্ধ এসে যায়। প্রিয় মহাশ্বেতাদি, জগমোহন নামের হাতিটি তো এখনো পার হয়ে যাচ্ছে ক্ষুধার্ত পৃথিবী। তার মৃত্যু এখনো হয়ে যাচ্ছে, কত প্রলম্বিত সেই মৃত্যু, তার বুঝি আরম্ভ নেই, শেষও নেই। ক্ষুধার্ত মানুষ পার হয়েই যাচ্ছে মহাপ্রান্তর। ভয়ানক রৌদ্র, কঠিন মাটি, খিদেয় খিদেয় না খেয়ে খেয়ে মানুষগুলো বাড়েনি, অদ্ভুত সব শিশু চাল লুট করে পালায়। পালিয়ে যাচ্ছেই। প্রিয় মহাশ্বেতাদি, দ্রৌপদী মেঝেনকে কাপড় পরাবার কেউ নেই, না এখনো নেই। তার এজাহার নিয়েই যাচ্ছে ছোট কত্তা থেকে বড় কত্তা। বস্ত্রহীন দ্রৌপদী আমার দেশ মাতৃকাই হয়ে উঠেছিল মণিপুরে। ৭১-এর দেশ, ৭৭-এর দেশ আর বৃষ্টিহীন মাঠঘাট, নিদয়া শ্রাবণে কোনো তফাৎ হয়নি। এতটা দিন গেল, সেই ভারতবর্ষ আর এই ভারতবর্ষকে রেখে যে আপনি চলে গেলেন, মারাং দাঈ, ছত্তিশগড়ে, জঙ্গলে জঙ্গলে মানুষ যে হাঁটু ভেঙে বসে আছে। জমি গেল, হাল গেল, ঘরের মেয়ে দ্রৌপদী মেঝেনকে বনের ভিতরে ধরেছে নিরাপত্তা রক্ষী, সকলকে রেখে চলে গেলেন। অথচ সেই বীরসা মুন্ডার দেশে, সাঁওতাল পরগণায়, সিংভূমের জঙ্গলে, ডুলং আর সুবর্ণরেখা কুলে, পথের ধারে বসে আছে তো রাবণ সোরেন, জ্যাকব মুণ্ডা কিংবা দ্রৌপদী মেঝেন, উৎসব নাইয়া। কতদিন ধরে বসে আছে শালবনের ধারে, হুড়ি, পাহাড় টিলার নিচে। স্টেশনের ধারে, বাবুবাড়ির দুয়ারে ভাতের জন্য। বসাইয়ের মতো ফিরে আসুন মহাশ্বেতাদি। যুদ্ধ যে ফুরোয়নি। ফুরোয় না। ❐

স্মরণ

মহাশ্বেতা— এক অনন্য বিরল সাহিত্যকর্মী

নীলকণ্ঠ সেন

কথামুখ

এক কথাকার, সক্রিয় কর্মী, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সচেতন সমাজকর্মী, মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণীর যাপনচিত্র এবং লেখনীর অনুভবকে আমরা ফিরে দেখার চেষ্টা করব। তিনি মহাশ্বেতা, কখনও ভট্টাচার্য, কখনও ঘটক, কখনও নামের পরে দেবী। নামের পরে দেবী গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মা-র থেকে। মহাশ্বেতা নামের আভিধানিক অর্থ সরস্বতী। সে হাতে বীণা। মহাশ্বেতার হাতে কলম ঝনঝনিয়ে উঠেছে। এর অনেকটাই তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আবহ থেকেই গড়ে ওঠে।

পারিবারিক সূত্র ও জীবন

বাবা মণীশ ঘটক। যুবনাশ্ব ছদ্মনামে লিখতেন। মা ছিলেন সমাজকর্মী ধরিত্রী দেবী। প্রায় সমবয়সী কাকা বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক। বড় মামা ইংরেজি ইপিডবলিউ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শচীন চৌধুরী। অন্য মামা বিশিষ্ট ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী। মহাশ্বেতার জন্ম ১৯২৬ সালে ঢাকায়। পড়াশোনা প্রথমে শান্তিনিকেতনের পাঠভবন। পরে বেলতলা গার্লস স্কুল। পরবর্তীতে আবার বিশ্বভারতী। ১৯৪৬ সালে সেখান থেকে ইংরেজিতে স্নাতক। '৪৩-এর মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী। সঙ্গী তৃপ্তি মিত্র। '৪৬-এর পর আইপিটিএ ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। ১৯৪৭-এ বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ। আর্থিক স্বচ্ছলতা থেকে সাংসারিক জীবনে দারিদ্র্যের কঠিন অভিজ্ঞতা। ১৯৪৮ সালে একমাত্র পুত্র নবারুণের জন্ম। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারি পদে চাকুরি। সে চাকরি চলে যায় বিজনবাবু কমিউনিস্ট এই অভিযোগ। শোনা যায়, সংসারের প্রয়োজনে কাপড়কাচার সাবানও বিক্রি করেছেন। পরে সাংসারিক যৌথ জীবনে বিচ্ছেদ। ১৯৬৪-তে কিছুদিন বিজয়গড় কলেজে স্বল্প বেতনে চাকরি।

কলমের আশ্চর্য এক মাত্রাজ্ঞান

মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ১৯৫৬ সালে প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁসীর রানী'। এ লেখাটি গড়েই ওঠে নানা প্রচলিত উপাখ্যান ভাবনা আর মতামতের ভিত্তিতে। দেশ যাকে এক ডাকে চেনে সেই কিংবদন্তী যোদ্ধার এক ইতিহাস। ১৯৬৬ সালে লেখা 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু।" প্রান্তিক, আক্রান্ত এক জনগোষ্ঠীর কাহিনী। শুরুর সময়েই লেখা হয়ে গেছে ''অমৃত সঞ্চয়'' ও ''আঁধার মানিক''। মহাশ্বেতা নিজেই উল্লেখ করেছেন 'অমৃত সঞ্চয়' উপন্যাসে ''সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে ছিল ঋণরিক্ত, দারিদ্র্য পীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন।" তেমনই বলেছেন 'আঁধার মানিক' নিয়ে: ''১৭৪০ থেকে বারবার মারাঠা বা বর্গি হানা না ঘটলে বাংলার রাজনীতি এত প্রভাবিত হ'ত না। বাংলা থেকে দিকে দিকে এত মানুষের পলায়ন ঘটত না।"

১৯৭৪ সালে *উল্টোরথ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ''হাজার চুরাশির মা", যার নায়ক ব্রতী। উত্তাল সত্তরের মধ্যবিত্ত জীবন তথা নাগরিক রাজনীতি বিষয়ক লেখা। ব্রতীর মা এখানে যেন হাজার ব্রতীর মা রূপে অবতীর্ণ হন। লেখাটি খানিকটা রিপোর্টাজ-ধর্মী। প্রথাগত অর্থে উপন্যাস হিসাবে প্রথম শ্রেণীর হয়ত নয়, কিন্তু সময়ের এক আবেগপূর্ণ দলিল হিসাবে লেখাটি মানুষের মনকে স্পর্শ না করে পারে না। এখানেই ধরা পড়ে যে সেই উত্তাল সময় গোটা সমাজের শেকড় ধরে টান দিয়েছিল। ফলে মনে পড়ে যায়, 'ময়দান ভারী হয়ে নামে কুয়াশা, ভারী বুটের শব্দ আর দরজায় কড়া নাড়া, অবনী বাড়ী আছো?" কিংবা ''এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না"। মনে পড়ে যায় বারাসত-বরানগর,কাশীপুর, বারুইপুর, কোন্নগর-এর নারকীয় ঘটনার কথা।

১৯৭৭ সালে লেখা উপন্যাস ''অরণ্যের অধিকার"। যার বিষয় ছিল এক লোককথার পর্ব থেকে পর্বান্তর। বিস্তারিত ও বিশদে এবং স্বকীয় দক্ষতায় পাঠককে উপহার দেন প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া মুন্ডা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের কাহিনী। তাঁর লেখার মাধ্যমেই আধুনিক পাঠকের সঙ্গে ওই সব অপরিচিত প্রান্তিকদের ইতিহাসের পরিচয় ঘটে। ১৯৮০ তে লেখেন 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর'। এ উপন্যাসেও সেই মুন্ডা সম্প্রদায়ের জীবন ও যন্ত্রণার কাহিনী। ১৯৮১-তে 'শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা'। কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা মহাশ্বেতার আর এক উপন্যাস 'অপারেশন? বসাই টুডু'। আন্দোলনের মূল নেতা বসাই টুডু। যাকে রাষ্ট্র যে কোনো মূল্যে খুঁজে পেতে চায়। তাই তো চিরুণি তল্লাশি, অভিযান, নির্যাতন। মহাশ্বেতা নিজে এ লেখাটিকে তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন 'অগ্নিগর্ভ', 'ইটের পর ইট' 'শাল গিরার ডাকে' ইত্যাদি। উপন্যাস লিখেছেন দেড়শোর কাছাকাছি। আর এ সবই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। এক অন্য দৃষ্টিতে দেখা। এর পেছনে এক মূল্যবোধ কাজ করেছিল। সেটা গড়ে উঠেছিল প্রথমে তাঁর বাবা, মা, কাকা, মামাদের থেকে। পরে বিজনবাবু ও তদানীন্তন আইপিটিএ-এর প্রভাবে।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, ''সাহিত্যিক হিসেবে বলতে পারি ছ'সাতখানা বই লিখেছি সারাজীবনে। যেমন 'বায়োস্কোপের বাক্স', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু', 'চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর', 'অপারেশন? বসাই টুডু',

'টেরোড্যাকটিল', 'পূরণ সহায় ও পিরথা', 'জগমোহনের মৃত্যু', 'মাস্টার সাব' ইত্যাদি। আর শুরুর দিকে লেখা 'আঁধার মানিক' ও 'অমৃত সঞ্চয়'।"

মহাশ্বেতা প্রায় সাড়ে তিনশোর মতো ছোট গল্প লিখেছেন। ১৯৭৮ সালে *পরিচয়* পত্রিকায় উৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'দ্রৌপদী' গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রও দ্রৌপদী। দ্রৌপদী মেঝেন। বাংলার কোনো এক গ্রামের মেয়ে। হতে পারে মেদিনীপুর। তাঁর স্বামী এক রাজনৈতিক দলের কর্মী এই অপরাধে স্বামীকে না পেয়ে পুলিশ দ্রৌপদীকেই তুলে নিয়ে যায়। এমন ঘটনা শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও ঘটে, ঘটে চলেছে। দ্রৌপদী জেলখানায় বারংবার অত্যাচারিত হতে হতে শেষে অত্যাচারী সিপাহী সান্ত্রীদের সামনে তার নগ্ন, ক্ষত-বিক্ষত, ধর্ষিতা শরীরটাকে মেলে ধরে। নিজেকে বসনহীন করে বস্ত্রটা সেই সব সেপাই সান্ত্রীদের মুখে ছুঁড়ে দেয় আর যেন বলে ওঠে, এ আমার লজ্জা নয়, তোদের লজ্জা।

'বায়েন' গল্পে ডাইন অপবাদ পাওয়া কেন্দ্রীয় চরিত্র চণ্ডিদাসী সন্তানকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই ব্যাকুলতাই সন্দেহের চোখে দেখে তার স্বামী। আজও গ্রামে গ্রামে ডাইন অপবাদ দিয়ে অত্যাচার চলে এ দেশে। তাই এ গল্পও সমসাময়িক বাস্তবতার গল্প। 'স্তনদায়িনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদা রুগ্ন স্বামী আর তার সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিতে বারবার গর্ভধারণ করে। আর তারই বুকের দুধে মানুষ হয় বড়লোকের সন্তানেরা। যদিও মৃত্যুশয্যায় যশোদা পাশে পায়না নিজের সন্তানদের, বা দুধ-সন্তানদের।

'রুদালী' গল্পের শনিচরির অশ্রুহীন জল আসে তার মায়ের মৃত্যু সংবাদে। এটাও বাস্তব জীবন। শনিচরি একা নয়, ওর মতো অজস্র শনিচরি আছে। গাঁয়ের অবস্থাপন্নদের পরিবারে কারো মৃত্যু ঘটলে তাদের ডাক পড়ে। সেখানে শোকের পরিবেশকে আরও শোকাবহ করে তুলতে তারা মিথ্যে কান্নার রোল তুলে চোখের জলে ভাসায়। এ দিয়ে তাদের অন্ন সংস্থান হয়। এ কাহিনীর ভিত্তিই হল অর্থনৈতিক বৈষম্যের ইতিহাস। যে বৈষম্যের ইতিহাসকে মহাশ্বেতা তাঁর কলমে বারবার তীক্ষ্ণ কষাঘাতে চিহ্নিত করে আঘাত করেছেন প্রচলিত সমাজকে। আজও বিহারে, এমন কি বাংলার মুর্শিদাবাদেও, 'রুদালী'দের দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বলা যায় যে দ্রৌপদী, চণ্ডিদাসী, যশোদা, শনিচরি এবং ব্রতীর মা যেন মহাশ্বেতার লেখনীতে এক লাইনে দাঁড়িয়ে যান। ভিন্ন নাম, চরিত্র, গ্রাম, অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন সময়ের নির্যাতিতদের দলিল। যা প্রতিফলিত হয় মহাশ্বেতার কলমে।

শিশুসাহিত্যও রচনা করেছেন মহাশ্বেতা তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। ইচ্ছে করলে শুধুমাত্র সেটা করেই জীবন চালাতে পারতেন। প্রায় বারোশোর মতো প্রতিবেদন লিখেছেন। লিখেছেন বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ। এক স্বচ্ছ মূল্যবোধই মহাশ্বেতাকে জীবনের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করেছে। মহাশ্বেতার লেখায় পেশাদারিত্ব থাকলেও তথাকথিত পেশাদার লেখকদের মতো প্রত্যক্ষ সমাজ, বিশেষ করে নির্যাতিতদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। দৃঢ় ও নির্ভীক চিত্ত তাঁকে প্রতিবাদীর তকমা দিয়েছে। আপসহীন ভিন্ন ধারার সাহিত্যসত্তা নিয়েই সফল মহাশ্বেতা। তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কয়েক খণ্ড এখনও বাকি। লেখা বা সাক্ষাৎকালে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে আত্মজীবনী।

প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি

বৈষম্য উদ্‌ঘাটন করা এবং প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন মহাশ্বেতা। দুর্নিবার কলম তবু থামেনি। পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য একাদেমী (১৯৭৯), পদ্মশ্রী (১৯৮৬), জ্ঞানপীঠ (১৯৯৬), রামন ম্যাগসাইসাই (১৯১৭), পদ্মবিভূষণ (২০০৬)। এছাড়াও রবীন্দ্রভারতী এবং বিশ্বভারতী থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেছেন। পেয়েছেন বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম পুরস্কারও।

যদিও আনুষ্ঠানিক পুরস্কারের থেকেও পাঠকের মন জয় করা একজন লেখকের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সেটা বইয়ের মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ এবং নানান ভাষায় তাঁর বইগুলির অনুবাদের মাধ্যমে ঘটতে থাকে।

মহাশ্বেতার গল্প, উপন্যাস ভাষান্তরিত হয়েছে মারাঠি, কন্নড়, হিন্দী, ওড়িয়া এবং অন্য ভাষায়। ইংরেজিতে তাঁর লেখা অনুবাদ করেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। এছাড়াও ফরাসি, ইতালি ও জাপানি ভাষাতেও তাঁর লেখা অনুবাদ হয়েছে।

অন্যান্য প্রকাশ

মহাশ্বেতার সাহিত্যকর্ম নিয়ে সাহিত্য একাদেমী একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে। পরিচালক ছিলেন অন্য এক সন্দীপ রায়। যদিও লেখকের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ কর্মমুখর জীবন তাতে প্রতিফলিত হয়নি। মহাশ্বেতা যে একজন সক্রিয় কর্মী-লেখক সেটাই অনুপস্থিত থাকে। রাজা সেন কৃত তথ্যচিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় কোনো এক অজানা কারণে। এছাড়াও জোসী যোসেফও মহাশ্বেতাকে নিয়ে এক তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন শোনা যায়। মহাশ্বেতার সাহিত্য ও অন্যান্য লেখালেখি নিয়ে রচনাবলী সম্পাদন করেছেন অজয় গুপ্ত।

মহাশ্বেতার ছোটগল্প ও উপন্যাস নিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে 'বায়েন', 'বেহুলা', 'রুদালী', 'দ্রৌপদী' ও 'জল' গল্প ক'টি নাট্যে রূপায়িত হয়। 'জল' গল্পটির উপজীব্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বছর পরেও গ্রামীণ জল সংকট এবং সেই সঙ্গে ভগীরথ ও গঙ্গার আত্মসম্পর্ক। কলকাতা এবং দূরবর্তী জেলার কয়েকটি দল এ গল্প নিয়ে নাটক করেছেন। 'রুদালী' নাটকটি করেন কলকাতার

রঙ্গকর্মী, যদিও নাটকে শনিচরিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়নি। 'বায়েন'-এর নাট্যরূপ মোটামুটি। 'দ্রৌপদী' গল্পটি মণিপুরের একটি দল এইচ কানহাইয়ালাল ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী হেইসনম-এর নেতৃত্বে মণিপুরের প্রেক্ষাপটে এক কাব্যিক ব্যঞ্জনার ভাষ্য হয়ে ওঠে নাটকে। এছাড়া 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসটি মুক্তমঞ্চের নাট্যরূপে পথসেনার পক্ষে সফলভাবে প্রযোজিত হয়। 'বেহুলা' গল্পটিও সফলভাবে নাট্যে রূপায়িত করে পথসেনা অঙ্কন মঞ্চে। 'রূদালী' গল্পটি চলচ্চিত্রে রূপ দেন কল্পনা লাজমি। এখানেও সেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি সুচারু রূপে ফুটে ওঠেনি। 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেন গোবিন্দ নিহালনি। এমনিকে সফল পরিচালক হলেও এই কাহিনীর প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি তিনি। এটা লেখক মহাশ্বেতারও আক্ষেপ ছিল।

১৯৭৯ সালে ত্রৈমাসিক 'বর্তিকা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মণীশ ঘটকের মৃত্যুর পর ১৯৮০ থেকে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন মহাশ্বেতা। প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক সংখ্যার জন্য অনামী ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানাতেন সম্পাদনার কাজে। এটাও মহাশ্বেতার অনন্য ভূমিকার আর এক দিক। যার ভেতর বেশ কয়েকটি সংখ্যা যেমন 'তেভাগা', 'বন্ধ কারখানা' ছিল দুষ্প্রাপ্য দলিল। 'বর্তিকা'-র এক সংখ্যাতে তাঁর ছোট গল্পের এক বৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হয়।

এছাড়া অসংখ্য ছোট পত্রিকা, যা লিটল্ ম্যাগাজিন নামে খ্যাত, তাতে লিখেছেন তিনি। বয়সে নবীন লেখকদের সুযোগ ও সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যাতে তারা আরও ভালো লেখা লেখেন। আজকের অনেক প্রবীণ লেখক যখন নবীন ছিলেন পাঠকসমাজের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। এমন কি ছোট ছোট পত্রিকার সম্পাদকদের আবদারকেও ফিরিয়ে দিতেন না। সাহিত্যকর্মী হিসেবে এও তাঁর এক দিক।

১৩৮৬ বা ১৯৭৯-তে *প্রস্তুতিপর্ব* পত্রিকায় 'আজকের লেখা— কী ও কেন?' শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সম্ভবত এই প্রথম মহাশ্বেতার কলমে ফুটে উঠল একজন লেখকের ভূমিকা নিয়ে তাঁর বক্তব্য। সেই সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। উত্তাল সময়ের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকে নির্মোহ বিশ্লেষণ। পেশাদার লেখকদের সমকাল সম্পর্কে উদাসীনতার উল্লেখ। এবং তাঁদের কাছে তেমন কিছু আশা না করার কথা। অন্যদিকে চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে, নাটকে, যাত্রায় ঐ উত্তাল সময়কে পণ্য করে তোলার সমালোচনা। নতুন দরদি লেখকের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল যাতে কার্যকর পথে সমকালকে তাঁরা তাঁদের কলমে উপজীব্য করে তুলতে পারেন। ছিল প্রচলিত রাষ্ট্রের অন্তঃসারশূন্যতা এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের উল্লেখ, এই সময়ই শহুরে মধ্যবিত্তদেরও যা নাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভিন্ন পথের সন্ধান ও স্বাতন্ত্র্যে অনন্য

অখণ্ড বিহারের পালামৌ, সিংভূম থেকে পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরের প্রান্তিক অবহেলিত বৈষম্যের শিকার আদিবাসী, মুন্ডা ও খেড়িয়া শবরদের মধ্যে কাজ করা শুরু করেন মহাশ্বেতা। ঐসব গ্রামীণ অঞ্চলের লোকজীবন তথা সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটের কথাই তাঁর লেখার আখ্যান তথা উপজীব্য হয়ে ওঠে।

একবার রবীন্দ্রনাথ পাবনা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— ''তোমরা যে পারো এবং যেখানো পারো একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিল্প দাও, কৃষিশিল্পে ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নতুন চেষ্টা প্রবর্তিত করো। গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেই রূপ বিধি উদ্‌ভাবিত করো।'' এই ভাবনার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে মহাশ্বেতা যথা সম্ভব উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের কথা সারা দেশে পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু সাহিত্য বা প্রবন্ধ রচনা নয়। তাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন ওই বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের কাছে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির ছোট্ট দু'কামরার মেস বাড়িতে, এবং পরবর্তীকালে অন্য বাসগৃহে।

১৯৮৩ সালে পুরুলিয়ার অবহেলিত, বঞ্চিত, বৈষম্যের শিকার জনজাতিদের উন্নতির জন্য গড়ে তোলেন 'খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি'। রামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের দশ লক্ষ টাকার পুরোটাই দান করেন ঐ সমিতিতে। এছাড়াও সমিতির উদ্যোগে হস্তশিল্পের উৎপাদন, প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তাদের যে কোনো সমস্যায় বা প্রয়োজনে তাদের হয়ে কাজ করেছেন। যে কোনো সরকারি হুকুম বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকে নির্দ্বিধায় তিরস্কার করেছেন।

শুধু খেড়িয়া শবর নয়, বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যে জোটবন্ধনের কাজেও উদ্যোগ নিয়েছেন মহাশ্বেতা।

জীবনের শেষ কয়েক বছর সরাসরি দলীয় বা সরকারি কাজকর্মের সমর্থন করা নিয়ে নিয়ে তাঁর গুণগ্রাহী ও কাছের জনদের মধ্যে মতদ্বৈধতা ফুটে ওঠে। এসব ব্যতিরেকে একথাই বলাই বাহুল্য যে এক স্বকীয়তায় ভরা ভিন্ন স্বর, ভিন্নপথ, ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন ভাষ্য যেভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন তা গতানুগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। লেখক মহাশ্বেতা কতখানি কালোত্তীর্ণ হতে পারলেন সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু আজকের এবং আগামীকালের পাঠকদের কাছে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের লেখা পঠিত ও আলোচিত হবে। এবং গবেষকদের কাছেও এক নির্মোহ গবেষণার উপাদান হিসেবেই বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়। এমনই এক উজ্জ্বল কলমকারকে আমরা আজ হারালেও মহাশ্বেতার লেখার মধ্যেই তাঁকে ফিরে পাব। ❐